শ্রীরামকৃষ্ণ
ও
আধ্যাত্মিক নবজাগরণ

স্বামী নির্বেদানন্দ

অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

প্রকাশক :
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি
২০ ফেব্রুআরি, ১৯৬০

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
কত হয় পরিচয়
কত হৃদয়ের কত পরশন—
সব কিছু মনে রয় ?
তবু তার মাঝে প্রত্যাশাহীন
স্নেহের পরশগুলি
শত ব্যবধান বিস্মৃতি ঠেলি
শুভ্র উজ্জল শিখাখানি মেলি
স্নিগ্ধ বিভায় হৃদয়ের মাঝে
চিরদিন রয় জ্বলি।
অবিনাশী যাহা, প্রেমের স্বরূপ তিনি ;
তাই বুঝি রয় শুদ্ধ মনের
পরশ মরণ জিনি।
আপন প্রভায় প্রকাশিত যিনি
প্রেমময় রূপ তাঁর ;
আলো আনে তাই প্রেমের পরশ
ঘুচায় অন্ধকার।
দুর্দিনে যবে ভালবাসা-ছলে
বণিকেরা দিয়ে হানা
জীবনখানিরে ছিঁড়ে খেতে চায়
শোনে নাকো কোন মানা,
সারা সংসারে নামে শ্মশানের কালো—
প্রত্যাশাহীন স্নেহটুকু শুধু
জ্বালায় তখন আলো।

কিছু চাহে না সে প্রতিদানরূপে
শুধু দেয় ভালবাসা,
শুধু চায় তার সব শুভ হোক,
আর নাহি কোন আশা।
নবীন প্রভাত শুভদিনে যবে
আনে সুদূরের বাণী
শ্রেষ্ঠ-তীর্থযাত্রার পথে
উল্লাসময় জীবনের রথে
মধুময় হয়ে গতিবেগ আনে
তাঁর শুভাশিসখানি।

অসীম প্রেমের পাবাবার হতে যারা
ভরেছে হৃদয়, ভালবাসিবারে
শিখিয়াছে শুধু তারা।

জীবনপ্রভাতে চলিবার পথে
বহু ভাগ্যের ফলে
তাদেরি জনেক ধরেছিল হাতে,
পূজামন্দিরে নিয়েছিল সাথে,
তাঁহারি পূজার অর্ঘ্য রাখিনু
তাঁরি পূজাবেদীতলে
নূতন ডালায় সাজায়ে, ভিজায়ে
স্মৃতির গঙ্গাজলে।

অনুবাদক

নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ'-গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল। এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী-স্মারকগ্রন্থ 'The Cultural Heritage of India'-র (প্রথম সংস্করণ, ২য় খণ্ডের) অন্তর্ভুক্ত স্বামী নির্বেদানন্দ-লিখিত 'Sri Ramakrishna And Spiritual Renaissance'-শীর্ষক প্রবন্ধটির স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ।

স্বামী বিবেকানন্দের স্থূলদেহত্যাগের পরবর্তী দশকে যেসব মহাভাগ্যবান যুবক তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের বিশেষ স্নেহস্পর্শে ও নির্দেশাধীনে নিজ নিজ হৃদয় আধ্যাত্মিকতায় প্রদীপ্ত করিয়া সে-শিখার স্পর্শে আরো বহুজনের হৃদয়দীপ জ্বালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁহাদেরই অন্যতম।

ভগবানলাভার্থে অপরিহার্য আত্মবিলুপ্তির জন্য স্বামীজী-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ কর্মগুলির মধ্যে তিনি স্বামীজীর ঈপ্সিত প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়-বিধানের কর্মটিকেই সাধনরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন তাহাতেই ব্রতী ছিলেন। তাঁহার সাধনক্ষেত্র 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম'-এর সূত্রপাত তাঁহার ছাত্রজীবন হইতেই, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার একটি ভাড়াবাড়িতে। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ভাড়া বাড়িতে এবং দশ বৎসর গৌরীপুরে (দমদম) নিজস্ব আবাসে থাকিবার পর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটি কলিকাতার সন্নিকটবর্তী বেলঘরিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেই ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী নির্বেদানন্দ দেহত্যাগ করেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর মেঘনাদ সাহা, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ও আজীবন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। খুব মেধাবী

ছিলেন তিনি। বিদ্যাবত্তা হৃদয়বত্তা ও আধ্যাত্মিকতার সুসমঞ্জস সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাঁহার জীবনে।

গ্রন্থটিতে স্বামী নির্বেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে সারা জগতের, বিশেষ করিয়া ভারতের বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবনত অবস্থার ও তাহা দূর করিবার প্রাথমিক বিভিন্ন প্রচেষ্টা বিষয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁহারই 'কর্মবেগময় প্রতিরূপ' স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে ভারতে ও সারা জগতে তাঁহার সর্বজনীন উদার ভাব প্রচারের ফলে বিশ্বব্যাপী যে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনরূপ 'আলোকস্তম্ভ' যে আধুনিক যুগের সর্ববিধ সংশয় নিরসনের পথে বিমল আলোকসম্পাত করিতেছে, সেসব বিষয়ে অতি গভীর ও যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনও চিত্রিত করিয়াছেন অনবদ্য আলেখ্যে। গ্রন্থটিতে আধুনিক চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই নবালোকের সন্ধান পাইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের লিখিত গ্রন্থাদির পরবর্তী স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক এরূপ গভীর চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম।

মূল ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ স্বামী নির্বেদানন্দ প্রায় অর্ধাংশ দেখিয়া ও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বঙ্গানুবাদের অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল এবং প্রকাশভঙ্গী মূল গ্রন্থেরই অনুরূপ করিবার জন্য অনুবাদক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; গ্রন্থটি উৎসর্গ করিয়াছেন শ্রীশ্রীমায়ের সেবায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় গ্রন্থটি পাঠকগণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের ছাপ যথাযথভাবে মুদ্রিত এবং 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নবযুগের মহামন্ত্র 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'য় তাঁহাদের দীক্ষিত করিয়া বিশ্বজোড়া নব-জাগরণরূপ যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে তাহার হোমানলে নিজেদের আহুতি দিয়া ধন্য হইতে উদ্বুদ্ধ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

প্রকাশক

সূচীপত্র

১

ঘটনা-স্রোত

ভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহে ভাটার টান

কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে এসেছে। ভারতেব অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার ললাট উজ্জল হয়ে রয়েছে মহামূল্য মণিরত্নে—বৈদিক যুগের তরুণ আর্য-জাতির আধ্যাত্মিক পিপাসায়, উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতির আবেগোচ্ছল বাণীতে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের নৈতিক নিষ্ঠায়। দেখা যায়, তাকে মহিমান্বিত করে রেখেছে অমর মহাকাব্যগুলির আদর্শ জীবনালেখ্য, পুরাণের সর্বজন-বোধ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার-প্রবণতা এবং মুনিঋষিদের অনাবিল পবিত্রতা ও বিমল ভক্তি। আর দেখা যায়—সংস্কার-সাধনের প্রবল ইচ্ছাপ্রবাহ ছুটে চলেছে তার যুগান্তকারী ধর্মান্দোলনগুলির সঙ্গে সঙ্গে। আদিম ও মধ্যযুগের ভারতের এই অপূর্ব সাফল্যের কথা ভাবলে, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির এই গৌরবোজ্জল ক্রমোন্নতির কথা চিন্তা করলে হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষদের অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন ভরে ওঠে।

ভারতীয় সংস্কৃতির অতীতের এই মহিমা দেখে তার ঐতিহাসিক অভিযানের পরিণতির কথা জানবার ইচ্ছা স্বতই মনে জেগে ওঠে। নবযুগের আবির্ভাবে এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কি থেমে গেছে? মধ্য-যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত কি গৌরবোজ্জল অতীতের সুচারু অলঙ্কার-ভূষিত, ক্রমক্ষীয়মাণ মৃতদেহমাত্রে—মিশরীয় 'মমি'তে—পরিণত

হয়েছে? মহত্তর গরিমময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার মতো তার জীবনের স্পন্দন, তার প্রাণশক্তি কি চিরস্তিমিত? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে নিরপেক্ষ দর্শকের মনে এ প্রশ্ন জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ভারত চলেছে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পঙ্কিল পথ বেয়ে, অতি কষ্টে। ইংরেজ এসে দেশের স্বাধীনতা হরণ করার পর তার ওপর বিদেশী সভ্যতার প্রভাব অতি দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। রাজনীতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ভারত সন্দিহান হয়ে উঠল তার সুপ্রাচীন সংস্কৃতির শক্তিতে; হীনতাবোধের লজ্জাকর কালিমায় তার ললাট হল কলঙ্কিত। শক্তিমান বিজেতার সভ্যতাকে নিজের সভ্যতার চেয়ে মহত্তর বলে মনে করার ফলে সে-সভ্যতার দিকে চেয়ে তার চোখ গেল ঝলসে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবাসীর মনের ওপর এই প্রাধান্যের আসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় ভাব ও আদর্শের যে প্রবাহ উত্তাল-তরঙ্গে এসে দেশের বুকে আছড়ে পড়ল, প্রাচীন সভ্যতার নোঙর থেকে ভারতকে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্ট।

নতুন শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হল, তার ঝোঁক ছিল এমন সব মানুষ গ'ড়ে তোলার দিকে, জাতিতে ভারতীয় হলেও যাদের রুচি ও চিন্তাধারা হবে ঠিক ইংরেজদের মতোই। সে শিক্ষার প্রভাবে ভারতের অন্তর্জীবন ভেঙে যাবার গতিবেগ হয়ে উঠল দ্রুততর। এই বিজাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে তরুণের দল সংস্কৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা অর্জন করতে লাগল; যেমন: সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, ভারতে তার কিছুই নেই; তার সমগ্র অতীত ব্যয়িত হয়েছে শুধু কতকগুলো অলীক আদর্শের নির্বোধোচিত অন্বেষণে; সত্যি যদি ভারত বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে নিজেকে পুরোপুরি ইওরোপীয়

সভ্যতার ছাঁচে ঢেলে গড়তে হবে। বলা বাহুল্য, এই সব যাদুমন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ঝিমিয়ে পড়ল।

সাংস্কৃতিক সম্মোহনের প্রচণ্ড প্রভাবে ভারতবাসীরা যখন এভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে, তখন নবপ্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির অনুগামী কতকগুলি অশুভ প্রভাব এসে নিজস্ব আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে তাদের বিপথগামী করার জন্য প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল।

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের ওপর দিয়ে নাস্তিকতার প্লাবন বয়ে গেল। নামজাদা নাস্তিকদের বিপুলশক্তিময় চিন্তাধারায় ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের জড়বাদ-সহায়ক আবিষ্কার-কাহিনীতে ইংরেজী সাহিত্য তখন ভরপুর। শূন্যবাদী চিন্তাও হিন্দুবিশ্বাসের দুর্গ আক্রমণ করল। শত শত চিন্তাশীল মনীষী তখনই আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্যভাবেই বশ্যতা স্বীকার করলেন জড়াত্মক বস্তুবাদের কাছে, আর শুরু করলেন নাস্তিক্যবাদী জীবনধারায় গর্ববোধ ও উল্লাস প্রকাশ করতে। এত বড় আঘাত হিন্দুসমাজ সহ্য করতে পারল না, ভিত নড়ে গিয়ে তার ভাঙন শুরু হল।

এ আঘাত সয়েও যাঁরা রয়ে গেলেন, আরও একটা বিধ্বংসী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হল তাঁদের। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন আর খৃষ্টধর্ম-প্রচার একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল, খৃষ্টান মিশনারীরা প্রায়ই এ-দুটি কাজ একসঙ্গে করতেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, প্রচারক হিসাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুব সঙ্কীর্ণ। গীর্জার মতবাদের ওপর তাঁদের একগুঁয়ে বিশ্বাস, আর মানবজাতির মুক্তির জন্য তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহ, এই দুই মিলে তাঁদের করে তুলেছিল অন্যধর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং অন্য মতবাদের উৎকট সমালোচক। অখৃষ্টান ধর্মগুলিকে কোন মহৎ বা হিতকর ভাবের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, খৃষ্টধর্ম ছাড়া আর সব ধর্মের ওপরই তাঁরা উপেক্ষাভরে ঘৃণার বিষ উদ্‌গিরণ করতেন, আর বর্ষণ করতেন অজস্র অভিসম্পাত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পদমর্যাদার জন্য তাঁদের প্রচারকার্য দেখাতও খুব জমকালো। জনসেবক-মর্যাদা-ভূষিত ও শাসকজাতির কুলগর্বমণ্ডিত হয়ে তাঁরা দেখা দিতেন শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও সমাজসেবী রূপে। তাছাড়া আচরণে তাঁরা লোকের চিত্তহরণ করতে পারতেন, এবং তাঁদের ভেতব অন্ততঃ কয়েকজন এদেশের লোকদের সত্যই ভালবাসতেন। এই সব কারণে তাঁদের প্রভাব আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। খৃষ্টধর্মের এই সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা শিক্ষামন্দিরগুলির তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত কবে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে তাদের খৃষ্টধর্মে অনুরাগীও করে তুলতেন। এইসব ধর্মান্ধ উৎসাহীদের অপরকে ধর্মান্তরিত করার প্রবৃত্তি হিন্দুসমাজে একটা ধ্বংসের বিভীষিকা-সৃষ্টি শুরু করে।

এভাবে পরাধীনতা আব তার সহচর নতুন শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুলি হিন্দুসমাজের বুকে দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে। উৎকট সংস্কৃতি-সঙ্কর-জাত লোকের দল সারা দেশ-জুড়ে হঠাৎ মাথা তুললেন। রুচি, আচরণ, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবননীতি—সব বিষয়েই এঁরা ছিলেন না ভারতীয়, না ইংরেজ। নিজেদের পূর্বপুরুষদের ও প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর এঁদের বিশেষ কোন আস্থা ছিল না; দেশ-শাসক ও দেশের চিন্তাধারার নিয়ন্তারূপে আবির্ভূত ইংরেজদের অনুকরণ করাকেই এঁরা সমীচীন বলে ধরে নিয়েছিলেন, যদিও সে অনুকরণ ঠিকমত হত না।

কাজেই কোন নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে সে-সময়কার সমাজে, বিশেষ করে ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত মহলে, সংস্কৃতির চরম বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর অন্য কিছু দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। হিন্দুসমাজের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি সেদিন ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল, সে-কাঁপনে হয়তো তা একেবারেই গুঁড়িয়ে যেত। হিন্দুজাতি তখন চিরবিলুপ্তিরূপ বিপদ্-সাগরের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভারত তখন টলমল করছে; মনে হয়েছিল ধ্বংস তার অবশ্যম্ভাবী।

সংস্কার-আন্দোলন

কিন্তু তা হবার নয়। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে ভারত যেন মন্ত্রবলে বেঁচে গেল। অলক্ষিতে কি যেন একটা ঘটল! বোধ হয় দৈবী ইচ্ছাতেই সেটা হয়েছিল, যার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের বহু অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে সংস্কৃতি-সঙ্কটের পঙ্কে ভারত যখন প্রায় পূর্ণ নিমজ্জিত হতে বসেছে, তখন পায়ের তলায় হঠাৎ শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সে প্রাণপণে সচেষ্ট হয়ে উঠল। জাতির অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রাণশক্তি এতদিন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, হঠাৎ জেগে উঠে তা অভিযান শুরু করে দিল ভারতীয় সংস্কৃতির বিলোপসাধনে উদ্যত প্রচণ্ড বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির এই সংগ্রামেচ্ছা বাঞ্ছিত ফলই প্রসব করেছিল। হিন্দুজাতির জাগরিত আত্মপ্রত্যয়ের ক্রমবর্ধমান আঘাতে বিদেশী সভ্যতার মোহের আবরণ ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে সরে যেতে লাগল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে মহিমোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে তাকে চালিত করার জন্য একের পর এক দেখা দিতে লাগল সমাজসংস্কারের ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন।

ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজই এই-জাতীয় আন্দোলনগুলির অগ্রণী। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নবভারতের প্রথম বরেণ্য দেশপ্রেমিক ও সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এর প্রতিষ্ঠা করেন। গোঁড়া হিন্দু-আচারপ্রিয়তার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণ আধুনিক ও উদার এক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন

করেছিলেন। ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল, খৃষ্টান মিশনারীদের দোষদর্শী সমালোচনার ও নাস্তিকদের যুক্তিতর্কের সামনে দাঁড়িয়ে, সে-সবের প্রভাব কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তার ভেতর থেকে কিছু কাটছাঁট করে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, হিন্দুদের সমস্ত দেবতাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ না করলে আধুনিক সমালোচকদের নিরস্ত করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ভেবেছিলেন, যেমন করেই হোক সর্ববিধ সাকারোপাসনার অবসান ঘটাতেই হবে; সেটুকু ঘটানো সম্ভব হলে হিন্দুধর্মের ভেতর লজ্জাজনক কিছু আর থাকবে না। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সাকার-ভাবের সঙ্গে যুক্তিবাদের সামঞ্জস্যবিধান তিনি করতে পারেন নি। ঈশ্বরের সাকারত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিচালিত আধুনিকবুদ্ধিজাত প্রচণ্ড গোঁড়ামি নিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। উপনিষদ্ থেকে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক অংশগুলি তিনি পরমানন্দে গ্রহণ করলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদের এই ধারণা একেশ্বরবাদী মুসলমান ও খৃষ্টানদের ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে তিনি বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছিলেন। উপনিষদে ঈশ্বরের নিরাকার ভাব ছাড়া আরও যে-সব ভাবের উল্লেখ রয়েছে, সে-সবের সন্ধান যে তিনি পান নি, তা সহজেই বোঝা যায়। যাই হোক, হিন্দুধর্ম থেকে প্রয়োজনমতো উপাদান আহরণ করে এবং সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে রাজা রামমোহন একটি উচ্চাঙ্গের একেশ্বরবাদ গড়ে তুললেন। বৈদেশিক একেশ্বরবাদগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে অবলীলাক্রমে জয়ী হবার মতো শক্তি সে মতবাদের ছিল।

এই মতবাদ তুলে ধরার জন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। যদিও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্ববিধ সুরলহরী তোলার মতো তন্ত্রীর অধিকার-গৌরবে হিন্দুধর্ম মহিমান্বিত, তবু আসর

জমাবার জন্য তৎকালীন প্রবল চাহিদার অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদের একতাবাটিই বেছে নিয়েছিল। যাই হোক, যারা সর্বতোভাবে সাকারোপাসনা পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত, তাদের সকলের জন্যই জাতি-বর্ণ-সমাজ-নির্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার ছিল অবারিত। শর্তটি অবশ্য অনেকের পক্ষেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, অনমনীয় বা একগুঁয়ে গোঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, ব্রাহ্মসমাজে তার কিছুই ছিল না।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারের একটা সাড়া পড়ে যায়। সামাজিক প্রথাগুলির পুনর্বিন্যাসের এই কাজে নবশিক্ষাপদ্ধতি-সঞ্জাত সাম্য ও স্বাধীনতাবোধকে স্বচ্ছন্দ-বিহারের একটা অবকাশই দেওয়া হয়েছিল। সর্বপ্রকার সামাজিক দুর্নীতির হাত থেকে স্ত্রীজাতিকে উদ্ধার করার কাজে ব্রাহ্মসমাজ উঠে পড়ে লাগল। বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামূলক চিরবৈধব্যের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাল এবং নিঃশঙ্ক-চিত্তে ব্রতী হল আধুনিক প্রথায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রদানের কাজে। পরবর্তী-কালে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে ব্রাহ্মসমাজ নিজ গণ্ডির ভেতর জাতিভেদপ্রথা একেবারে তুলে দিতেও সমর্থ হয়েছিল।

এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক মতবাদ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ নাস্তিকতা, খৃষ্টধর্ম ও গোঁড়া হিন্দুমতের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান নেতা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর আবির্ভূত হন। সুযোগ্য পরিচালনায় সমাজকে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্নতির পথে নিয়ে যান তাঁরা। আন্দোলনটি মোটামুটি বাংলা দেশেরই, এবং ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সেটি গড়ে উঠেছিল। বাংলার বাইরে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত বড় একটা কেউ ছিলেন না।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় ব্রাহ্ম-সমাজ কখন কখন বৈদেশিক আদর্শের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ত। তার ওপর খৃষ্টধর্মের ছাপ পড়েছিল প্রথম থেকেই। উপনিষদ্ সম্বন্ধে নিজ মতবাদের ব্যাখ্যার জন্য রাজা রামমোহন প্রটেস্টান্ট একেশ্বর-বাদীদের যুক্তিগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম-সমাজের অস্থিমজ্জায় খৃষ্টান আদর্শকে ঢুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন নি। সামাজিক প্রথাগুলিকেও পাশ্চাত্যভাব-রঞ্জিত করা হয়েছিল—একটু বেশী রকমেই। বিদেশী ধর্মভাব ও সমাজপ্রথা গ্রহণেচ্ছার এই উৎকট আগ্রহ ব্রাহ্মসমাজকে চিরাচরিত হিন্দুত্বের কাছে পর করে তুলেছিল। তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাকে হিন্দুসমাজের গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়।

তবু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, তার কথা চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যা করা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল, ঠিক তাই-ই সে করেছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের কাঠামোটি ইওরোপীয় সভ্যতার চকচকে পাত দিয়ে মুড়ে না দিলে এ-সময় দেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে পুরোপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন হওয়ার উন্মাদনা থেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারা যেত না। ব্রাহ্মসমাজ ঠিক এই কাজই করেছিল—যেন হিন্দুদেরই একটি বিশেষ ধরনের পানীয় সে বিতরণ করেছিল পাশ্চাত্য হতে আমদানী-করা পাত্রে পুরে। আশানুরূপ ফল এতে পাওয়া যায়। শত শত যুবককে নাস্তিকতা ও খৃষ্টধর্মের বজ্রমুষ্টি থেকে রক্ষা করার কাজে সমাজ এতে খুবই সহায়তা লাভ করে। সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মসমাজের এ-কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে।

আর্যসমাজ

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ব্রাহ্মসমাজ যখন খৃষ্টীয় আদর্শের আবর্তে প্রায় মজ্জমান, তখন সর্ববিধ বৈদেশিক ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব নিয়ে আর একটি প্রবল ধর্মান্দোলন ভারতের অন্যত্র দেখা দেয়। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে নির্ভীক, অটল, নিরাবরণ প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে তার আবির্ভাব। এই আন্দোলন অবলম্বন করে ভারত আবার তার নিজের পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবার তার কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শকে সে নির্বাধ, বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ আপসহীন-ভাবে অভিব্যক্ত করল। আধুনিকতার প্রবাহে প্রায় ভেসে যাবার মুখে নিজস্ব আদর্শের সুদৃঢ় আশ্রয় অবলম্বন করে ভারত রুখে দাঁড়াল।

এটি হল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক বোম্বাই প্রদেশে প্রবর্তিত আর্যসমাজ-আন্দোলন। হিন্দুধর্মের সব ঐতিহাসিক ধর্মসংস্কারের মতো এই আন্দোলনেরও প্রবর্তক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। দয়ানন্দ ছিলেন অভিজাত হিন্দু সন্ন্যাসী, বেদে অগাধ জ্ঞানবান পণ্ডিত এবং ভারতীয় রীতিসম্মত দুর্দান্ত তার্কিক। সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তান। সেজন্য হিন্দুমত ও আধুনিতার মধ্যপন্থানুসন্ধী, পাশ্চাত্যধারায় চিন্তাশীল ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হত না মোটেই। হিন্দুবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে বেদের পক্ষ নিয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মতো তিনি নির্ভয়ে লড়ে যেতেন। বিদেশী প্রচারকদের বিদ্বেষপ্রসূত বিদ্রূপ সহ্য করে যাবার মতো লোক তিনি ছিলেন না, সমভাবে তাঁদের প্রত্যাঘাত করতেন। খৃষ্টান প্রচারকেরা হিন্দুধর্মের ওপর যে আক্রমণ চালাত, তার প্রত্যুত্তরে তিনিও খৃষ্টধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। কোনরূপ হীনম্মন্যতা তাঁর ছিল না। মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধাচরণেও তিনি ছিলেন কৃতসঙ্কল্প। প্রধানতঃ যোদ্ধা ছিলেন

বলে যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হতেন না তাঁদের সঙ্গে আপসের মনোভাব তিনি কখনও পোষণ করতে পারতেন না। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্ততা-স্বীকারে এবং পুনর্জন্মবাদ-স্বীকারে তাঁর মতে মত দিতে পারেন নি বলে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গেও তিনি হাত মেলাতে পারেন নি। তাছাড়া হিন্দুধর্মের বৈদিকযুগোত্তর ক্রমোন্নতিতে কোন শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। যথার্থ বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে না মিললে তিনি অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রচারিত বৈদিক ধর্মমতের নির্মম সমালোচনা করতেন।

নিজের মতো করে তিনি বেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিজ মতানুগ শুদ্ধ বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অতি প্রবল। তাঁর ধর্মে অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মের কোন স্থান ছিল না, সাকার-বাদীর বহুনামরূপবিশিষ্ট উপাস্যেরও না। তাঁর এই 'কালাপাহাড়ী' মনোভাবের জন্য স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁকে হিন্দুসমাজ-সীমার বাইরে এসে দাঁড়াতে হল, আর্যসমাজকে দাঁড় করাতে হল আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে।

সামাজিক প্রথার আমূল পরিবর্তনসাধনও শুরু হল এই ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। ধর্মের অঙ্গ হিসাবে জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যক্ত হল, বেদের অধিকারী হিসাবে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য অস্বীকৃত হল, এবং স্ত্রীলোকদের মুক্তি দেওয়া হল বহু সামাজিক অক্ষমতার হাত থেকে। তাছাড়া শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যান্য বহুমুখী জনহিতকর কর্মসাধনে উৎসাহ আর্য-সমাজের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বেদের প্রতি একদেশদর্শী মনোভাবের জন্য আর্যসমাজের ভেতর বহু দোষ এসে ঢুকেছিল। কিন্তু এ আন্দোলনটি যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ সুরের পর্দাতেই লহরী তুলেছিল, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। আর এইজন্যই তা জাতির ধর্মপ্রেরণার মর্মপ্রদেশে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল। তাছাড়া সাকার-উপাসনার প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বলে আধুনিক

চিন্তাশীলদেরও রুচিগ্রাহ্য হতে পেরেছিল। মূর্তিপূজাব পরিবর্তে অগ্নিতে আহুতি-প্রদানরূপ বৈদিক যজ্ঞের প্রচলনও একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণের সৃষ্টি করে। শেষকথা, সমাজ-প্রথাব আমূল পরিবর্তনসাধন তৎকালীন মনোভাবেব সর্বথা অনুকূলে গিয়েছিল। এই সব কাবণে আর্যসমাজের নিজ মতে দীক্ষিতকবণেব প্রয়াস খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সমগ্র আর্যাবর্তে, বিশেষ কবে পঞ্জাব-প্রদেশে. এই নতুন ধর্ম দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে। অল্প কয়েক দশকেব মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক আর্যসমাজে দীক্ষা গ্রহণ কবে। এভাবে ভারতেব একটি অতি বিস্তৃত অঞ্চলে বিদেশী সংস্কৃতিব ধ্বংসাত্মক আক্রমণ প্রতিহত কবে আর্যসমাজ এদেশেব সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিপুল সাফল্যের অধ্যায় রচনা কবে বেখেছে।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি

ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে বিদেশাগত আব একটি ধর্মান্দোলনের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে; সেটি হচ্ছে থিওজফি-আন্দোলন। পূর্বোক্ত হিন্দু-আন্দোলনগুলিব মতো তাবও প্রভাব সে সময় খৃষ্টধর্মেব ও জড়বাদের আক্রমণ কিছুটা প্রতিহত করেছিল। সোয়েডেনবার্গ, একহার্ট, জ্যাকব বোমে, শেলিং, ব্যাডার ও মলিটর নামক যশস্বী মনীষিগণ কর্তৃক রহস্যবাদ, যুক্তিবাদী দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারার এক চিত্তাকর্ষক সংমিশ্রণরূপ এই মতবাদ ইওবোপে প্রবর্তিত ও পুষ্ট হয়। অবশ্য বাশিয়ান মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কী এবং সেনাবিভাগের একজন পূর্বতন ইংরেজ অফিসার কর্ণেল অলকট-এর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলনটি অপরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার মতো শক্তিশালী মতবাদে রূপায়িত হয়েছিল। এর ধারাবাহিক সুনিয়ন্ত্রিত প্রচাবের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটিও স্থাপিত হয়।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের রহস্যঘন নিগূঢ় তথ্যবাজি থেকে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করে এবং হিন্দুদের ও আধুনিক অধ্যাত্মবাদীদের রীতির অনুকরণে তাকে মার্জিত করে প্রবর্তকগণ থিওজফির বহিরঙ্গে একটি প্রাচ্যভাবের ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের দলে। রহস্যময়তা অটুট রেখে নিজ মতবাদকে বিচারসম্মত করে তোলার জন্য তাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দুধর্ম-তত্ত্বের কয়েকটি উচ্চ আদর্শ মিশিয়ে অদ্ভুত এক ভাব-সংমিশ্রণ তৈরী করেছিলেন। আধুনিক অধ্যাত্মবাদের চিন্তাপ্রণালীর ও নিয়মপদ্ধতির রহস্যময়তার সৌরভও তাতে একটু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সম্পূর্ণ বিদেশাগত এবং বহু ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণে গঠিত হলেও এর প্রভাব ভারতবাসীদের ওপর যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। একদল শিক্ষিত ভারতবাসী দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ভাষা ও অলৌকিকত্বের সঙ্গে নিজ ধর্মবিশ্বাস জড়িত রাখতে চাইতেন। অদ্ভুত আনন্দ পেতেন তাঁরা এতে। এই জাতীয় লোক সহজেই আকৃষ্ট হলেন এই মতবাদের প্রতি। তাঁরা দেখলেন, থিওজফি তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কৃত্রিম ঠাটটুকু রক্ষা করে বুদ্ধিজ আনন্দও দিতে পারবে, আবার সেই সঙ্গে রহস্য-প্রিয়তার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার খোরাকও জোগাতে পারবে। কাজেই এ আন্দোলনটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা নাস্তিক বা খৃষ্টান হওয়ার হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেন।

সমাজসংস্কার বিষয়ে অবশ্য থিওজফি হস্তক্ষেপ করে নি। বে-পরোয়া-ভাবে কোন সমাজপ্রথার পরিবর্তনসাধন করতে যায় নি। এইজন্যই হিন্দুসমাজে থেকেও থিওজফি নিয়ে মাথা ঘামাতে কোন বাধা ছিল না। এই অভিনব ধর্মমতটিকে নিজের ঘরে স্থান দেবার মতো পরিসর হিন্দুধর্মের যথেষ্টই ছিল। তাছাড়া ব্যাপকভাবে হিন্দুশাস্ত্রের সানুবাদ প্রকাশনের মাধ্যমে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হিন্দুধর্মের জন্য যথার্থ মূল্যবান কাজও

কিছু করেছিল। শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বধর্মে শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত করার কাজে তার অবদান বাস্তবিকই অনেকখানি।

বহুধর্মের সার-সঙ্কলনে গঠিত ও নতুন মত বলে প্রতীত হলেও থিওজফি এভাবে এদেশে যে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল, তা হিন্দুসমাজে শুভ ফলই প্রসব করে। সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যায় যে, হিন্দুধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনগুলির সঙ্গে তার অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল; নাস্তিকতার ও খৃষ্টধর্মের আক্রমণ থেকে হিন্দুদের—বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যবাসীদের সে বাঁচিয়েছিল, যেমন করে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ বাঁচিয়েছে আর্যাবর্ত-বাসী হিন্দুদের।

সিংহাবলোকন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বহু সামাজিক ও ধর্মমূলক পরিবর্তনের বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নিমজ্জমান হিন্দু-বিশ্বাসকে উদ্ধার করার কাজে এদের সবগুলিই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ববিশেষকে গ্রহণ করে সেটিকে পাশ্চাত্যের গোঁড়া ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সমালোচনা সহ্য করার মতো সবল করে তুলতে এগুলির প্রত্যেকটিই চেষ্টা করেছিল। বহিরাগত সভ্যতার ধ্বংসাত্মক তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার জন্য হিন্দুধর্মের অন্ততঃ কয়েকটি দিকে এভাবে কয়েকটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর মাথা তুলেছিল।

ঘটনাস্রোতের গতিপথও পরিবর্তিত হল এতে। যেসব মনীষীরা প্রলোভনে পড়ে হিন্দুয়ানি ছেড়ে বিপথগামী হয়েছিলেন, তাঁরা আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফিরে চাইলেন পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে। সে শিক্ষার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম্ করা, এমনকি তার কিছু কিছু গ্রহণ করে জীবন গঠন করাও শুরু হয়ে গেল।

এভাবে এসব আন্দোলনগুলির ভেতর দিয়ে হিন্দুদের আত্মপ্রত্যয় পুনরুদ্বুদ্ধ হয়ে সব বাধা ঠেলে হিন্দুসংস্কৃতিকে নব প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিজয়লাভেচ্ছার যে অভিযান শুরু হয়েছিল, ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনারীদের প্রচাবের ফলে যাব গতিবেগ বেড়ে গিযেছিল, তাকে হটিয়ে দেবার জন্য এভাবে তার পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয়। এই সাফল্য এইসব সময়োচিত আন্দোলনগুলির মূল্যকে অতুলনীয় কবে রেখেছে। কিন্তু সবটা প্রয়োজন এতেও মিটল না ; হিন্দু-বিশ্বাসেব পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জন্য আরও অনেক কিছুর প্রযোজন ছিল। এইসব আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের অংশবিশেষকে অবলম্বন কবে, হিন্দুধর্মের ভেতর থেকে সযত্নে বেছে নেওয়া কয়েকটি মতবিশেষেব প্রতীকমাত্র-রূপে।

হিন্দুধর্মে কেন্দ্রগত মহান্ একটি একত্বের মূলসূত্রে বহুবিধ মতবাদ অপূর্ব সমন্বয়ে গাঁথা রয়েছে। এই একত্বেব, এই মূলসূত্রেব সন্ধান যে পায় নি, সে কিন্তু সর্বভাবময় হিন্দুধর্মকে পরস্পরবিবোধী অসংখ্য মতবাদের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলেই মনে কববে। অতি নিম্ন থেকে অতি উচ্চ পর্যন্ত সর্ববিধ ভাবই সে দেখতে পাবে সেখানে—পবস্পর-বিচ্ছিন্নরূপে। কাজেই এরূপ কোন লোক যদি হিন্দুধর্মকে সমর্থন করতে চায়, তাহলে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করার মতো একটিমাত্র মতবাদকে পছন্দ করে সেখান থেকে বেছে নেওয়া ছাড়া সে আর করবেই বা কি ?

সংস্কারকদেরও ঠিক তাই করতে হয়েছিল। সমন্বয়ের গূঢ় রহস্য ধরতে না পারার জন্য, এবং হিন্দুধর্মের বহুবিধ সারগর্ভ ভাবকে বদ্ধ কুসংস্কার বলে ভুল বোঝাব জন্য শাস্ত্রের একদেশদর্শী অর্থবোধই হয়েছিল তাঁদের। আর সেই একদেশদর্শী বোধেব আলোক ফেলে হিন্দুধর্মের ভেতর যা কিছু অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন তাঁরা, তা সবই ছাঁটাই করতে লেগে গিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে হিন্দু ঋষিরা যে বিশাল সমৃদ্ধ

ও সুবিন্যস্ত আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শগুলি প্রবর্তন করে গেছেন, সর্বতঃপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সেগুলির দিকে চাইতে পারেন নি বলেই সেগুলির মর্মগ্রহণেও তাঁরা অসমর্থ হয়েছিলেন।

তবু নিজ নিজ দৃঢ় বিশ্বাসের তড়িৎ-স্পর্শে প্রাণোচ্ছল হয়ে তাঁরা ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের কতকগুলি মূল বিশ্বাসের ওপর।

ফলে, সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে সমগ্র হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধনে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভেতর যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্য নিষ্ঠা নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এঁদের দলে। প্রাচীনপন্থী অগণিত জনগণ কিন্তু এইসব সংস্কারকদের মত গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না; তাঁদের তুলনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সেজন্য হিন্দুবিশ্বাসের প্রায় সবটাকেই একটা জঞ্জালের স্তূপবিশেষ বলে মনে করে যে সংস্কারক দলগুলি তার সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই অকৃতকার্য হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল অল্প কয়েকজন সমর্থক মাত্র সংগ্রহ করে।

সনাতনপন্থীদের মনোভাব

সনাতনপন্থী জনসাধারণ কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতদের মামুলী নির্দেশ অনুযায়ী সমাজ ও ধর্মের ধরাবাঁধা পথ ধরেই নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে লাগলেন। হিন্দুদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর বিদেশী সভ্যতার সঙ্ঘাতের মারাত্মক কুফলকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। বৈদেশিক চিন্তাধারা যে দেশের ওপর চড়াও হয়ে এগিয়ে চলছিল, সেদিকেও বোধ হয় তাঁরা চেয়েছিলেন একটু উপেক্ষাভরে—গর্বোন্নত ভাব নিয়ে। আধুনিক

সমালোচকদের বিধ্বংসী অভিযান থেকে বাঁচবার জন্য নিজেদের মতবাদকে যুক্তির বর্মে সজ্জিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা-বোধই জাগে নি তাঁদের মনে। সুপ্রাচীন নিজস্ব বিশ্বাসের দুর্গের ভেতরে থেকে তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সুরক্ষিত ভেবেছিলেন। তাই অন্ধভাবে আঁকড়ে ছিলেন বৈচিত্র্য-বহুল, পুরুষানুগত মত ও আদর্শকে। ভুলই হোক, আর ঠিকই হোক, সনাতনপন্থীরা হিন্দুয়ানিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে তার সঙ্গে হয় বেঁচে থাকতে, নয় বিনষ্ট হতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন; সংস্কারকদের কাছ থেকে কোনরূপ আংশিক হিন্দুয়ানি গ্রহণ করতে চান নি তাঁরা। সংস্কারকেরা প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের এই মনোভাবকে উৎকট ও বেশ বিপজ্জনক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁবা ভেবেছিলেন—যুগনিয়ন্তা শক্তির প্রতি, এবং নিজ মতবাদের আমূল সংস্কারসাধনের অতি-প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের এই নির্বোধ উপেক্ষা পরিণামে একটা বিপত্তি ঘটাবেই। তাঁদের ভয় ছিল, পুরাতন ধর্মাদর্শ ও ধর্মমতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তৎকালীন সুস্পষ্ট চাহিদার অনুরূপ করে সনাতনপন্থীরা যদি ধর্মকে না গড়ে তোলে, তাহলে হিন্দুসমাজের প্রধান ইমারতটি অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

সংস্কারকদের এই শঙ্কাকে ভয়ার্তের যুক্তিহীন আশঙ্কা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সে সময় যে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই মনে করতেন যে, অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘ'টে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতাকে যদি সমগ্রভাবে বাঁচিয়ে দেয় তো আলাদা কথা, তা না হলে বহু ভাব ও বহু আদর্শের বিশাল সমন্বয়ভূমি প্রাণবন্ত হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই চিরতরে বিলুপ্ত হবে; আধুনিক চিন্তাধারার তোপের মুখে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে হিন্দুসমাজ। প্রাচীনপন্থীরাই অবশ্য এতদিন হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তবু এই সঙ্কটকালে এরূপ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটার কোন লক্ষণ যে-পর্যন্ত না দেখা যাচ্ছিল, সে-পর্যন্ত তাঁদের নেতৃত্বাধীন

জনসাধারণের এই স্থির সঙ্কল্প ভারতের অতি প্রাচীন ধর্মটির চিরবিলুপ্তির বিপদকে যে বাড়িয়েই তুলছিল, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। জনসাধারণের এই মনোভাব শুধু সংস্কারকদের চোখেই নয়, নিরপেক্ষ দর্শক এবং সমালোচকদের চোখেও একটু গোঁয়াঁরতমি বলেই মনে হয়েছিল। কারণ, হিন্দুধর্মরূপ সুবিশাল ইমারতটির সবটাকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীনপন্থীদের এই জেদের ফলে সমাজ-জীবনের অবস্থা হয়ে উঠেছিল খুবই সঙ্কটাপন্ন।

হিন্দু নবজাগরণ

কিন্তু আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে হিন্দুসমাজ আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল। গোঁয়ারতমি বলে মনে হলেও প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের এই একগুঁয়ে মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল না। বেশী দিন অপেক্ষাও করতে হল না; হিন্দু-বিশ্বাসের সব শাখা-প্রশাখা জুড়ে অমিত শক্তি সঞ্চার করে হিন্দুধর্মকে পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করার মতো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল।

যাঁর প্রথম জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থের* প্রকাশ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনেই ঘটল সেটি। গভীর আধ্যাত্মিকতায় ভরা হিন্দুধর্মের উদার ও সমন্বয়সাধক দৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আবির্ভাব ঘটল, হিন্দুধর্মতত্ত্বের সর্ববিধ ভাব ও আদর্শের অতি প্রাঞ্জল জ্ঞানালোক-সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যারূপে।

হিন্দুভাব ও হিন্দু আকাঙ্ক্ষার প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে একই সুরে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন ও বাণী। সেজন্য পূর্বগ মুনি, ঋষি ও আচার্যদের জীবন ও বাণীর পূর্ণ সমন্বয় সেখানে ঘটেছিল। তাঁদের মতোই তিনি

* The Cultural Heritage of India (Sri Ramakrishna Centenary Memorial Volume). বর্তমান প্রবন্ধটি (Sri Ramakrishna And Spiritual Renaissance) এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ প্রবন্ধ।

প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির ওপর নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কথাও বলতেন একজন আধিকারিক-পুরুষের মতো। সে সময়কার জরুরী দাবি মেটাবার মতো শক্তি ছিল তাঁর প্রাণখোলা কথায়, যা অপরের প্রাণস্পর্শ করত সহজেই। বিশ্বাসী প্রাচীনপন্থীরা এবং যুক্তিবাদী সংস্কার-পক্ষপাতীরা—সকলেই ধীরে ধীরে বুঝলেন যে, হিন্দু জীবনবেদের একজন পরিত্রাতা হয়ে তিনি এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ডাক শোনা মাত্রই হিন্দুসমাজ সোল্লাসে সাড়া দিয়েছিল কেন, সে কথা বোঝা যায় নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মনস্তত্ত্ব একটু তলিয়ে দেখলেই।

অনুভূতিই হিন্দুধর্মের প্রাণ। ধর্মের সর্বোচ্চ ভাবগুলি যে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গেই যে সত্যকার ধর্মজীবন শুরু হয়, এই মূল বিশ্বাসই যুগ যুগ ধরে হিন্দুজীবন নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। ভারতের মহানুভব মুনি, ঋষি ও আচার্যেরা জীবন ও অস্তিত্বের অবলম্বন মূল চিরন্তন সত্যকে জগতের অনিত্য বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতেন, অনেক বেশী মূল্যবান বলে জ্ঞান করতেন। এ ছিল তাঁদের দৈনন্দিন অনুভূতির বিষয়। তাঁদের সব চিন্তা, সব আকাঙ্ক্ষা, সব কৃতিত্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই শুদ্ধ উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। সেজন্য হিন্দুধর্মের এই সব দিব্যভাবময় প্রতিভূরা বলে গেছেন: ধর্ম যেন আলোচনা, কল্পিত মতবাদ, উপদেশ ও সম্প্রদায়-গত দলমাত্রে পর্যবসিত না হয়ে তার মূল সত্যগুলির অনুভূতি-লাভকেই চরম লক্ষ্য করে রাখে। ধর্মজীবনে আর সব ঘটনার চেয়ে এই চরম চাহিদাটিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে গেছেন বেশী। হিন্দু-মন এই সব অনুভূতিসম্পন্ন আচার্যদের গুরুপদে বরণ করে নিয়ে ধর্মের এই সহজ সুস্পষ্ট প্রবল চাহিদাটিকেই তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাণস্বরূপ বলে গ্রহণ করে নিয়েছে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতির এই মূল চাহিদার প্রতি আনুগত্য আছে বলেই, আধ্যাত্মিক সত্যলাভের কার্যকর পথ দেখাতে পারে এমন যে কোন সাম্প্রদায়িক মতের সঙ্গে হিন্দুরা মানিয়ে চলতে সমর্থ। এভাবেই আপাতবিরোধী বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। হিন্দুধর্ম দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে তার সবগুলিকেই বুকে ঠাঁই দিয়ে এসেছে। অমর, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্য হিন্দুধর্মের আকুল প্রচেষ্টার ফলেই এখানে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েছে অদ্বৈতবাদীদের অতি উচ্চাঙ্গের মনোবিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ধারা, রাজযোগীদের মনঃ-সংযমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, হঠযোগীদেব কঠোর শরীর-নিয়ন্ত্রণ, এবং শাক্ত বৈষ্ণব ও অন্যান্য ভক্তিমার্গীদের উপাসনা ও ঈশ্বরকে ভালবাসার সাধনা। এই আকুল প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে শাক্ত-ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষের নীতি-বিগর্হিত গুহ্য সাধনপ্রণালীর এবং কাপালিকদের তামসিক ও ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপাদির। ঈশ্বরলাভের জন্য হিন্দু-মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই হিন্দুধর্মের ভেতর ছোট বড় সর্বস্তরের এত বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ গড়ে তুলেছে।

তাছাড়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভের এই একই প্রেরণার ফলে এদেশে অসংখ্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী তাঁরা। আজও দেখা যায়, ভারতে হাজার হাজার লোক সংসার ছেড়ে এসে আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্য বিভিন্ন সাধনায় জীবনের সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা দেশের কোন কাজে লাগেন না, ঠিক কথা; তবু হিন্দুসমাজ স-সম্ভ্রমে তাঁদের সমর্থন করে। এতেই বোঝা যায় যে, বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ কবীর মীরাবাঈ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সত্যদ্রষ্টারা অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে মহান্ আদর্শের জন্য জীবনপাত করে গেছেন, তার ওপর সমাজের যথার্থ ও গভীর অনুরাগ আজও প্রাণবন্ত হয়ে আছে। সনাতনপন্থী জনসাধারণ সন্ন্যাসজীবনে

এই অত্যুচ্চ আদর্শটিকে দেখতে পায় বলেই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে সেই জীবনের উদ্দেশে।

ধর্মজীবনের ভিত্তি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি প্রাচীনপন্থীদের অনুরাগ এত গভীর বলেই হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এমন একজন সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়েছিল, চরম সত্যকে যিনি সাক্ষাৎ-ভাবে উপলব্ধি করেছেন। যাঁর কাছে সেই সত্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত মনোরম বিষয় বা সুবিন্যস্ত কল্পনাজাল-মাত্র নয়, যাঁর কাছে তা প্রত্যক্ষ-অনুভূত সত্য, যাঁব কাছে তার মূল্য জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চেয়ে অনেকগুণ বেশী। সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন এরূপ একজন সত্যদ্রষ্টা ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না প্রাচীনপন্থী জন-সাধারণের বিশ্বাস অর্জন ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিন্দু জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ কবে তাদের ধর্মে নতুন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একজন মহাশক্তিধর ঋষির, যাঁর জীবনের গভীর ও বিশাল অনুভূতিতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সবই প্রতিফলিত হয়ে উঠবে।

শ্রীবামকৃষ্ণ এই প্রয়োজনই মেটাতে এসেছিলেন। প্রাচীনপন্থী সমাজ তাঁর ভেতর দেখেছিল সমগ্র হিন্দুধর্মে বিরাট জাগরণ আনার উপযোগী বিপুল শক্তিধব এক সত্যদ্রষ্টাকে। এই দেখাটা যে এখনও চলেছে, এবং জনসাধারণ যে এবিষয়ে সজাগ হয়ে উঠছে, তা বেশ বোঝা যায় মহাত্মা গান্ধীর কথায়: "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীকে জীবনরূপায়িত ধর্মের ইতিহাস বলা যায়। তাঁর জীবন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে। তাঁর জীবনী পড়লে, 'একমাত্র ভগবানই সত্য, আর সব অলীক'—এ কথায় বিশ্বাসী না হয়ে পারে না কেউ। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের জীবন্ত মূর্তি। তাঁর বাণী কোন পণ্ডিতের কথামাত্র নয়, সে বাণী জীবনবেদ হতে উদ্ধৃত অনুভূতির বিবৃতি। কাজেই পাঠকের মনের ওপর তার

প্রভাব অনিবার্য। জলন্ত জীবন্ত বিশ্বাস কাকে বলে, এই অবিশ্বাসের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তার ফলে হাজার হাজার নরনারী আশ্বস্ত হল। এটা না দেখতে পেলে আধ্যাত্মিকতার আলোকের সন্ধানই পেত না তারা।"

এরূপ জীবন যে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মন অধিকার করে সেখানে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির ভেতর তাঁদের বুদ্ধিজ সংশয়গুলির অপূর্ব সমাধান খুঁজে পেলেন। নাস্তিকতার দূষিত ভাবধারা এবং ব্রাহ্ম আস্তিকতার বিশুদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ—এই দুয়েরই সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)। তাঁর মতো ব্যক্তিও এই অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন অতিমানবের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁর দৃপ্ত ভাষায় বলা যায়: "শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে নিজেকে অবনত করেছিল মহামনীষী, মহিমান্বিত এবং নবভারতের মহান্ ধর্মবীরদের মধ্যে সঙ্গত কারণেই সর্বাধিক দৃপ্ত একটি মানুষ।"

এ ঘটনাটির তাৎপর্য খুব গভীর। স্বামী বিবেকানন্দ যে-সব আধুনিক যুক্তিবাদের যথার্থ ও তীক্ষ্ণধী প্রতিনিধি ছিলেন, তার সবগুলির ওপরই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির প্রভাব এই ঘটনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড যুক্তিনিষ্ঠ মনে এই বাস্তব সত্যটি প্রতিভাত হয়েছিল: ধর্ম-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হলে, সে সম্বন্ধে বিচার করতে হলে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাকে নিন্দিত প্রতিপন্ন করতে হলে ধর্মচেতনার প্রকৃত অবস্থা আগে নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। এইটাই হল এ কাজের সর্বপ্রথম যোগ্যতা। সত্যদ্রষ্টারা নিজ অনুভূতিতে যা প্রত্যক্ষ করেন, তার বিবরণ দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে সকলেই

ঠিক সেই অনুভূতি লাভ করতে পারেন। ইচ্ছা করলেই যুক্তিবাদীরা আগে নিজ সমীক্ষাসহায়ে সত্যদ্রষ্টাদের কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন। এভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিলে তবে সে সব অনুভূতি সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করার বা সেগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করার যোগ্য অধিকার তাঁদের আসবে। স্বামী বিবেকানন্দের অস্থি-মজ্জায় যুক্তিপ্রবণতা প্রবল ছিল বলে এই পরিস্থিতিটি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজ অনুভূতিসহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সত্যতা নিরূপণে অগ্রসর হলেন তিনি। এই গুরুতর পরীক্ষার কাজে মনেপ্রাণে ব্রতী হয়ে অক্লান্ত সাধনান্তে তিনি ফিরে এলেন আধ্যাত্মিকতাদীপ্ত ও দিব্যানন্দ-মণ্ডিত হয়ে। নিজ অনুভূতির কষ্টিপাথরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সত্যতা যাচাই করার পর তিনি বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ ও ভাষার মাধ্যমে জগতে সেই সুপরীক্ষিত বাণী প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বুদ্ধিজ সন্দেহ, যৌক্তিক অনুসন্ধিৎসা ও সযত্ন পরীক্ষা সহায়ে যে সত্যজ্ঞানাগ্নি আহরণ করেছিলেন, তা দিয়ে আধুনিক চিন্তারণ্যের রাশীকৃত অবাঞ্ছিত জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলে যুক্তিবাদীদের জন্য একটি বিশাল রাজপথ নির্মাণ করে দিয়ে গেছেন। সে পথ হিন্দুমত ও হিন্দু আদর্শের অধ্যাত্ম-জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে তাঁর জীবন একটি আলোকস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে—তিমিরাচ্ছন্ন আধুনিক মানুষকে পথ দেখাতে। হিন্দুধর্মের যে সব তথ্যগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়, তার তাৎপর্য নির্ধারণকালে বিবেকানন্দের জীবন বর্তমান যুগের চিন্তাশীল মনীষীদের সর্ববিধ অকপট জিজ্ঞাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংশয়গুলিরও নিরসন করে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে হিন্দুধর্মকে সহজবোধ্য, সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত ও বিশ্বাসগম্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে এই ধর্মটিকে তিনি এমন এক যুক্তিসম্পদের অধিকারী করে দিয়ে গেছেন,

বিচারের তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণেও অটুট থেকে যা সর্ববিধ আধুনিক সমালোচনার সম্মুখে স্বপক্ষ সমর্থন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সেজন্য হিন্দুভারতের এই জ্ঞানোজ্জ্বল আধুনিক দেবদূতের দিব্যভাবময় জীবনের ও উচ্চাঙ্গের যুক্তিপরায়ণ কথার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমান যুগের সর্ববিধ যুক্তিবাদের তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি নিয়ে হিন্দুধর্মকে ঘিরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সে প্রভাব। এই জন্যই বর্তমান হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের একজন অবিসম্বাদী পবিত্রাতা বলে গ্রহণ করার পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্য জীবন ও বাণী হিন্দু ভারতের প্রাচীনপন্থী ও সংস্কার-পক্ষপাতী উভয় সম্প্রদায়কেই নবজীবন ও নববলে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। হিন্দু-পুনর্জাগরণের এক নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে এভাবে। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে খাঁটি কথাই বলেছেন: "আমি এখানে যাঁর আবাহন করছি, তিনি ত্রিশকোটি মানুষের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিণতি-স্বরূপ। যদিও চল্লিশ বছর হয়ে গেল তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে, তবু তাঁর আত্মা বর্তমান ভারতকে উজ্জীবিত করে চলেছে আজও।"

এই পুনরুত্থানের মধ্যে হিন্দুধর্মের শক্তিশালী ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। ভারতকে দেখে এখন আর গৌরবময় মৃত অতীতের সমাধিক্ষেত্র-মাত্র বলে মনে হয় না। এখন তার ধমনীতে বয়ে চলেছে নবপ্রাণ ও নববিশ্বাসের উষ্ণধারা। নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শের প্লাবনে সারা জগৎ ভাসিয়ে দিতে সে এখন উদ্যত। রোমাঁ রোলাঁ যাঁকে 'বাংলার মেসায়া' বলেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তাঁর 'সেণ্ট পল' বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করলে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়-কালটিকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা হবে।

২

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন : আধ্যাত্মিকতায় ওতপ্রোত

পরিপ্রেক্ষিত

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সাধারণ জীবন থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। বড় বড় লোকের জীবন যেমন সাধারণতঃ ঘটনাসম্ভার ও আশ্চর্য কার্য-কলাপের সঙ্গে জড়িত থাকে, এ জীবন তা নয়। সেজন্য এই জীবন আলোচনা করার আগে তার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা প্রয়োজন। সে দৃষ্টিভঙ্গী এলে তবেই এই জীবনটি অনুধাবনের পথে নির্ভুলভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে এবং এই জীবনের ঘটনাগুলির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও জনসেবকরূপে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। তিনি বাগ্মীও ছিলেন না, লেখকও ছিলেন না; রাজ-নৈতিক নেতা বা সমাজ-সংস্কারকরূপেও তিনি কখন আবির্ভূত হন নি কোনদিন। তাঁর সমকালীন ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজের ধর্মনেতাদের প্রসিদ্ধি ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে গেলে তিনি নজরেই পড়েন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আভিজাত্য, কেশবচন্দ্র সেনের সর্বজনবিদিত বাগ্মিতা ও গম্ভীর ব্যক্তিত্ব, স্বামী দয়ানন্দের বিশাল পাণ্ডিত্য ও তর্কে উৎসাহ— এ-সবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনের পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। আভিজাত্য, পার্থিব সম্পদ, বিদ্যাগৌরব, ঐহিক প্রতিষ্ঠা বা নামযশ, এ-সব কিছুই ছিল না তাঁর। সাধারণ লোক যা

দেখে মুগ্ধ হয়, সে-সব চোখ-ধাঁধানো উপকরণের একান্ত অভাব ছিল তাঁর জীবনে।

তবু এই সাধারণ জীবনের মধ্যেই অতি সূক্ষ্ম একটা কিছু ছিল, যা মহামূল্যবান ও গভীর অর্থপূর্ণ,—যা সাধারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সহজেই এড়িয়ে যায়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত তাঁর গুরুদেবের জীবন-চিত্র আঁকতে গিয়ে যে দ্বিধা অনুভব করেছিলেন, তা কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলতায় পর্যবসিত হতে পারে। যদি ধরা যায়, বিবেকানন্দের এ স্বীকৃতি বিনয়েরই প্রকাশ, তবু একথা নিশ্চিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এমন একটা কিছু আছে, জীবনীকারের চোখে যা সহজে ধরা পড়ে না। সাধারণ বড় লোকদের মতো জীবনের সব উপাদানই তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে আহরণ করেন নি। সেজন্য শুধু এই জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটুকু বিস্তারিত ভাবে দেখালে তাতেই তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ ছবি কখনও ফুটে উঠতে পারে না।

তাঁর জীবনের বহিঃসীমা চারিদিকের পার্থিব পরিবেশ স্পর্শ করে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে সে জীবনের সম্পর্ক-মূলক ব্যাখ্যা ও বিবৃতির সীমা ঐ পর্যন্তই। কিন্তু এ জীবনের অধিকাংশই রয়ে গেছে সাধারণ জীবনীকারের জ্ঞানের সীমার বাইরের এক জগতে, আর এইখানেই নিহিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সৌন্দর্য, গরিমা, শক্তি ও তাৎপর্য। প্রকাশ্য বহির্দেশে না থেকে এ জীবনের মহিমা লুকিয়ে আছে অন্তরের অতলস্পর্শী গভীরতায়। বাইরে অবশ্য তিনি আর পাঁচ জন মানুষের মতোই চলাফেরা করতেন ; কিন্তু তাঁর চিন্তা ও অনুভূতি উৎসারিত হত অতীন্দ্রিয় গভীরতা থেকে, আর দিব্যানন্দের বিভায় ভাস্বর করে রাখত তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে। কেন্দ্র থেকে বহির্দেশ পর্যন্ত তাঁর

সমগ্র সত্তাই আধ্যাত্মিকতার মাধুর্যে অপরূপ ; তাঁর সমগ্র সত্তা—কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার টানা-পোড়েনে বোনা। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমতুল্য সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে-কোন লোকের কাছে এ জীবনের বিষয়বস্তু অনধিগম্যই থেকে যাবে। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর গুরুভাইরা সকলে মিলেও এই জীবনের যথার্থ ও সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ কখনও করে উঠতে পারেন নি।

তা ছাড়া এ বিষয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে একটা বিকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলার সম্ভাবনাও রয়েছে বেশ। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্প মনে পড়ে। একজন অন্ধের ইচ্ছা হয়েছিল, দুধ দেখতে কেমন তা জানতে। তাকে বলা হল, দুধ বকের মতো সাদা। বক আবার দেখতে কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হল, বক দেখতে কাস্তের মতো। সাদৃশ্যের বিষয়-বস্তু বকের রং থেকে তার গলার আকৃতিতে চলে গেল। যাই হোক, অন্ধটি আবার জিজ্ঞাসা করল, কাস্তে দেখতে কেমন? বন্ধুটি এবার আর উপমা খুঁজে না পেয়ে নিজের হাতটি কাস্তের মতো করে বাঁকিয়ে অন্ধটিকে তা ছুঁয়ে দেখতে বলল। অন্ধটি বন্ধুর বাঁকানো হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দেখে আনন্দে বলে উঠল, "যাক, এখন পরিষ্কার বোঝা গেল। দুধ বাঁকানো হাতের মতো একটা কিছু হবে।" গল্পের উপমাটি একেবারে ঠিক ঠিক। আধ্যাত্মিকতায় যিনি অন্ধ, তিনি যদি শুধু বহির্জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা করতে চান, তা হলে তাঁর সেই ধারণা স্বভাবতই এমনি হাস্যকর বিকৃতি লাভ করবে। এমন লোকেরও অভাব ছিল না, যাঁরা সত্যসত্যই শ্রীরামকৃষ্ণকে বাতিকগ্রস্ত বা পাগল বলে স্থির করেছিলেন! তাঁরা নিশ্চয়ই গল্পটির ঐ অন্ধটির পর্যায়ে পড়েন।

পঞ্চাশ বছরের স্বল্পপরিসরের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুজাতির

আধ্যাত্মিকতার সমগ্র ইতিহাসটি নিজ জীবনে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনের অতলস্পর্শী গভীরতা ও অন্তহীন বিশালতা ধারণায় আনা যায় না। জগতের রহস্য ভেদ ও অস্তিত্বের চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর জীবনের মর্ম পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। স্বজ্ঞার তীব্র আলোকসম্পাত করে দেখতে হবে তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক সংগঠন। আধ্যাত্মিকতার পথে যত বেশী এগিয়ে যাওয়া যাবে, এ জীবনের মূল্য ও তাৎপর্য চোখে পড়বে তত বেশী।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে হবে, এবং যথাসম্ভব ধারণায় আনার চেষ্টা করতে হবে তাঁর অতুলনীয় জীবনের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি। অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী তাঁর কয়েকজন শিষ্য এই অসাধারণ জীবনীর কিছু উপাদান লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

আশ্চর্য শিশু

বাংলার এক অখ্যাত শান্ত পল্লীতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুআরির ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক জগতের ঠিক বিপরীত এক জগৎ ছিল তাঁর জন্মভূমি। প্রাচীন যুগের সরলতার ভিত্তিকে এখনও সে আঁকড়ে আছে। হুগলি জেলার অন্তর্গত কামার-পুকুর গ্রাম এটি,—রেলস্টেশন থেকে মাইল পঁচিশ দূরে অবস্থিত। চারিদিকের ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাল-ও আম্রকানন-শোভিত এই পল্লীটি মধ্যযুগের পরিবেশ আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এক-শ বছরেরও আগে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-দম্পতি, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রাদেবী, পুত্রকন্যাদিসহ এই গ্রামে বাস করতেন। খুব ছোট ছিল তাঁদের পরিবার। ক্ষুদিরাম গ্রামে পৌরোহিত্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখনকার দিনে ভক্তিমান ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভ্রমের

কাজ ছিল এটি, যদিও অর্থাগমের দিক থেকে মোটেই সুবিধের ছিল না। কাজেই সসম্মানে বসবাস করলেও আর্থিক অবস্থা তাঁর সচ্ছল হয় নি কখনও; কোনরূপে সংসার চলে যেত, এই পর্যন্ত।

বাড়ি বলতে ছিল খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘব কয়েকখানি। তার একদিকে একটি জলাশয়, অপরদিকে গ্রামের পথ। গ্রাম্য পথের ওধারে এক জীর্ণ শিবমন্দির। মন্দিরটি এখনও আছে। গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদিরাম ও তাঁর সহধর্মিণীর অনাড়ম্বর ভক্তিময় জীবনধারা বয়ে চলত এখানে। তাঁদের সহজাত সরলতা, সততা, ভালবাসা ও বদান্যতা প্রতিবেশীদের মুগ্ধ করে রাখত।

বাড়ির একপাশে একটি ছোট ঢেঁকিশাল। একটি ঢেঁকি ও ধান সিদ্ধ করার একটি উনুন থাকত সেখানে। উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে পরিচিত বিখ্যাত সন্তানকে চন্দ্রাদেবী এই চালারই এককোণে প্রসব করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত পিচ্ছিল শিশু উনুনটির ভেতর আত্মগোপন করে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বিভূতি-ভূষিত অবস্থায় তাকে বাইরে আনা হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই শিশু কি সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিল, না সাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে নিজেকে গোপনে রাখতে প্রয়াসী হয়েছিল? সে কথা কে আর বলবে!

জন্মস্থানের পরিবেশটি একেবারে সেকেলে ধরনের হলেও তার চারিদিক ছিল তখন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-সম্ভারে ভরা। বাংলায় তখন বসন্তকাল এসেছে। শীতের সুদীর্ঘ আড়ষ্টতা কাটিয়ে তরুরাজি নব-পত্রোদ্গমে ও মনোরম কুসুম-মঞ্জরীতে অপরূপ রূপ-লাবণ্যে ভরে উঠেছে। তার শাখায় শাখায় ছন্দ জেগেছে বিহগকুলের কলতানে। যেন নবজীবন ও সজীবতার স্পর্শে সব কিছুই আনন্দে উথলে পড়ছে। এই বসন্ত-মহোৎসবের সময় প্রকৃতিদেবী তাঁর মাননীয় অতিথিকে বরণ করে নিলেন।

মাতা ও পিতা উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-বিষয়ে অনেক কিছু অলৌকিক দর্শন লাভ করেছিলেন। আধুনিক পাঠকদের বিশ্বাসের ওপর অত্যধিক চাপ না দিয়েও একথা বলা চলে যে, সূতিকাগারের আদিম যুগোপযোগী পরিবেশ বেথলেহেম ও পবিত্র অশ্বশালার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

হিন্দুরা পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য গয়ার বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে যে-দেবতার পাদপদ্মে পিণ্ডদান করে থাকেন, তাঁরই নামে যথাকালে এই শিশুর নাম রাখা হল 'গদাধর'। গয়ায় তীর্থদর্শনে গিয়ে ক্ষুদিরাম গদাধরের দর্শন-লাভ করেছিলেন, এবং অনাগত এই শিশুর কথাও জানতে পেরেছিলেন সেই সময়। গদাধর ক্রমে বড় হয়ে প্রাণোচ্ছল বালকে পরিণত হলেন। সুদর্শন, রঙ্গপ্রিয় এই বালকটি সব সময় প্রাণের প্রাচুর্যে ভরে থাকতেন, নির্দোষ হাস্যকৌতুক ও স্নেহময় ব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ করে রাখতেন। তাঁর আকৃতি ও আচরণে অল্প পরিমাণ নারীসুলভ স্নিগ্ধতা ছিল। সেজন্য মেয়েরা তাঁকে পছন্দ করত বেশী। তের বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রতি এই স্নেহপ্রদর্শনের পথে কোন লজ্জা বা শালীনতার মনোভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

যাই হোক, বালকের প্রথম কয়েক বছরের জীবনে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না—পাড়ার আমুদে ছেলে একটি, সকলের স্নেহের দুলাল—এই পর্যন্ত। তারপর একদিন হঠাৎ তিনি ভাবের রাজ্যে চলে গেলেন। এর পর থেকেই তাঁর জীবন সাধারণ জীবনের পথ থেকে বাইরে চলে গেল।

একদিন গ্রীষ্মকালে পাঁচ-ছয়জন সাথীকে নিয়ে টেকোয় মুড়ি খেতে খেতে গদাধর ধান-ক্ষেতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মুড়ি চিবুতে চিবুতে মাঠের ভেতর দিয়ে আলপথ ধরে সহজ ভাবেই চলেছিলেন তিনি, এমন সময় হঠাৎ এক টুকরো ঘন কালো মেঘ উঠে দেখতে দেখতে গোটা

আকাশ ছেয়ে ফেললো। গদাধর একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন—কেমন করে মেঘের ওপর মেঘ এসে জমছে, এমন সময় কোথা থেকে এসে এক ঝাঁক ধবধবে সাদা বকের সার সেই কালো মেঘের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেল। এই বর্ণবৈষম্য যে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করল, বালকের মন গেল তাতে তন্ময় হয়ে। আনন্দে বিভোর হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। সে অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকেরা তাঁকে তুলে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই। এর ভেতর ভাববার কথা আছে অনেক। প্রকৃতির অতি মনোরম শোভা দেখে কোন কোন কবির ভাবসমাধি হবার কথা শোনা যায়। কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের মনের এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতার পেছনে রয়েছে সে-বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা, চিন্তা, কল্পনাশক্তির পরিবর্ধন ও ভাবের সাধনা। ছয়-সাত বছরের একটি ছেলের পক্ষে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য দেখে ভাববিহ্বল হয়ে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে যাওয়াটা বোধ হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলাভের একটি অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। কিভাবে এটি সম্ভব হল? এ প্রশ্নের উত্তর নেই নিশ্চয়ই। ব্যাখ্যা করার সব আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ এখানে। যদি বালককে মানসিক বা স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত বলে ধরে নেওয়া না হয়, তা হলে এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এই সহাস্যবদন বালকেব ছোট শরীরটির ভেতর কী অসীম বিস্তার, আর কী অতলস্পর্শী গভীরতাই না লুকিয়ে ছিল!

যাই হোক, তাঁর জীবনে ভাবরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হল এই প্রথম, আর সেটা ঘটল গভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে। সুন্দরের প্রতি এই সহজাত প্রীতি দেখেই বোঝা যায় যে, কবি-মন নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বাল্যজীবনের আরও কয়েকটি বিশেষ ঘটনায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুমোরদের কাছে বসে থেকে তিনি মূর্তি গড়া

ও তাতে রং লাগানো লক্ষ্য করতেন। কালে এ বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সঙ্গীত ও কাব্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল। গ্রাম্য রাখালদের গাওয়া গান তিনি গেয়ে বেড়াতেন, রামায়ণ-মহাভারতের ভাল ভাল অংশ বেছে নিয়ে তা আবৃত্তি করতেন। কখন সাথীদের সঙ্গে মিলে পুরাণের চিত্তাকর্ষক অংশগুলির অভিনয়ও করতেন, এতে আনন্দও পেতেন অফুরন্ত।

ন-বছর বয়সে গ্রামের এক যাত্রাভিনয়ে একবার তাঁকে শিবের ভূমিকায় নামতে হয়েছিল। অভিনয়ের সময় দেখা গেল, মাথায় জটা পরে, কোমরে বাঘছাল জড়িয়ে, বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হয়ে, ত্রিশূল হাতে নিয়ে ধীর গম্ভীব পদে তিনি আসরে প্রবেশ করছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মন সাধারণ জগৎ থেকে উঠে গেল; যাঁর ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন, সেই শিবেব চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। শিব তাঁর সারা মন অধিকাব করে বসলেন। ফলে শরীর স্থির নিস্পন্দ হল, গণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো আনন্দাশ্রু, আর মুখে ফুটে উঠল একটা দিব্য বিভা। এগুলি না থাকলে ধরে নিতে হত যে, তিনি মৃত! এই পূর্ণ আত্ম-সমাহিত ভাব প্রায় তিন দিন ছিল।

গ্রামের কয়েকজন মেয়ে একবার পাশের গ্রামে চলেছেন বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে। তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে গদাধরের আর একবার এই রকম ভাবসমাধি হয়েছিল। দেবীর উদ্দেশে ভজন গাইতে গাইতে চলেছেন সবাই, হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে গদাধর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গণ্ড বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। মৃগী রোগীকে সুস্থ করার জন্য মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া, মাথায় বাতাস করা ইত্যাদি যা কিছু করণীয়, তা সবই করা হল। কিন্তু বালকের বাহ্যজ্ঞান কিছুতেই ফিরে এল না। মেয়েরা শেষে মরিয়া হয়ে যখন বালকের কানে দেবীর নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, তখন তাঁর মন ধীবে ধীরে আবার সাধারণ জ্ঞানের ভূমিতে ফিরে এল।

ঘন ঘন এ-রকম ভাবসমাধি হতে দেখে গদাধরের মাতাপিতা নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এজন্য গদাধরের নিজের কোন অস্বস্তি ছিল না। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার আগে যে বিপুল আনন্দে তাঁর মন আপ্লুত হত, সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন তিনি। কোন দেবতার ধ্যানের চেষ্টামাত্র সেই দেবতাকে মানস-চক্ষে দেখতে পেতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল ভাবের তরঙ্গে তাঁর চেতনা হারিয়ে যেত। এত স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে এসব ঘটত যে, এর ভেতর কোন অসাধারণত্ব আছে বলে তিনি ভাবতেই পারতেন না। তা ছাড়া ভাবের উপশমের পরেই তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হয়ে উঠতেন। বাড়ির লোকদের তাই বলতেন, তাঁরা যেন এ বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন না হন। এই ভাবসমাধি তাঁর শিশুমনের ওপর একটা দিব্য ভাবের ছাপ রেখে যেত সন্দেহ নেই; কিন্তু এতে তাঁর মনের শিশুসুলভ ভাব একটুও ব্যাহত হত না। মনের আনন্দে তিনি একই ভাবে হেসে খেলে বেড়াতেন, যেন ইতোমধ্যে জীবনের স্বাভাবিকতাকে বিপর্যস্ত করার মতো কিছুই ঘটে নি। ভাবাবেশের ফলে তাঁর মনে উৎসাহহীনতা আসে নি, স্বভাব উগ্র হয় নি; তাঁকে প্রলাপ বকতেও দেখা যায় নি। গদাধরের বিশ্বাস ছিল যে, ভাবসমাধিসহায়ে তিনি দেবত্বের সংস্পর্শ লাভ করতেন। এ-কথাও তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর এই বাহ্যসংজ্ঞাহীনতার ভেতর একটা অতিমানবতার ভাব আছে। তা সত্বেও তাঁর আচরণে এতটুকু অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেত না।

এই ভাবসমাধির যথার্থ রূপ জানতে হলে ফলিত-মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে যেসব মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলির ওপর নির্ভর না করে এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে যা বলেছেন, তাতে আস্থাবান হওয়াই বোধ হয় ভাল। তা নিরাপদও বেশী। ঐ পণ্ডিতেরা বরং শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবনালোকে নিজেদের পর্যবেক্ষণ-

সম্ভূত মতগুলি একটু পালটে নিতে পারেন। এঁদের মতানুসারে বালক গদাধরের চিকিৎসা করালে কি যে ঘটত বলা কঠিন। ইওরোপের জনৈক পণ্ডিতের মতে সে চিকিৎসায় বালকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার শিখা নির্বাপিত হয়ে যেত, আর জগৎ বঞ্চিত হত শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য অবদান থেকে। একই যুক্তি দ্বারা অবশ্য এ-কথাও বলা চলে যে, এ ধরণের চিকিৎসা গদাধরের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিত না; বরং মহাপুরুষদের অতিমানসিক অনুভূতির আলোক-সম্পাতে কতকগুলি গভীর তথ্যের সন্ধান এনে দিয়ে ফলিত মনোবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলত। অবশ্য এ-দুটির ভেতর কোনটিকেই ঠিক বলে সহসা সিদ্ধান্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। গদাধরের ভাবসমাধিকালে বাস্তবিক যা ঘটত তা লক্ষ্য করে, এবং তিনি নিজে এ বিষয়ে যা বলেছেন তা শুনে নিজের বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কল্যাণকর বলে মনে হয়।

পুরী যাওয়ার পথে যে সব পরিব্রাজক সাধু ও তীর্থযাত্রীরা গ্রামের অতিথিশালায় এসে উঠতেন, তাঁদের সান্নিধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসাটা বালকের কাছে একটা মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের জন্য জল তুলে দিয়ে, রান্নার কাঠ সংগ্রহ করে দিয়ে সাধুদের সেবা করতে খুব ভাল লাগত তাঁর। তাঁদের ভজন, স্তোত্রপাঠ ও ধর্মপ্রসঙ্গ পরমানন্দে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন তিনি। তাঁদের আলাপ-আলোচনা থেকে সাধুদের কাহিনী, তীর্থবর্ণনা ও ধর্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আহরণ করে তিনি সঞ্চয় করে রাখতেন তাঁর শিশু-মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে। পর্যটক-জীবনের রহস্য তাঁকে অভিভূত করে ফেলত। এই সব ধর্মপ্রাণ মহাত্মাদের জীবন দেখে তাঁর শিশুমনের কল্পনায় ত্যাগ ভক্তি পবিত্রতা ও চিত্তপ্রসাদের রাজ্যের একটা মনোরম ছবি ভেসে উঠত। এভাবে বালক গদাধরের নমনীয় মনের ওপর হিন্দু-

সন্ন্যাসী ও ভক্তদের সনাতন জীবনধারার একটা সুস্পষ্ট স্থায়ী ছাপ পড়ে যায়।

ন-বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। তখন থেকে গৃহদেবতার সেবার সুযোগ পেলেন তিনি। পূজা করবার অধিকার পেয়ে মন পরমানন্দে ভরে উঠল। জগদীশ্বরের দিব্য মহিমার ধ্যানে এবং রঘুবীরের নিত্য-পূজার মাধ্যমে তাঁর চরণে নিজ হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তি নিবেদন করে তিনি আনন্দে মেতে উঠতেন। এইটিই তাঁর বিশেষ গুণ, তাই এ-কাজ করার সময় তাঁর উৎসাহ যেন উপচে পড়ত। কখন কখন দেবতার ধ্যানে তাঁর মনপ্রাণ তন্ময় হয়ে যেত। তখন অতীন্দ্রিয় দর্শনের আলোকে তাঁর শৈশবের চিত্ত উদ্ভাসিত হত। তা ছাড়া প্রত্যেকটি স্থানীয় ধর্মানুষ্ঠান, বিশেষ করে যেখানে বহুলোকের সমাবেশ হত, দুর্বার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেত তাঁকে।

অবশ্য অন্য সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন; বিদ্যালয়ে কোন রস পেতেন না; বিশেষ করে গণিত-শাস্ত্র একেবারেই ভাল লাগত না তাঁর। হিসাব করা তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধ বিষয় ছিল; গণিত-শাস্ত্রের সঙ্গে তা জড়িত বলেই বোধ হয় এরূপ হত। বুদ্ধির অভাবহেতু তিনি বিদ্যাভ্যাসে পরাঙ্মুখ হয়েছিলেন, তা বলা চলে না; বরং অনন্য-সাধারণ স্মৃতি, কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। পর্যটক-গায়কদের কাছে মহাকাব্য ও পুরাণের গল্প একবার মাত্র শুনে নিয়েই তিনি তা হুবহু আবৃত্তি করতে পারতেন। কয়েকটি গ্রাম্য বালককে নিয়ে গড়া তাঁর নিজের একটি যাত্রার দল ছিল। তার জন্য গান ও নাটক রচনা করতেন তিনি নিজেই। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সভায় ঘোর বিতর্ককালে অনেক সময় তিনি যীশুখৃষ্টের মতো স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সমাধানে কোন কোন জটিল প্রশ্নের সহজ মীমাংসা করে দিতেন। তখন বয়সের তুলনায় তাঁর বিচারশক্তির সমধিক বিকাশ দেখে অবাক্

হয়ে যেতেন সবাই। তিনি যে ক্ষুরধার-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবুও বিদ্যালয় তাঁর ভাল লাগত না। এ ভাল না লাগার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কলকাতায় এসে টোল খুললেন। সপ্তদশবর্ষীয় গদাধর টোলে এসে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, কোনরূপ 'চাল-কলা-বাঁধা' বিদ্যা লাভ করার ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁর জীবনের একমাত্র দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল ভগবান লাভ করা। কাজেই অভীষ্টপথে যা সহায়ক নয়, সে-সব বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না মোটেই। যেসব পণ্ডিতদের সাহচর্যে তিনি আসতেন, তাঁদের তিনি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। কাজে ও কথায় তাঁদের জীবনে কোন মিল আছে কি না, মনোযোগ দিয়ে তিনি তা লক্ষ্য করতেন; দেখতেন, পবিত্রতা ও ভক্তিভাবের একান্ত অভাব রয়েছে সেখানে। এদিকে ভক্তি ও পবিত্রতাকেই তিনি আসন দিতেন জগতের আর সব কিছুর ওপরে; কারণ—তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, এ-সব গুণের অধিকারী না হলে কেউ কখনও ভগবান লাভ করতে পারে না।

পাণ্ডিত্যের প্রতি বালক গদাধরের এই মনোভাবের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল তাঁর জীবনের স্থির বিশ্বাসের ওপর। ভক্তিহীন, পাপমলিন এই সব পণ্ডিতদের অন্তঃসারশূন্যতা উত্তরকালে তিনি অনাবৃত করে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তর্ভেদী মন্তব্য-সহায়ে। তিনি বলতেন, চিল-শকুনি যেমন খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি পড়ে থাকে সব সময় ভাগাড়ের পচা মড়ার ওপর, তেমনি ভক্তিহীন পণ্ডিতেরা বুদ্ধির পাখায় ভর করে অনেক উঁচুতে উঠতে পারলেও তাঁদের মন কিন্তু সব সময় বদ্ধ হয়ে থাকে ইন্দ্রিয়-জগতের হীন বিষয়ের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলিকে পাশ (বন্ধন) বলে কখন কখন পরিহাস করতেন তিনি; কারণ সেগুলি মনে অভিমান জাগিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা

সৃষ্টি করে। আধ্যাত্মিকতা-বিবর্জিত পণ্ডিতদের দোষগুলি তিনি এভাবে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতেন। অবশ্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিনয়, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতা ও ভগবদ্ভক্তি থাকলে তিনি পণ্ডিতকে স্থান দিতেন খুব উঁচুতে। এই জন্যই রামকৃষ্ণদেব শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলেন মহাপ্রাণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, এবং তাঁর সামনেই বলেছিলেন, যে-সংশিক্ষা মানুষকে উন্নত করে, তা সত্যি তিনি পেয়েছেন। তা ছাড়া শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মাত্মাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে খুবই ভালবাসতেন তিনি। তবু দেখা যায়, ভগবান লাভের জন্য পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অধ্যাত্ম-সাধনার ওপরই তিনি জোর দিতেন বেশী। তাঁর একজন শিষ্যের শাস্ত্রপাঠে অত্যধিক আসক্তি দেখে তা নিয়ে ঠাট্টাও করেছিলেন একবার। মন তাঁর ভরে থাকত দিব্যভাবের সুরলহরীতে। সেজন্য আর কোন ভাব-তরঙ্গের স্থান ছিল না সেখানে; অন্য সব সুরই কর্কশ ঠেকত তাঁর কানে, এমন কি বুদ্ধির মার্জিত সুর হলেও। সে সুর যদি তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে একই পর্দায় বাঁধা থাকত, তা হলে অবশ্য অন্য কথা। এ বৈশিষ্ট্য তাঁর ভেতর শিশুকাল থেকেই দেখা যেত। গদাধরের মনের গঠনই ছিল এমনি যে, তাঁর প্রাণের আধ্যাত্মিক আকুলতার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললে তিনি কোন কিছুই সইতে পারতেন না। শুধু জীবিকার্জনের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি এই পর্যায়ে পড়ে বলে সেগুলির সংস্পর্শ গদাধরের স্নায়ুতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত।

তরুণ পূজারী

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার প্রধান পূজারীর পদে ব্রতী হয়ে কলকাতার নিকটে একটি নবনির্মিত মন্দিরের কাজের

ভার গ্রহণ করেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন কলকাতার এক সমৃদ্ধিশালিনী মহিলা, রানী রাসমণি; রানী অনুচ্চকুলজাত ছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্ঠাবান মন সে মন্দিরের সীমানার ভেতর বাস করতে চাইল না। ছোট ভাইকে রাজী করিয়ে নিজের কাছে এনে রাখতে রামকুমারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির একটা নিজস্বতা ছিল। কোন ভাব, বিশেষ করে এদেশের ধর্মাচরণের কোন সনাতন ভাব মাথায় একবার ঢুকলে তিনি তা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন। কাজেই দাদার প্রস্তাবে রাজী হলেও তাঁর মনে প্রতিবাদ মাথা তুলেই রইল। নিজ ধর্ম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করলেন তিনি। রানী রাসমণির কালীবাড়িতে দাদার সঙ্গে একত্র বাস করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বহুদিন পর্যন্ত সেখানে দেবীর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন নি, জিদ করে গঙ্গাতীরে নিজে রান্না করে খেতেন। নিষ্ঠায় দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ছোটখাট ধর্মবিশ্বাসকেও তিনি জোর করে আঁকড়ে থাকতেন, যতক্ষণ না তার অন্তরে প্রবেশ করে সেটা ত্যাগ করার মতো কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পেতেন। নিজের কোন বদ্ধমূল ধারণা আধ্যাত্মিকতার পথে সত্যই বাধা সৃষ্টি করছে—একথা মনে হলে সে বিশ্বাসকে গুঁড়ো করে ফেলতেও তাঁর বিলম্ব হত না। সেজন্য তিনি দেশ-প্রচলিত জাতিবিচার-প্রথা বহুদিন পর্যন্ত মেনে চলেছিলেন। অবশ্য ধীরে ধীরে মন্দিরে দেবতার প্রকাশে স্থির বিশ্বাস এল তাঁর; এতে জাতিবিচার-সম্পর্কিত দ্বিধার ভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ হল।

পরবৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, তাঁকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করা হয়েছে; এই বছরই রামকুমারের দেহত্যাগ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন সবে কুড়ি বছর। তখন থেকে আরম্ভ করে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িই ছিল তাঁর আবাসস্থল ও অধ্যাত্মসাধনার প্রধান পটভূমি। মন্দিরের দায়িত্বগ্রহণের

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দ্বিতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি শুরু হল। মন্দিরের পরিবেশ ও দেবসেবার অনুষ্ঠানগুলি তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে সেখানে স্পন্দন জাগাতে লাগল।

কুড়ি বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ যে দেবালয়ের প্রধান পুরোহিতের পদে বৃত হলেন, কলকাতার চার মাইল উত্তরের শহরতলী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সেটি প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন দেবতার উপাসনার জন্য মন্দির-এলাকায় অনেকগুলি মন্দির স্থাপিত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দিরটি জগন্মাতা কালীর জন্য নির্দিষ্ট বলে স্থানটি আজকাল 'দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি' নামেই পরিচিত। গঙ্গার পূর্বতীরে নদীর কোল জুড়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কালীবাড়ির সীমানা। তার উত্তরে ও পূবের কিছুটা অংশ জুড়ে ফুল ও ফলের বাগান। দুটি পুকুরও আছে। দক্ষিণের সীমানা ইট দিয়ে বাঁধানো; তার ঠিক মাঝখানে মনোরম একটি স্নানের ঘাট। চাঁদনি থেকে শুরু হয়ে সারি সারি সুদীর্ঘ ধাপগুলি গঙ্গাগর্ভে নেমে গেছে। চাঁদনিটির উপরে ছাদ, চারিদিক খোলা। চাঁদনির দুপাশে প্রত্যেক দিকে ছ'টি করে দু-সার শিবমন্দির। চাঁদনি ও শিবমন্দিরগুলির সামনে চকমিলানো প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠান। উঠানটি চতুষ্কোণ, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এই উঠানের মাঝখানে দুটি প্রাসাদোপম মন্দির। একটি দক্ষিণমুখী কালীমন্দির; অপরটির মুখ গঙ্গার দিকে, সে মন্দিরটি রাধাকান্তের। কালীমন্দিরের ঠিক দক্ষিণে অনেকগুলি-স্তম্ভ-বিধৃত প্রশস্ত নাটমন্দির। বাঁধানো উঠানের পশ্চিম ছাড়া আর সবদিক জুড়ে অনেকগুলি ঘর—রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর এবং মন্দিরের কর্মচারী ও অতিথিদের থাকার ঘর। আর একটু এগিয়ে গেলে, আজও দেখতে পাওয়া যায়, উঠানের উত্তর-পশ্চিম কোণে, শেষ শিবমন্দিরের ঠিক পরেই গঙ্গার দিকে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বারান্দা-সংযুক্ত একটি বাহুল্য-বর্জিত ঘর রয়েছে। এই ঘরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবনের বহুলাংশ অতিবাহিত করেছেন।

বাড়িগুলির বিন্যাসপ্রণালী ও স্থাপত্যশিল্প এবং কলনাদিনী প্রবাহিনী-তীরে সেগুলির অবস্থান—সব মিলে একটি অতি মনোরম শোভা সৃষ্টি করেছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরের শ্রেণীবদ্ধ সমাকৃতি চূড়াগুলির পিছনে কালীমন্দিরের নয়টি গম্বুজ সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শিব-মন্দিরগুলির মাঝখানে চাঁদনিটি থাকায় শিল্পনৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়েছে, চূড়াগুলির একঘেয়েমিও কেটে গেছে। ফলে কালীবাড়ির সামনের দৃশ্যটিতে এসেছে একটি গাম্ভীর্যময় মনোহারিত্ব। গঙ্গাগর্ভের নৌকাযাত্রীরা এবং গঙ্গার পরপারের পথচারীরা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে।

প্রধান মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী কালীমূর্তি স্থাপিত। স্বর্ণখচিত বহুমূল্য বসনে ও বিবিধ ভূষণে শোভিত তাঁর অঙ্গ। রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্মে শিব শুয়ে আছেন। মা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অমল ধবল বুকের ওপর। মায়ের মূর্তির ভাব বর্ণনা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাতে ধ্বংসের রক্তহিমকরা আতঙ্কের সঙ্গে স্নেহময়ী জননীর স্নিগ্ধ আশ্বাস মিশে আছে। জগতের সমষ্টীভূতা আদি শক্তি তিনি। তিনি সংহারকর্ত্রী; আবার সৃষ্টি এবং পালনও তিনিই করেন। তিনি ভীষণা আবার মধুরা। গলায় তাঁর মুণ্ডমালা, কটিবন্ধে নরহস্তের মেখলা। মা চতুর্ভুজা। বাঁদিকের নীচের হাতে ছিন্ন নরমুণ্ড, অপর হাতে রক্তরঞ্জিত খড়্গ। ডানদিকের এক হাতে তিনি বরদান করেন, অপর হাতে দেন অভয়। পায়ের তলায় স্বামী-দেবতা শিবকে দেখতে পেয়ে তিনি লজ্জিতা হয়েছেন, এবং ভারতীয় রমণীর মতো জিভ বের করে দাঁতে চেপে ধরে হৃদয়ের সে কোমল ভাব প্রকাশ করছেন। তাঁর ত্রিনয়ন দুষ্টের হৃদয়ে ত্রাস জাগায়, আবার ভক্তের শিরে স্নেহাশিসও বর্ষণ করে। এভাবে সানুগ্রহ নির্দয় মহিমাবৃতা হয়ে দেবী কালিকা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কেন্দ্রস্থলে বৈভবময় মন্দিরতলে দাঁড়িয়ে আছেন। নিত্য সমাগত শত শত ভক্ত ও তীর্থ-যাত্রীদের কাছে তিনি 'ভবতারিণী' নামে পরিচিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিশ্বের সমষ্টীভূতা আদি শক্তির প্রতীক মা-কালী ছাড়া মন্দিরসীমানার মধ্যেই আলাদা একটি মন্দিরে ছিলেন দিব্য প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ। আর ছিলেন গঙ্গার দিকের দ্বাদশটি মন্দিরের প্রত্যেকটিতে নির্গুণ চরম সত্যের প্রতীক শিব। তান্ত্রিকদের ভীষণা অথচ মধুরা ঈশ্বরী, বৈষ্ণবদের প্রাণ-মন-হারী দিব্য বংশীধর এবং শৈবদের সর্বত্যাগী আত্মসংস্থ ঈশ্বর—হিন্দু-ভক্তদের এতগুলি বিভিন্ন আদর্শ তাঁর চোখের সামনে একত্র অবস্থান করত। সমগ্র স্থানটি জুড়ে ধ্বনিত হত হিন্দুদের তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মভাবের সু-সমঞ্জস সুরের মিলিত ঐকতান। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্মমতের, সর্ব-ধর্মভাবের যে সর্বতঃপ্রসারী অনুভূতি লাভ করেছিলেন, বোধ হয় তারই উপযুক্ত পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এভাবে। দেবতাদের এই পরিবারে ভবতারিণী বা মা-কালীই ছিলেন সর্বেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল হৃদয় অধিকার করে তিনিই সে-হৃদয়ের মহিমময়ী অধীশ্বরী হয়ে উঠেছিলেন।

ভোর থেকে শুরু করে রাত্রি নটা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর সেবা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিদিন তাঁকে স্নান করাতেন, সাজাতেন, খাওয়াতেন এবং বিশ্রামের জন্য রূপোর খাটে শুইয়ে দিতেন। নিত্যকর্ম ও ভজনাদি তিনি যথাবিধি করে যেতেন অতি যত্নসহকারে। সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন স্তব ও মন্ত্রগুলি। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে, এবং সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে দেবীর সম্মুখে বিধিমতো ধূপ-দীপ নিয়ে তিনি আরতি করতেন। সে সময় এই অনুষ্ঠানের মাধুর্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নহবতখানা থেকে ভেসে আসত সানাই-এর মৃদু মর্মস্পর্শী সুর-লহরী। সুগন্ধি পুষ্প ও সুদৃশ্য মাল্যে মাকে প্রতিদিন সাজাতেন তিনি। দেবসেবার এইসব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির বিরতি সূচিত হত শঙ্খ-ও ঘণ্টা-ধ্বনিতে। এভাবে সঙ্গীত ও সুগন্ধে তাঁর চারিদিকের আকাশ-বাতাস ভরে উঠত, পূজা-পদ্ধতির অতুলনীয় মাধুর্য চারিদিক থেকে আনন্দ

পরিবেশন করে চলত তাঁর সৌন্দর্যবোধের কাছে। আর, সব কিছুর কেন্দ্রে, সব কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেন ভুবনমোহিনী জগন্মাতা, এই তরুণ পূজারীর একাগ্রমনা ভক্তি- ও পূজা-লাভেচ্ছু হয়ে, মোহিনী হাস্যে তাঁর সরলচিত্তে আনন্দের বিজলী খেলিয়ে।

অজানা সাগর-বুকে পাড়ি

শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে সব সময় মায়ের সেবা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, মায়ের মোহিনী হাস্য-সুধা আকণ্ঠ পান করত তাঁর মন। মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁর প্রাণে তীব্র ব্যাকুলভাব আগুন জ্বলে উঠল; মায়েব দর্শনলাভ ছাড়া আর অন্য কোন কিছুতে তা নিভবাব নয়। সাধারণ পুরোহিতের মতো শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতির বিধিবদ্ধ পথে শ্লথপদে চলে পরিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না তিনি; সাধারণ পূজারীর মতো মার কাছে ধন, মান ও পার্থিব সফলতা কামনা করাব ভেতরেও কোন রসবোধ আনতে পাবছিলেন না। তাঁর মন সর্বক্ষণ এসব তুচ্ছ কামনার নাগালের বহু ঊর্ধ্বে উঠে থাকত। ভগবানকে সামনাসামনি দেখার জন্য তাঁর প্রাণের আকুলতা বেড়েই চলল। মায়ার যে পর্দাটির আড়াল থাকায় জীবন্ত দেবীকে দেখতে পাওয়া যায় না, সে পর্দাটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য দুর্বাব আগ্রহ তখন কেশরীর মতো অস্থির পদসঞ্চারে তোলপাড় করে দিচ্ছে তাঁর হৃদয়; পাষাণ-প্রতিমায় একটুখানি প্রাণের স্পন্দন দেখার জন্য তিনি তখন অধীর হয়ে উঠেছেন। মন তাঁর কিছুতেই মানতে চাইত না যে ধর্ম শুধু কল্পনা-বিলাস, জগন্মাতাব অস্তিত্ব শুধু রূপকথার কাহিনী--শুধু মানুষের মনগড়া স্বপ্নমাত্র। বালকের মতো তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন যে রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য ভক্তেরা মায়ের দিব্যদর্শনলাভে সত্যই ধন্য হয়েছিলেন। কাজেই সে মহানন্দময়

দর্শন লাভে তিনিই বা বঞ্চিত হবেন কেন? এ চিন্তা তাঁর হৃদয়ে শাণিত তীরের মতো এসে বিদ্ধ হত। তিনি স্পষ্ট অনুভব করতেন যে পরমানন্দময়ী মা কাছেই আছেন, অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। বারে বারে আশার আলো জেলে মা আবার নিরাশার অন্ধকারে সব ঢেকে ফেলছেন।

সংসারের সব কিছুই তখন তাঁর বিস্বাদ লাগছিল। মনে হত, অমৃতত্ব ও আনন্দের চিরন্তন উৎসমুখই যদি খুলতে না পারা গেল, তাহলে দিনের পর দিন এই দুর্বিসহ জীবনটাকে টেনে চলার কোন অর্থই হয় না। মায়ের করুণায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে বালকের মতো অসহায়ভাবে অবিরাম প্রার্থনায় তিনি মার কাছে অনুনয় জানাতেন অপার মহিমা নিয়ে দেখা দেবার জন্য। মায়ের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে বাঁধনহারা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন ভজন ও স্তোত্রাদির মাধ্যমে ব্যাকুল প্রার্থনায়। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে বেদনাশ্রুপ্লাবিত নয়নে হতাশ হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তেন; গড়াগড়ি দিয়ে করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করতেন: আর একটা দিন চলে গেল, মা, তোর দেখা পেলাম না! তীব্র আবেগের ঝড়ে তাঁর মন তখন সংসার থেকে উড়ে এসে বেদনা-সাগরের বুকে ভেসে চলেছিল, নির্মম তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হচ্ছিল। মায়ের দেখা না পাওয়ার বেদনায় তিনি এত কাতর হতেন যে বাহ্য জগতের অস্তিত্বই ভুলে যেতেন, ভগবদ্দর্শনের পথের বাধাগুলিকে প্রাণপণ প্রয়াসে সরিয়ে দিতে চাইতেন। কালীবাড়ির একপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ একটি পতিত কবরখানা ছিল, দিনের বেলাও ভয়ে কেউ সেদিকে যেতে চাইত না। সেখানে গিয়ে একটি আমলকী গাছের নীচে বসে সারারাত তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন। যাবার আগে উলঙ্গ হয়ে, এমন কি উপবীত পর্যন্ত খুলে রেখে যেতেন। মাতৃধ্যানে নিমগ্ন হবার আগে এভাবে লজ্জা-জাতি-ও ভয়-জনিত সর্ববিধ দুর্বলতাকে

তিনি পদদলিত করে যেতেন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণে কালীবাড়ির লোকেরা কে কি ভাবছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না।

হিন্দুদের চিত্তনিয়ন্ত্রণ-বিজ্ঞান যোগমার্গের সঙ্গে কোন পরিচয় তাঁর ছিল না ; শুধু হৃদয়ের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা সম্বল করে তিনি পথে নেমেছিলেন। নিজ অকপট হৃদয় যে পথ দেখাচ্ছিল, সেই বিপদসঙ্কুল পথ ধরেই নির্ভয়ে তিনি এগিয়ে চলেছিলেন। নিজের সর্বগ্রাসী অধ্যাত্ম-ক্ষুধার দাবদাহ তাঁকে দৈহিক সহ্যশক্তির প্রায় শেষ সীমায় এনে ফেলেছিল। ভাবাবেশে তাঁর বুক ও মুখ লাল হয়ে উঠত, অজস্র অশ্রু ঝরে পড়ত গণ্ড বেয়ে ; থেকে থেকে দেহে কম্পন জাগত, করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠত চোখের কোণে—মর্মন্তুদ ক্রন্দনে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। যাঁরা দেখতেন তাঁদের বুক ফেটে যেত। বিরহের এই তীব্র জ্বালা আর সইতে না পেরে একদিন তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে উন্মত্তের মতো নিজ জীবনের অবসান ঘটাতে ছুটে চললেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মা তাঁকে কৃপা করলেন। মায়ার পর্দা সরে গিয়ে চোখের সামনে দিব্যদর্শনের পথ অবারিত হল, সমাধির পরমানন্দসাগরে মগ্ন হলেন তিনি।

এই দর্শন সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে বলেছেন, "মার দেখা পেলাম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ; জলশূন্য করবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নেঙড়ায়, মনে হল হৃদয়টাকে ধরে কে যেন সে রকম করছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। অস্থির হয়ে ভাবলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নেই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তার ওপর পড়ল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করব ভেবে উন্মত্তের মতো ছুটে সেটা ধরতে যাচ্ছি, এমন সময়······ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল—কোথাও যেন আর কিছুই নেই!—আর দেখছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র—যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হতে তার উজ্জ্বল

ঊর্মিমালা তর্জন গর্জন করে গ্রাস করবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হচ্ছে! দেখতে দেখতে সেগুলি আমার ওপর আছড়ে পড়ল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলিয়ে দিলে! হাঁপিয়ে, হাবুডুবু খেয়ে, সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বাইরে যে কি হয়েছে, কোন দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন যে গেছে, তার কিছুই জানতে পারি নি! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলাম।"

দু'দিন পরে দিব্যানন্দময় সমাধি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যুত্থিত হলেন। সমাধিভঙ্গ-কালে প্রেমমধুর-কণ্ঠে তিনি আবেগ-কম্পিত স্বরে "মা" বলে ডেকে উঠেছিলেন। এভাবে তরুণ পূজারীর চিত্ততরণী আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার ঝড়ে তরঙ্গের তালে তালে নাচতে নাচতে অজানা সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে, ঝড়ের গতি যখন যেদিকে নিয়ে গেছে তখন সেদিকে চলেও অবশেষে নিরাপদ তটভূমে এসে ভিড়ল, দিব্যানন্দরূপ আনন্দধামের তীরে তাঁকে পৌঁছে দিল। দু'দিন বিশ্রামের অবকাশও তিনি পেলেন সেখানে। কিন্তু স্বল্পকালের আনন্দ-উপভোগ শেষ হতেই আবার সে ব্যাকুলতার ঝড় এল প্রবলতর বেগ নিয়ে, তটভূমি থেকে টেনে এনে আবার তাঁকে ভাসিয়ে দিল যাতনার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পারাবারে।

পুনরায় দেখা দিয়ে ধন্য করার জন্য মায়ের কাছে করুণ প্রার্থনায় দিনগুলি তাঁর আবার ভরে উঠল। প্রথম দর্শনের পর দর্শনেচ্ছা তীব্রতর হওয়ায় দিব্যানন্দের রাজ্যে পুনরায় পৌছুবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা দুর্দম হয়ে উঠল। পাগলের মতো হয়ে উঠলেন তিনি। মায়ের বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কখনো কখনো তিনি মাটিতে ঘসে মুখ রক্তাক্ত করে তুলতেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন শুনে চারিদিকে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে যেত। কিন্তু সে অবস্থায় মন থেকে বিশ্বজগৎ মুছে যেত বলে তাঁর মনে হত, লোকগুলি যেন স্বপ্নে দেখা বা ছবিতে আঁকা

মানুষের মতো অবাস্তব। তাদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করে চলতেন।

প্রথম দর্শনের অব্যবহিত ফলস্বরূপ তাঁর অন্তরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ও বিরহযন্ত্রণার অস্থিরতা আরও বেড়ে উঠলেও সে দর্শন তাঁকে অজ্ঞাত-পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছিল অধ্যাত্মচেতনার এক নতুন দেশে। বিরহযন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত; তখন উচ্চ ভাবভূমিতে উঠে জগন্মাতার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতেন তিনি। এভাবে বারে বারে ভাবসমাধিস্থ হয়ে তিনি চিন্ময়ী মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করতেন। দেখতেন মা হাসছেন, কথা কইছেন, অশেষ প্রকারে তাঁকে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিচ্ছেন। কখনো বা পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতের মতো জ্যোতি দেখতেন, কখনো বা দেখতেন কুয়াশার মতো জ্যোতিতে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। আবার কখনো বা গলিত রূপার মতো উজ্জ্বল জ্যোতিতরঙ্গ দিক্-দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে ফেলত। চোখ বুজেও দেখতেন, আবার চোখ মেলেও এই সব দেখতে পেতেন।

তাঁর শুদ্ধ মন সাধারণ মনের সীমা ছাড়িয়ে আরো বহু, বহুদূরে চলে গেল; আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এতদিন সে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, নিঃসংশয়ে তার নাগাল পেল সেখানে।

এখন ধ্যান করতে বসলেই মা তাঁকে দেখা দিতেন। শুধু দেখা দেওয়া নয়, তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন, দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয়ে উপদেশও দিতেন। এই সময় ধ্যানকালে তাঁর এক বিচিত্র অনুভূতি হত। অনুভব করতেন, শরীরের গ্রন্থিগুলি কে যেন তালা বন্ধ করে দিচ্ছে, যাতে ধ্যানকালে ঈষন্মাত্র অঙ্গচালনাও সম্ভব না হয়; বন্ধ করার শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনতে পেতেন। তারপর নিশ্চল ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। যতক্ষণ না আবার বিপরীত দিক থেকে ঐরূপ শব্দ শুনতে পেতেন এবং অনুভব করতেন যে গ্রন্থিগুলি সব খুলে দেওয়া

হল, ততক্ষণ পর্যন্ত আসন ছেড়ে ওঠা বা নিশ্চল শরীরে সামান্য স্পন্দন জাগানও তাঁর সাধ্যায়ত্ত থাকত না।

অচিরে দৃষ্টিপথের সব বাধাই নিঃশেষে অপসৃত হল; মায়ের দর্শন-লাভের জন্য ধ্যান করা বা ভাবস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই আর রইল না। মন্দিরে আর প্রতিমা দেখতেন না তিনি; পাষাণ-কায়া চিরতরে বিদায় নিল তাঁর কাছে, চিন্ময় দেহ নিয়ে মা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। খালি চোখেই সব সময় তিনি দেখতে পেতেন, মন্দিরে প্রসন্ন-হাস্যময়ী করুণামৃতবর্ষিণী জীবন্ত জগজ্জননী দাঁড়িয়ে আছেন। নাকের কাছে হাত রেখে দেখেছেন, মা সত্যই নিশ্বাস ফেলছেন। রাত্রে দীপালোকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও মন্দিরতলে মায়ের জ্যোতির্ময়ী মূর্তির কোন ছায়াপাত দেখতে পান নি। নিত্যসেবার কাজকর্ম শেষ করে রাত্রে ঘরে শুতে গিয়ে মায়ের পায়ের মলের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন—মনে হয়েছে, মা যেন বালিকার মতো দ্রুতপদে দোতলায় উঠছেন। কম্পিত-বক্ষে তখনই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখেছেন, মা দোতলার আলসের ওপর উঠে আলুলায়িতকেশে দাঁড়িয়ে আছেন, গঙ্গাদর্শন করছেন।

এই সব দর্শনের ফলে মায়ের একেবারে কোলের ওপর উঠে বসেছিলেন তিনি, শিশুর মতো আগ্রহ নিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা তাঁকে পুরোহিত-জনোচিত সব আচার-আচরণের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে এসেছিল। বৈধী পূজাবিধি তাঁকে আর বেঁধে রাখতে পারল না। হৃদয়ে দিব্যপ্রেম উথলে উঠল; প্রথা, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, এমন কি সাধারণ ঔচিত্যবোধেরও কোন স্থান আর রইল না সেখানে। বাহ্যজগতের বস্তুর চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে, আরো নিবিড়-ভাবে তিনি স্নেহময়ী জননীরূপে চিন্ময়ী মা-কালীকে সাক্ষাৎ দেখতে পেতেন। কাজেই আদুরে ছেলের সহজাত ভালবাসা নিয়ে তিনি তো

মাকে আদর করতে ছুটবেনই! কখনো দেখতেন, মন্ত্রপাঠ করে অন্নাদি নিবেদন করার আগেই মা খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। কখনো হাতে কিছু অন্ন তুলে নিয়ে নিজেই সিংহাসনের কাছে গিয়ে মায়ের মুখে তুলে ধরতেন, আব্দারের সুরে খেতে বলতেন তাঁকে। কখনো বা আগে নিজে কিছুটা খেয়ে বাকীটা মায়ের মুখের কাছে তুলে অতি সহজ ভাবে বলতেন, "আচ্ছা মা, আমি খেয়েছি, এবার তুই খা।" প্রায়ই ভাবাবেশে বুক মুখ সব লাল হয়ে উঠত; সে অবস্থায় কম্পিত পদে মায়ের কাছে এগিয়ে এসে আদর করে মায়ের চিবুক ধরে গান করতেন, গল্প করতেন, পরিহাস করতেন, কখনো বা নাচতেই শুরু করে দিতেন। কখনো বা রাত্রে ভোগের পর মাকে শয়ান দিয়ে বলতেন, "আমাকে শুতে বলছিস? আচ্ছা মা, শুচ্ছি"; বলেই, মায়ের শয্যায় শুয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। প্রতিদিন প্রভাতে মায়ের মালা গাঁথার জন্য যখন পুষ্পচয়ন করে বেড়াতেন, দেখে মনে হত যেন কারো সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছেন তিনি—কখনো হাসছেন, কখনো বা আনন্দে অধীর হয়ে উঠছেন। রাত্রে কোনদিন ঘুমাতেন না, ভাবস্থ হয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, না হয় গান গেয়ে, আর না হয় আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মাঝে মাঝে আরও গভীর হয়ে উঠত, মায়ের সঙ্গে একাত্মবোধ এসে যেত। সে সময় তাঁর আচরণ হয়ে উঠত আরো গুরুতর, আরো ভয়াবহ; দেখে মনে হত, তিনি মন্দির অপবিত্র করে ফেলছেন। এ অবস্থায় ফুল-বিল্বদলে অঞ্জলি ভরে আগে নিজের বিভিন্ন অঙ্গে, এমন কি পায়ে পর্যন্ত ঠেকিয়ে পরে তা তুলে দিতেন মায়ের চরণে।

ঈশ্বর-প্রেমে যাঁরা উন্মত্ত, তাঁরা শাস্ত্রবিধির পারে চলে যান; তাঁদের আচরণ বিধিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। সে প্রেমোন্মত্ত মনের গভীরতার পরিমাপ করবে কে? দিব্যপ্রেমের যে রহস্যময় প্রবল প্রবাহ তাঁদের

জীবন থেকে সব বিধি-নিষেধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাঁদের কথায় ও আচরণে অনন্যসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলে, সে প্রেম সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাই বা হবে কার? আর-এক জগতের লোক হয়ে যান তাঁরা। আমাদের সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁদের বেঁধে রাখতে পারে না; নিয়মের প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা নিয়মের গণ্ডি পার হয়ে চলে যান। এ-জাতীয় জীবন-প্রবাহ কখনো মানুষের ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত হয়ে, মানুষের গড়া বাঁধ দিয়ে ঘেরা জলপ্রণালীর প্রবাহের মতো বয়ে চলতে পারে না। এ জীবন ভগবদ্-প্রেমামৃতে পূর্ণ হয়ে অসীম সাগবেব মতো অন্তহীন মহিমায় সগৌরবে তরঙ্গায়িত হয়ে চলে।

তবে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝবেই; শুদ্ধ হৃদয়ের ভাব তারা ধরতেই পাবে না। সেজন্য জীবনেব ধরাবাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখলেই, তার কারণ তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, তাবা সেটাকে পাগলামি বলে স্থির-সিদ্ধান্ত করে বসে। এদিকে নিজেদের ধর্মজ্ঞ বলে তারা অভিমানও রাখে খুব; ভাবে, পূজারী যদি পূজাবিধি লঙ্ঘনই করল, যদি ন্যায়-অন্যায়-বোধরহিতই হল, তাহলে প্রতিমা ও মন্দির অপবিত্র হতে আব বাকী রইল কি! মানসিক বিকার ছাড়া আর অন্য কোন কারণেও যে মানুষের আচরণ এরূপ হতে পারে, সেকথা তাদের কল্পনাতেও আসে না। এই সব ধর্মধ্বজীর দল, অধ্যাত্মবিদ্যার এই সব পণ্ডিত-মূর্খের দল যদি তাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারত, তাহলে জগতের সমস্ত সত্যদ্রষ্টাদের, আচার্যদের ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নিজেদের বিবেচনা-মতো উচিত শিক্ষা-ই দিয়ে দিত। একবার ঘটেছিলও তাই; ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত এরূপ এক ব্যক্তির আচরণের বিচারাধিকার যখন তারা জোর করে নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল, তখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতেও দ্বিধা বোধ করে নি।

অবশ্য সমাজের সাধারণ পর্যায়ে একদল লোক সব সময় থাকেন,

ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত ব্যক্তির অসাধারণ আচরণের মধ্যে যাঁরা গগনচুম্বী আধ্যাত্মিকতার আভাস পান। এইসব দেবমানবদের প্রবল আকর্ষণে তাঁরা আকৃষ্ট হন এবং এঁদের সেবা করার ও আশ্রয় দেবার অধিকার পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেন। দেবদূতের মতো এসে বহিরাচারপ্রিয় ছিদ্রান্বেষীদের ক্রোধোন্মত্ততার হাত থেকে তাঁরা সযত্নে রক্ষা করে চলেন এই সব দেবমানবদের।

দক্ষিণেশ্বরের এই তরুণ পূজারীটির দেবসেবায় তথাকথিত স্বেচ্ছাচার ঘটছে দেখে কালীবাড়ির বিকৃতরুচি কর্মচারীরাও ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের রোষবহ্নি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাঁচাবার জন্য পূর্বোক্ত দেবদূতের মতোই এসে হাজির হয়েছিলেন মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণী রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ মথুরবাবু। এ-দু'জন ভক্তের অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অসীম শ্রদ্ধা যদি না জেগে উঠত, তাহলে কি যে ঘটত, তা বলা কঠিন। কালীবাড়ির কর্মচারীরা হয়ত দলবেঁধে আক্রমণই করে বসত তাঁকে। অন্তরের সহজাত জ্ঞান হতেই রানী রাসমণি ও মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদনা ধরতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে জগজ্জননীর প্রতি যথার্থ ও অনন্য-সাধারণ ভক্তি-প্রেমের ফলেই তাঁর পূজা এমন অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। বোধ হয় আরো একটু বেশী বুঝেছিলেন তাঁরা ; বোধ হয় বুঝেছিলেন, মা-কালীই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে থেকে তাঁকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন, তাঁর আচরণ বাহ্যদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও সেখানে দৈবী ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। দু-একটা ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। রানী রাসমণি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, কালীমন্দিরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভজন শুনছেন। ভজন শুনতে শুনতে মায়ের ধ্যান করার সময় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি ; তাঁর মন মায়ের চিন্তা ছেড়ে একটা মামলার চিন্তায় চলে গেল ; মন্দিরে বসে সেই চিন্তাতেই তিনি ডুবে গেলেন।

মনোযোগের অভাব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ রানীর কোমল অঙ্গে করাঘাত করে তিরস্কার করলেন—"এখানেও ঐ চিন্তা!" রানী চমকে উঠলেন, নিজের দোষ দেখতে পেয়ে শিক্ষকের কাছে তিরস্কৃতা বালিকার মতো লজ্জিতা হলেন। ক্রোধোন্মত্তা হলেন না, বা মন্দিরের স্বত্বাধিকারিণীর প্রতি তাঁর একজন সামান্য কর্মচারীর এই আচরণকে অন্যায় বলেও ভাবলেন না। ভাবলেন, তাঁর শিক্ষার জন্য মা নিজেই এ শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর মানসিক অবস্থার উপযুক্ত এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জেনে দীনভাবে তিনি এ শাসন গ্রহণ করলেন। পূজারীকে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, মন্দিরের কর্মচারীরা যাতে এ নিয়ে আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সামান্য আঘাতও না দিতে পারে, তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতে পর্যন্ত না পারে, তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করলেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিত্যকর্ম সমাধা করা শরীরের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মন তাঁর ভাবস্থ হয়েই থাকত, ইন্দ্রিয়জগতের বহু ঊর্ধ্বে উঠে সর্বদা আনন্দসুধা পান করত। সেজন্য জাগতিক নিয়মের দাবির শৃঙ্খলে সে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না। তাছাড়া তাঁর স্নায়ু-মণ্ডলীও বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল; পুরোহিতের কাজের বোঝা আর সে বইতে পারছিল না, বিশ্রাম চাইছিল। মথুরবাবুকে তিনি সে কথা জানালেন। মথুরবাবুও সানন্দে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবর্তে কিছুদিন কাজ করার জন্য তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে অনুমতি দিলেন। এভাবে ধরাবাঁধা দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে রেখে কিছুদিনের মতো তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবসর পেলেন, এবং নির্বাধে ছুটে চললেন মনের আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশে।

এরই কাছাকাছি কোন সময়ে অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী করে তোলার জন্য হৃদয়ের সহায়তায় তিনি আমলকী গাছের চারিদিকে

জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে সেখানে আরো চারটি পবিত্র বৃক্ষ রোপণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সাধনা এই একত্র-সন্নিবিষ্ট ছায়াবহুল গাছগুলির নীচে একটি বেদীর উপর সাধিত হয়। স্থানটি এখন পঞ্চবটী নামে পরিচিত। দক্ষিণেশ্বর-মন্দির-দর্শনার্থী তীর্থ-যাত্রীরা এই স্থানটিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন।

এসময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন আধ্যাত্মিক ভাব-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছিল। শুধু মা-কালীর দর্শনলাভ করে তার গতিবেগ থামতে চাইল না; ভগবানকে আরো বহু রূপে দেখতে চাইলেন তিনি। তাঁর অন্তরে যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুন জ্বলছিল, একটিমাত্র ভাবাবলম্বনে ভগবানকে উপলব্ধি করে সে আগুন নিভবে কেন? শৈশবে গ্রামের বাড়িতে তিনি রঘুবীরের পূজা করতেন। ভগবানকে সেই শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। পুরাণ-বর্ণিত অযোধ্যাপতি ক্ষত্রিয়রাজ এই রামচন্দ্রকে অসংখ্য হিন্দু নরনারী ঈশ্বরাবতার বলে আজও পূজা করে আসছেন। শ্রীভগবানকে রামরূপে আরাধনার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ামাত্র তাঁর নমনীয় মন রামগতপ্রাণ বানরাধিনায়ক মহাবীরের ধাঁচে পুরোপুরি গড়ে উঠল। এই ভক্তরাজের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিলেন তিনি। তাঁরই মতো আহার, আচরণ, এমন কি গাছের ডালে লাফিয়ে চলা ইত্যাদিও শুরু করলেন। মুখে সর্বদা 'রঘুবীর' নাম লেগে থাকত। এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সাধনার শেষে শ্রীরামচন্দ্রের অনুপমা সহধর্মিণী, হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু নারীগণ কর্তৃক পূজিতা, সতীত্বের মূর্ত প্রতীক সীতাদেবীর দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন।

যে স্থানটিকে এখন পঞ্চবটী বলা হয়, সেখানে তিনি সেদিন একাকী বসেছিলেন। হঠাৎ দেখেন, মুখে অসাধারণ গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে করুণা-মাখা নয়নে একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে দেখতে বাগানের উত্তর দিক থেকে

একটি স্ত্রীমূর্তি এগিয়ে আসছে। পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন তিনি; গঙ্গা, গাছপালা ইত্যাদি চারিদিকের সব কিছু জিনিস যেমন দেখছিলেন তেমনি সহজভাবে তাঁকেও দেখলেন। আচরণ ও অপরূপ দৃষ্টিতে অসাধারণ কমনীয়তা ফুটে ওঠা ছাড়া দেবীমূর্তির আর কোন চিহ্নই কিন্তু সে মনোরম মানবী-মূর্তিতে ছিল না। অবাক-বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছেন, ইনি কে? এমন সময় পাশের গাছ থেকে একটি হনুমান আনন্দে চীৎকার করে লাফিয়ে পড়ে, স্ত্রীমূর্তিটির কাছে ছুটে গিয়ে পরম ভক্তিভরে তাঁর চরণ-বন্দনা করল। চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন বলে উঠল, ইনি নিশ্চয়ই সীতাদেবী! চিন্তামাত্র সারাদেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল; "মা মা" বলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় বিপুল বিস্ময়ে দেখলেন, সীতাদেবী আরো এগিয়ে এসে তাঁর দেহে প্রবেশ করে তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গেলেন। এই রোমাঞ্চকর অন্তর্ধানের পূর্বে সীতাদেবী তাঁকে বলে যান, "আমার হাসিটি তোমায় দিয়ে গেলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য এদিকে বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করছিল। একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল একটানা অধ্যাত্ম-সাধনার ও ভাবরাজ্যে বিচরণের ফলে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ঘুম বিন্দুমাত্র হত না, একরকম না খেয়েই থাকতেন তিনি। স্নায়ুমণ্ডলী যেন পুড়ে যাচ্ছিল। সারা শরীর জ্বলে যেত এবং কখনো কখনো রোমকূপ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হত। ভাগিনেয় হৃদয় প্রাণ ঢেলে সেবা না করলে এ সময় তাঁর শরীর বোধ হয় থাকত না। তাঁর দেহের এই অবস্থা দেখে মথুরবাবু বিচলিত হলেন. স্নেহোদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে দেখে গভীর উদ্বেগবশে মথুরবাবু ও রানী রাসমণি অবিবেচকের মতো ভেবে বসলেন যে তাঁর অটুট ব্রহ্মচর্য একবার ভেঙ্গে দিতে পারলে

বোধ হয় তাতে কিছু ফল হতে পারে। এই ভেবে টাকা দিয়ে নষ্টচরিত্র রমণীদের নিয়ে এসে কৌশলে তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। দু'বারের চেষ্টা বিফল হল ; শ্রীরামকৃষ্ণের মনে দেহবোধের কোন রেখাপাত করা গেল না। রমণীদের দেখামাত্র বিপদের সম্ভাবনা টের পেয়ে একেবারে দেহ-বুদ্ধি-বিরহিত হয়ে সরল বালকের মতো তিনি ছুটে চলে যেতেন তাঁর হৃদয়পদ্মে নিত্যবিরাজিতা মা-কালীর কোলে, নিরাপদ আশ্রয়ে। দেখেশুনে রাসমণি ও মথুরবাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন। কাজটা বুদ্ধিহীনতাপ্রসূত হলেও তরুণ পূজারীর অকপট হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়েই একাজে নেমেছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরা এবং তাঁদের এই পরিকল্পনার কর্মনির্বাহকেরা সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে এভাবে চেষ্টা করতে যাওয়াটাই বড় বোকামি হয়ে গেছে। এজন্য লজ্জিত এবং অনুতপ্তও হলেন সবাই। এই অগ্নিপরীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণকে অক্ষত অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে দেখে তাঁর প্রতি রানী রাসমণির ও মথুরবাবুর বিশ্বাসের আর কোন কূল-কিনারা রইল না ; অকপট, দুর্লভ ঈশ্বর-প্রেমিক বলে স্থিরবিশ্বাসে তাঁরা তাঁকে হৃদয়ে পূজার আসনে বসালেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নীরোগ করার সব প্রচেষ্টা এভাবে বিফল হল দেখে এবং স্থানপরিবর্তনে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হতে পারে ভেবে অবশেষে তাঁরা তাঁকে কিছুদিনের জন্য তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় তিনি কামারপুকুরে নিজ গৃহে ফিরে যান। নতুন পরিবেশের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে এখানেও তাঁর বেগবান মন অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হয়ে চলল। নিশাকালে শ্মশানে গিয়ে তিনি কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হতেন। আত্মীয়েরা ভাবলেন, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরের এই দুর্বল অবস্থা দেখে, এবং বোধ হয় পাগলও হয়েছেন ভেবে তাঁর জননীর আর উদ্বেগের সীমা রইল না। এর প্রতিকারকল্পে জননী তাঁর সাধ্যমতো সব কিছুই করলেন। এমন কি

ছেলেকে হয়ত ভূতে পেয়েছে ভেবে একজন ভূতের ওঝাকেও ডাকলেন। যাই হোক, কয়েক মাস গ্রামে বাস করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, সহজ মানুষের মতো চলতে লাগলেন। শ্মশানে গিয়ে রাত্রে ধ্যান করা অবশ্য বন্ধ হল না; তবে তাঁর অস্থির ভাব চলে গেল, কান্নাকাটিও থামল। তাঁর জীবনযাত্রার এই ধারায় আত্মীয়েরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। তেইশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলেকে সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে দেখে তাঁর জননীর কিন্তু বুক ফেটে যেত। তিনি ভাবলেন, বিবাহ দিলে বোধ হয় ছেলের মন ঘুরতে পারে। কি আশ্চর্য, সরল রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। তাঁর জননী ও অগ্রজ রামেশ্বর কালবিলম্ব করলেন না, স্থানীয় অঞ্চলে যোগ্যা পাত্রীর সন্ধান করতে লেগে গেলেন। কিন্তু মনের মতো পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁদের বিফলমনোরথ হতে দেখে ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন বললেন যে, জয়রামবাটী গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁর জন্য পাত্রী 'কুটো-বাঁধা' হয়ে আছে। এ কথার খুব বেশী দাম কেউ দিলেন না। তবু একবার খোঁজ করা হল এবং তাঁর কথামতো যথাস্থানে রামচন্দ্রের পাঁচ-ছয় বছরের কন্যা সারদামণির সন্ধানও মিলল। সকলে বিস্মিত হলেন। বিবাহে কোন পক্ষের অমত হল না। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি যথাবিধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তেইশ বছরের যুবকের সঙ্গে পাঁচ বছরের বালিকার এই অদ্ভুত বিবাহের কথা শুনে আধুনিকেরা বোধ হয় চমকে উঠবেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে এ বিবাহ দুটি আত্মাকে একসূত্রে বেঁধে দেবার ধর্মসম্মত বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দুশাস্ত্রমতে বাল্য-বিবাহে যৌবনোদ্ভেদের পূর্ব পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ থাকে। কাজেই এ বিবাহ পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত বিবাহে বাগ্‌দানের চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন ওঠেই না। তাঁর বিবাহ সবদিক

থেকেই দুটি আত্মার আধ্যাত্মিক মিলন মাত্র; আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে সম্পর্কের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক মিলনের ভাবই প্রকট ছিল; দৈহিক সম্পর্কের কোন চিন্তাই এই অতিমানব-দম্পতির দিব্যপ্রেমে আবিলতা মেশাবার সুযোগ কখনো পায় নি।

বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় দেড় বছর কামারপুকুরে ছিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আবাব মা-কালীর পূজার ভার গ্রহণ করেন।

মা-কালী তাঁর জন্য যেন অপেক্ষা করেই ছিলেন—ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়েব মতো তাঁর ঘাড়ে এসে পড়লেন। আবার তাঁর আধ্যাত্মিক উন্মাদনা দেখা দিল। ক্ষুধিত আত্মার আকুল অন্বেষণ চতুর্গুণ উদ্যমে আবার শুরু হল। মায়ের জন্য করুণ ক্রন্দনে গগন ভরে উঠল আবার; ভাবের আতিশয্যে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীও বিপর্যস্ত হতে লাগল। অবশ্য ধ্যানকালে বহুবিধ অদ্ভুত উপলব্ধি হওয়ায় স্নিগ্ধতা ও সান্ত্বনায় তাঁর মন ভরে যেত। এই সময় তাঁর দেহবোধ প্রায় থাকত না। মাসের পর মাস শরীরের কোন যত্নই নেন নি তিনি। মাথার চুল বড় হয়ে জটপাকিয়ে গিয়েছিল। জড়বৎ নিশ্চল হয়ে যখন তিনি ধ্যানে বসতেন, তখন তাঁর দেহকে জড়-পদার্থ ভেবে পাখীরা এসে মাথার ওপর বসত, খাদ্যের সন্ধানে ঠোঁট দিয়ে জটা ঠোকরাতো। ধ্যানকালে তিনি কখনো কখনো দেখতেন, তাঁরই অনুরূপ একজন যুবক সন্ন্যাসী তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এসে কত কি উপদেশ দিয়ে আবার তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। একবার দেখেন, এক অতি ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষ তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলেন, এ পাপপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসীটিও বেরিয়ে এসে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং ত্রিশূলের আঘাতে তাকে হত্যা করে আবার তাঁর শরীরে এসে প্রবেশ করলেন।

নিজ সরল বিশ্বাসের সন্ধানী আলো ফেলে মনের ভেতর তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতেন এবং মায়ের ও নিজের মাঝখানে ব্যবধান

সৃষ্টি করার মতো যা কিছু সেখানে দেখতে পেতেন, সবল হস্তে তা সরিয়ে ফেলতেন তৎক্ষণাৎ। এ কাজটির পদ্ধতিও ছিল অভিনব। মন থেকে কাঞ্চনাসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করার জন্য তিনি অদ্ভুত একটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন। এক হাতে কয়েকটি টাকা ও অপর হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে তিনি বিচার করতেন যে, মাটির চেয়ে টাকার শ্রেষ্ঠতা কিছু নাই—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের পথে সহায়তা করা তো দূরের কথা, টাকা মানুষের মনে অহঙ্কার ও ভোগবাসনা বাড়িয়ে দেয়; কাজেই একমুঠো মাটির মতোই তা তুচ্ছ। এই ভাবতে ভাবতে তিনি টাকা ও মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে দুই-ই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করতেন। যতক্ষণ না মনে হত কাঞ্চনত্যাগ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বারে বারে এরূপ করে চলতেন তিনি। জাতি অভিমান এবং 'আমি অপরের চেয়ে বড়' এরূপ ভাবের উদ্দীপক সর্ববিধ অভিমান মন থেকে উৎখাত করার জন্য কিছুদিন তিনি মেথরদের পায়খানা স্বহস্তে পরিষ্কার করেছিলেন; নিজের চুল দিয়ে সেখানকার মেজে মুছে দিতেন। মনের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্ত্রীলোকদের এবং অশুচি বিষয়ী লোকদের সঙ্গ তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন।

তাঁর ইচ্ছাশক্তি এত দুর্দমনীয় ছিল যে, মন থেকে এভাবে একবার যা ত্যাগ করতেন, তাঁর স্নায়ু ও মাংসপেশী পর্যন্ত সে জিনিস আর সহ্য করতে পারত না কখনো—অতি তিক্ত, অতি বেদনাদায়ক বলে বোধ হত তার সংস্পর্শ। এইজন্যই পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোকদের সামান্য স্পর্শেও তাঁর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হত, অপবিত্র লোকের সংস্পর্শ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীকে বিপর্যস্ত করে তুলত এবং টাকা ছুঁলেই হাত যন্ত্রণায় বেঁকে যেত। উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মনের সুরের সঙ্গে তাঁর দেহের সুরও একই পর্দায় বাঁধা ছিল; তাঁর ত্যাগের কঠোর সংকল্পের বিপরীত পথে শরীর যখনই পা বাড়াত, তখনই শাস্তি পেতে হত তাকে।

এ সময়কার কঠোরতার ফলে তাঁর শরীরের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। শরীর যে কীভাবে ভেঙ্গে আসছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন: "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীরে ওরূপ হওয়া তো দূরে থাকুক, ওর এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ মা-র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পেয়ে ভুলে থাকতাম তাই রক্ষে, নইলে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এই খোলটা থাকা অসম্ভব হত। তখন হতে আরম্ভ হয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হয়ে গিয়েছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করেও পলক ফেলতে পারতাম না। কতকাল গত হল, তার জ্ঞান থাকত না এবং শরীর বাঁচিয়ে চলতে হবে—একথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়ত তখন সেটার অবস্থা দেখে বিষম ভয় হত; ভাবতাম, পাগল হতে বসেছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখতাম, চোখের পলক তাতেও পড়ে কি না; তাতেও চোখ সমভাবে পলকশূন্য হয়ে থাকত! ভয়ে কেঁদে ফেলতাম এবং মাকে বলতাম—'তোকে ডাকার ও তোর ওপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলতাম, 'তা যা হবার হোক গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস নি······আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারে নেই!' এভাবে কাঁদতে কাঁদতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনে আশ্বস্ত হতাম।" এই বর্ণনা থেকেই তাঁর সে-সময়কার শরীর ও মনের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। সত্যই তাঁর শরীরে আর কিছু ছিল না। সারা গা জ্বালা করা, রোমকূপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হওয়া এবং শরীরে কম্প জাগা—সবই

আবার বিপুলতর বেগ নিয়ে দেখা দিল। জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। শুভানুধ্যায়ীরা প্রমাদ গণলেন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আগের মতো এবারেও তাতে ফল কিছু হল না।

কর্ণধারহীন অবস্থায় বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে একাকী পাড়ি লাগিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তিময় পরমানন্দধাম খুঁজে বের করেছিলেন। লক্ষ্যস্থলেই যে পৌঁছেছেন, সে কথা বুঝতেও বিলম্ব হয় নি তাঁর। বারে বারে পাড়ি দিয়ে তিনি এই পরমানন্দধামের ভূমি স্পর্শও করেছিলেন বহুবার। কিন্তু এই উদ্দাম অভিযানের মূল্যরূপে শারীরিক সুস্থতা বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাঁকে। এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের শ্রমে তাঁর শরীর এতখানি ভেঙ্গে পড়েছিল যে ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের কোন আশা ছিল না। গতানুগতিক চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া গেল না। চিকিৎসকেরা রোগনির্ণয়ই করতে পারলেন না। এ রোগও বোধ হয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাইরের। সাধারণ লোক বাহ্য লক্ষণ দেখে ভুল বুঝল; ভেবে বসল, তিনি পাগল হয়ে গেছেন; বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা এর প্রতিকারকল্পে যথাসাধ্য মাথা ঘামালেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কখনো কখনো নিজের মানসিক সুস্থতায় সন্দিহান হয়ে উঠতেন এবং শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়তেন। কি যে হয়েছে, কি করলেই বা তা সারবে, সে বিষয়ে আলোকসম্পাত করে আসন্ন বিপদ থেকে তাঁর শরীরটাকে রক্ষা করতে পারে, এমন কোন লোকই কাছে-ভিতে ছিলেন না।

তীব্র তপস্যা ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার ফলেই তাঁর এই যন্ত্রণার উদ্ভব; সেজন্য কোন ধর্মতত্ত্বপারঙ্গম ব্যক্তির পক্ষেই শুধু সম্ভবপর ছিল এসব লক্ষণ চিনে ও তার যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলা। কোন যোগ্য ধর্মগুরু যদি সেখানে থাকতেন, তাহলে

একমাত্র তিনিই তাঁকে এ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। যথাযোগ্য শিক্ষা দিয়ে, বলিষ্ঠ মুষ্টিতে হাত ধরে যোগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট নির্ভুল পথে ভাবরাজ্যে তাঁব ওজস্বী মনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, এমন একজন গুরুব সান্নিধ্য বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাঁর। এর জন্য বেশীদিন আর অপেক্ষা করতে হল না; এরূপ একজন পথপ্রদর্শক নিজেই এসে হাজির হলেন। সস্নেহে হাত ধবে তিনি তাঁকে সাধনসমুদ্রের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অঞ্চল থেকে সরিযে নিয়ে এলেন, আর এ সমুদ্রেব বুকের ওপর দিয়ে অন্যদিকে যে পথ ধরে চলে পূর্বগ সাধকগণ শান্তিধামে পেঁাছেছেন, সেই সুপরিচিত পথ দিযে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে চললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। সে অঞ্চলে সাগর অপেক্ষাকৃত শান্ত, ঝড়ঝঞ্ঝার ভয় সে পথে অনেক কম। এই গুরুর আগমনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মসাধনার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

সনাতন সাধন-মার্গে

তান্ত্রিক সাধনা

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি কোন এক সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বকুলতলার স্নানের ঘাটে একখানি যাত্রীবাহী নৌকা এসে ভিড়ল। এক সুরূপা দীর্ঘদেহা রমণী নৌকা থেকে অবতরণ করলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। নেমে, চাঁদনির দিকে তিনি সোজা এগিয়ে চললেন। তাঁর দীর্ঘ কেশদাম আলুলায়িত, বসন গৈরিক; দেখেই বোঝা গেল তিনি ভৈরবী, তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। অনুসন্ধানে জানা গেল—তিনি পরিব্রাজিকা, তান্ত্রিক বিদ্যায় ও ভক্তি-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সাধনা বিষয়ক ক্রিয়াকাণ্ডেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞা; পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) অঞ্চলে কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিবিশেষকে ধর্ম-সাধনায় সহায়তা করার জন্য ঈশ্বরাদিষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী সেই ভাগ্যবান পুরুষ বলে চিনতে পেরে তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবব হলেন; হৃদয়ে মাতৃস্নেহ উথলে উঠল।

আর শ্রীরামকৃষ্ণ? নিরাশ্রয় পরিবেশে জলে ডুবে যাবার মুখে তিনি যেন আঁকড়ে ধরার মতো হঠাৎ ভেসে আসা একটা আশ্রয় পেয়ে গেলেন। ভৈরবীকে দেখে আশায় ও আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলেন। বুঝলেন যে ভৈরবী ঈশ্বর-প্রেরিতা, শারীবিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার মতো শক্তি নিয়েই তিনি এসেছেন। তাই ভৈরবীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মাতৃস্নেহের প্রতিদানে তাঁকে সন্তানোচিত ভক্তি নিবেদন করতে একটুও বিলম্ব করলেন না। অসহায় বালকের মতো অন্তরেব সব বেদনা জানালেন তাঁর কাছে। যেভাবে সাধন-শিক্ষাহীন মনের নির্দেশমাত্র সম্বল করে এতদিন তিনি চলে এসেছেন, এভাবে চলার ফলে যেসব কৃচ্ছ্রতার ভেতর দিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে, দীর্ঘকালব্যাপী যে যন্ত্রণাভোগের ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, সে সব কথা ভৈরবীকে জানালেন। যে সব সমাধি ও দর্শনাদি তাঁব হযেছে, সে সবও একে একে শোনালেন। সব জানিযে ভৈরবীর কাছে তিনি সহায়তা ও নির্দেশ প্রার্থনা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথা শুনে ভৈরবীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি বুঝলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্‌প্রেমের চরম অবস্থায়, মহাভাবে, অবস্থান করছেন। বুঝলেন, তাঁর যা কিছু শারীরিক যন্ত্রণা, তা এই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবস্থানের ফলেই দেখা দিয়েছে। তিনি যখন দেখলেন যে শাস্ত্র ও ভাষ্যাদিতে শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবস্থা সম্বন্ধে যা বর্ণনা দেওয়া আছে, তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি হুবহু মিলে যায়, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। মহাভাব হলে যে

সব শারীরিক বিকার দেখা দেয় বলে শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে, তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক বিকারগুলি পর্যন্ত মিলে গেল। দেখেশুনে ভৈরবীর দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, হিন্দুদের আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস যে সব অতি-দুর্লভ মহাপুরুষদের ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছে, এতদিন পরে যথার্থই সেই পর্যায়ের একজনের দর্শন তিনি লাভ করলেন। উদ্বিগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণকে শান্ত করার মানসে তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে ভৈরবী নিজের এই ধারণার কথা সবই খোলাখুলি তাঁকে জানালেন। বললেন যে এই শারীরিক বিকার সাধারণ ব্যাধিমাত্র নয়, ঈশ্বরপ্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপেই এসব তীব্র দৈহিক যাতনার আবির্ভাব। আর একথাও জানালেন যে, সকলের পক্ষে আধ্যাত্মিকতার এত উচ্চ ভূমিতে ওঠা সম্ভবপর হয় না; শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে অল্প কয়েকজন বিশেষ আধিকারিক পুরুষমাত্র অনুভূতির এত উচ্চস্তরে পৌঁছুতে পেরেছেন। ভৈরবী তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণও দিয়ে দিলেন হাতে হাতে। মহাভাবের ফলে এইসব শারীরিক বিকার উপস্থিত হলে তার প্রতিকারকল্পে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে, সে নির্দেশমতো চলে অতি সহজ ও আশ্চর্য উপায়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ব্যাধির কয়েকটি উৎকট লক্ষণ প্রায় ইন্দ্রজালের মতো সারিয়ে দিলেন। তাঁর ব্যবস্থামতো শুধু গলায় সুরভি পুষ্পের মাল্যধারণ ও গায়ে সুগন্ধি চন্দনলেপনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের এতদিনকার গাত্রদাহ তিন দিনের মধ্যেই তিরোহিত হল। মহাভাবের লক্ষণ হলে শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক বিকারগুলি শাস্ত্রোক্ত প্রতিষেধক প্রয়োগে সেরে যাবে—এই বিশ্বাসে যে পরীক্ষায় ভৈরবী নেমেছিলেন, তাতে তিনি এভাবে আশাতীত ফললাভ করলেন। এ সাফল্যকে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সমর্থন বলে নিশ্চিতই মনে হয়েছিল।

এখানেই থামলেন না তিনি। বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের

ও ভক্তদের আনিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভা বসালেন। এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে, শাস্ত্র-নিবদ্ধ অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিয়ে তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। সভায় উপস্থিত সকলেই তাঁর এ সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন। সেদিন তাঁরই জয় হল। পরে আরও একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল, সে সভাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভৈরবীর মতই সমর্থিত হয়। এইসূত্রে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষের নেতা পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এবং ভক্তিশাস্ত্রে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী তান্ত্রিক পণ্ডিত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণেশ্বরের দ্বিতীয় দিনের সভায় এঁরা দুজনই উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ প্রথম দিনের সভাতেও ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে ভৈরবীর সিদ্ধান্তে উভয়েরই প্রাণখোলা পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল।

পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলীর এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সকলেরই মনে গভীর রেখাপাত করল। নতুন আলোক-সম্পাত হল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ওপর। সে আলোকে এই পাগল মানুষটিকে নতুনভাবে দেখতে পেলেন সবাই; তাঁর যেসব আচরণকে এতদিন তাঁরা পাগলামি বলে ভেবেছিলেন, এখন সেগুলিকে দেবত্ব বলে বুঝতে পারলেন। কালীবাড়ির বাসিন্দাদের হৃদয়ে সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ জাগল। এদিকে যাঁকে নিয়ে এত হৈ-চৈ, তাঁর ভাবের কিন্তু কোন পরিবর্তন ঘটল না, মায়ের সরল শিশুই রয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

যাই হোক শ্রীরামকৃষ্ণ অভ্যাসমতো সরলভাবে মা-কালীর অনুমতি নিয়ে ভৈরবীর হাতে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ করেছিলেন। তন্ত্র-শাস্ত্রের নির্দেশমতো অধ্যাত্ম-সাধনার পথে পরিচালিত করার জন্য ভৈরবীকে তিনি গুরুরূপে বরণ করতে চাইলেন। ভৈরবী সানন্দে সম্মত হলেন।

তান্ত্রিক সাধনার উপযোগী দুটি আসন (সাধনপীঠ) তৈরী হল। একটি পঞ্চবটীতে, অপরটি কালীবাড়ির উত্তর প্রান্তে বেলতলায়। বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় ·বিবিধ দুর্লভ উপকরণ দিবাভাগে সংগ্রহ করে এনে ভৈরবী এ-দুটি আসনের একটির কাছে সাজিয়ে রাখতেন; নিশাকালে সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নির্দেশমতো প্রক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করতেন। এভাবে চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সমস্ত সাধনা ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন।

বেদান্তমতে ভক্ত ও ভগবান স্বরূপত: এক। এই চরম সত্যোপলব্ধির পথেই তন্ত্র সাধককে নিয়ে যায়। এই উপলব্ধিলাভের ব্যাবহারিক পদ্ধতিগুলিই তন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। কিন্তু স্বরূপগত একত্বের উপলব্ধিলাভের জন্য অদ্বৈত-বেদান্ত যে-পথে চলতে বলে, সেই জ্ঞানপথের সঙ্গে তন্ত্রনির্দিষ্ট পথের পার্থক্য আছে। জ্ঞানমার্গে কর্মের স্থান নেই। কিন্তু তন্ত্রোক্ত সাধন জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে গঠিত। ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই এ-পথের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরকে সাকার-রূপে চিন্তা করে তাঁর মূর্তির বিধিমতো পূজা ও ধ্যানের মাধ্যমে ভক্তের অকপট মনকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে তান্ত্রিক সাধনায়। ক্রমোন্নতির পথ এটি। তন্ত্রে পূজার যে বিধান আছে, তাতে প্রথমে নিজেকে নিরাকার চরম সত্তার সঙ্গে এক ভেবে ধ্যান করতে হয়; তারপর ভাবতে হয়, ভগবানের সেই নির্গুণ নিরাকার সত্তা থেকে দুটি স্বতন্ত্র রূপের বিকাশ হল, নিরাকার সত্তাই যেন পূজকের ও আরাধ্যা দেবীর জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। তখন ভাবতে হয়, সেই চিন্ময়ী দেবী বাইরে সাধকের সম্মুখস্থ পূজার পীঠে এসে বসেছেন। তারপর ভগবতীজ্ঞানে পূজা করতে হয় সেই সাকার চিন্ময়ী দেবীকে।

তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্মের এই শাখাটি অতি উচ্চতত্ত্বে পৌঁছবার যে-পথটির সন্ধান দিয়েছে, সে-পথটি ক্রমোন্নত এবং খুবই চালু; স্বল্পায়াসে

ওপরে ওঠা যায় এ-পথ ধরে। নিম্নের অতি স্থূল ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে শুরু হয়ে এ-পথ গিয়ে শেষ হয়েছে ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশে, চরম সত্তায়। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের যে-কোন স্তরে অবস্থিত মানুষের পক্ষেই এ-পথ উপযোগী। বিভিন্ন স্তরের লোকের জন্য তন্ত্রে বিভিন্ন অধ্যাত্ম-সাধনপদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে তম বা জড়তায় মগ্ন লোকের জন্য আছে পশুভাবের সাধন; রজ বা প্রাণশক্তি ও বাসনার প্রাচুর্য যাদের মধ্যে, তাদের জন্য রয়েছে বীরভাবের সাধন; আর শান্তস্বভাব, পবিত্র, সর্ববিষয়ে সন্তুষ্টচিত্ত ও শুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য, সত্ত্বপ্রধান লোকের জন্য, নির্দিষ্ট আছে দিব্যভাবের সাধন-প্রণালী।

তান্ত্রিক ক্রিয়ার ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সুখদ বস্তুগুলিকে সাধকের সামনে এনে রাখতে হয়। সাধনকালে সাধককে মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে, এ বস্তুগুলি সবই দিব্যভাবময়। এই চিন্তা অবলম্বনে সাধনপথে চলতে চলতে সাধকের মনোবৃত্তি ক্রমে পবিশুদ্ধ হয়ে আসে, তাঁর ইন্দ্রিয়ানুরাগ ক্রমে রূপান্তরিত হয় ঈশ্বরপ্রেমে। যেমন, কতকগুলি তান্ত্রিক ক্রিয়ায় পুরুষ সাধকের নিকট কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে স্ত্রীলোকের উপস্থিতির বিধান আছে। বিধান আছে, সাধক সে-সব দেখবে, কিন্তু কামনার দৃষ্টি দিয়ে নয়; সে-সময় এগুলিকে জগন্মাতার পবিত্র লীলাবিলাস বলে তাঁকে ভাবতে হবে। সাধককে এভাবে নিজ পাশবিক কামনা সংযত করে তার ঊর্ধ্বে উঠে যেতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্র সাধককে জ্ঞানযোগীর মতো প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে বলে না, কাম্য-বস্তুর সম্মুখীন হয়ে বীরের মতো বুক ফুলিয়ে তাকে অতিক্রম করে যেতে বলে। তান্ত্রিক সাধনায় এভাবে দেহকে জয় করে মনকে আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের উপযোগী করে তুলতে হয়।

সেজন্য তান্ত্রিক সাধনায় কয়েকটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান খুবই বিপজ্জনক। সাধন-পথের এসব অংশে সাধকের মন অল্প সময়ে অনেক উঁচুতে উঠে

যায় বটে, কিন্তু এদিকে চলার বিপদও তেমনি অনেক বেশী। ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে টেনে নামিয়ে আনার জন্য চোরা গর্ত ও ফাঁদের অভাব নেই এখানে; একটু অসাবধান হলেই সাধকের পদস্খলন হবার ও ভ্রষ্টতার গহ্বরে তলিয়ে যাবার ভয় খুব বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর মায়ের কৃপায় স্ত্রীলোকমাত্রেই মাতৃজ্ঞান থেকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে, এবং তন্ত্রসাধনার সঙ্গে অতি-জড়িত কারণবারি বিন্দুমাত্রও পান না করে তন্ত্র-সাধনার সমস্ত ক্রিয়াগুলিই সমাধা করে গেছেন। প্রতিবারেই ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠানের পর জপ করতে বসা মাত্র তাঁর দিব্য ভাবাবেশ হত, আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। ইন্দ্রিয়োদ্দীপক বিষয়গুলি তাঁর ঊর্ধ্বগামী মনের নাগাল কোন কালেই পায় নি; কোন বিপথগামিত্বই তাঁর ঊর্ধ্বগমনে মুহূর্তের জন্যও বাধা দিতে পারে নি। তাছাড়া, বিহিত সাধনগুলির যে-কোনটিতে সিদ্ধ হতে কখনও তিন দিনের বেশী সময় তাঁর লাগে নি। এটিও কম আশ্চর্যের কথা নয়।

তন্ত্রসাধনার ফল তিনি হাতে হাতে পেয়েছিলেন। এইসময় অতি অল্পকালের ব্যবধানে একের পর এক বহুবিধ দর্শনলাভ করেছিলেন তিনি। অসংখ্য দেবীমূর্তির দর্শন পেয়েছিলেন; শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে তাঁদের চেহারা হুবহু মিলে যায়। দর্শনকালে অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন বহুভাবে। এ-সময় তিনি যে-সব দেবীর দর্শনলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরীর রূপলাবণ্যই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছিল। একদিন সৃষ্টির প্রতীকরূপে একটি বিরাট জ্যোতির্ময় ত্রিকোণ দেখেছিলেন; দেখেছিলেন, তার ভেতর থেকে অসংখ্য জগৎ বেরিয়ে আসছে। আর একদিন অচিন্ত্য মহাশক্তি মায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের প্রতীকরূপে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন। দেখেন যে, গঙ্গাগর্ভ থেকে ধীরপদক্ষেপে একজন পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক উঠে এলেন। উঠে এসেই তিনি একটি সন্তান প্রসব করলেন। কিছুক্ষণ

পরম আগ্রহ নিয়ে সন্তানটিকে আদর করার পর ভীষণা মূর্তি ধারণ করে তিনি সন্তানটিকে নিজের মুখে পুরে চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন। শেষে আবার গঙ্গাগর্ভে ফিরে গিয়ে গঙ্গায় লীন হয়ে গেলেন।

এইসময় তিনি তন্ত্র- ও যোগশাস্ত্র-বর্ণিত কুলকুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেকেরই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থ নালীর সর্বনিম্ন প্রান্তে এই দৈবী শক্তি কুণ্ডলীকৃতা হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-সাধনার ফলে যখন এই কুণ্ডলিনী-শক্তি উপরের দিকে উঠতে থাকেন, তখন তাঁর ঊর্ধ্বগমনের বিভিন্ন অবস্থায় সাধকের বিভিন্ন প্রকার অধ্যাত্ম-অনুভূতি আসতে থাকে। চরম সত্তার সঙ্গে একাত্মবোধেই এই অনুভূতির পরিসমাপ্তি। তাছাড়া শাস্ত্রে আছে, বিভিন্ন কালে ঊর্ধ্বগমনের সময়ে কুলকুণ্ডলিনী পাঁচপ্রকার বিভিন্ন গতি অবলম্বনে সঞ্চরণ করে থাকেন। এই পাঁচপ্রকার গতির সবগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থানের সময় গমনপথের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অবস্থানকালে সাধকের যত রকম ভাব ও দর্শনের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে তার সবগুলিরই উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণের এইসব উপলব্ধি শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

তাছাড়া, তান্ত্রিক সাধনার ফলে যে অষ্টসিদ্ধি বা অলৌকিক শক্তিলাভের কথা শাস্ত্রে আছে, সে-সব শক্তিও এসেছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু মা-কালীর কৃপায় সেগুলিকে অতি তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা করতে শিখেছিলেন তিনি। সাধনকালে তাঁর শরীর সর্বরোগ-বিনির্মুক্ত ছিল, দেহবর্ণ হয়েছিল সোনার মতো। তাঁর রূপ দেখে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকত : সাধারণের দৃষ্টি এড়াবার জন্য মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখতেন তিনি। বাইরের এই রূপ ফিরিয়ে নেবার জন্য জগন্মাতার কাছে প্রার্থনাও করেছিলেন।

কাম ও সুরাপানের সঙ্গে ঈষন্মাত্র সম্পর্ক না রেখেও তান্ত্রিক সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে অপূর্ব সাফল্যলাভ করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে এইসব

প্রাচীন সাধনাগুলির পবিত্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে ; ভগবানলাভের নিশ্চিত ও স্বতন্ত্র পথ বলে সত্য-সমর্থনও দিয়েছে এগুলিকে।

বৈষ্ণব সাধনা

তন্ত্রমতের সব সাধনা শেষ করতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। আমরা দেখেছি, এই সাধনার ফলে বহুবিধ ঈশ্বরীয় দর্শন ও উপলব্ধির ঐশ্বর্য তিনি লাভ করেছিলেন, যার সামান্য অংশমাত্র পেলেও সাধারণ লোকের মন পরিতৃপ্তিতে ভরে যায়। ভগবদ্-উপলব্ধিলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তবু একবিন্দুও কমল না তাঁর। আধ্যাত্মিক সত্য ও দিব্যানন্দের লক্ষ্যে পৌঁছে তা করায়ত্ত করার জন্য ছোট বড় যত রকমের পথ আছে তার সবগুলি দিয়েই চলে সেখানে পৌঁছুবার জন্য এই নির্ভীক, অক্লান্ত সত্যান্বেষীটি অস্থির হয়ে উঠলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু ভক্তেরা ভগবানকে যে সব বিভিন্ন রূপের ও ভাবের মাধ্যমে পূজা ও ধ্যান করে থাকে, তার সবগুলিই উপলব্ধি করে পরিতৃপ্ত হবার জন্য হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধা তাঁকে উত্তেজিত করে চলেছিল।

তন্ত্রমতে সাধনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবমতের রাজপথ দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছুবার বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে রঘুবীরের (বিষ্ণুর এক অবতার) নিত্যসেবা ছিল , সেজন্য ভগবদারাধনার এই পদ্ধতিটির প্রতি শৈশবেই তাঁর অনুরাগ জন্মে। তাছাড়া তান্ত্রিক সাধিকা এবং তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর গুরু ভৈরবী অন্তরে অন্তরে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভৈরবীর ইষ্টও ছিলেন রঘুবীর। রঘুবীরশিলা তাঁর সঙ্গেই থাকত, প্রতিদিন প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁর পূজা করতেন তিনি। আর, যে মাতৃভাব নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপাল জ্ঞান করে তাঁর প্রতি তদনুরূপ আচরণ করতেন, তা-ও যথার্থ বৈষ্ণব ভাবের অন্তর্ভুক্ত। মনে হয়,

এইসব নানা কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবমত অবলম্বনে সাধনপথে চলতে চেয়েছিলেন।

বৈষ্ণবমত হল শুধু ভক্তি বা ভালবাসা নিয়ে সাধন করার পথ। এ পথে ভক্তিশাস্ত্রের বিধানমতো ভগবানের প্রতি অতি গভীর ভালবাসার পুষ্টিসাধনের মাধ্যমে ভক্তকে চিত্ত শুদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়; তারপর এ পথের লক্ষ্যে, শুদ্ধ পরমানন্দময় ঈশ্বরদর্শনে ও ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়ে থাকতে বলা হয় তাকে। এ পথের সাধকরা ব্যক্তিগত অহং-বোধের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চান না; জ্ঞানমার্গীরা যাকে মুক্তি বলেন এবং যাকে সর্ববিধ অধ্যাত্মসাধনার পরিপূর্ণতা বলে ভাবেন, ব্যক্তিগত অহং-বোধকে নিঃশেষে মুছে ফেলে তাঁরা সেই নিরাকার স্বরূপের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চান না।

বৈষ্ণবমতে পরাভক্তির বা ভগবানের প্রতি চরম ভালবাসার পরিসমাপ্তি হল পরাভক্তিতেই। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই ভালবাসার উৎস বিদ্যমান; সাধনা মানে হল চিত্তশুদ্ধি-সহায়ে এই উৎস-মুখটি শুধু খুলে দেওয়া, আর ইন্দ্রিয়রাজ্যের বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে সে প্রেমধারার মোড় ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। শিক্ষানবীশকে সেজন্য নিয়মিত-ভাবে বিধিমতো পূজা, স্তব, প্রার্থনা, মন্ত্রজপ ও সাকার ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান-সহায়ে ভগবানলাভের জন্য মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে চিত্ত শুদ্ধ করতে হয়। বৈষ্ণবদের দুটি প্রধান শাখার জনপ্রিয় আদর্শ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র।

ভগবৎপ্রেমের পরিপুষ্টির জন্য ভগবানের ভেতর কিছুটা মানুষভাব আরোপ করে, এবং ভক্তকে দেব-ভাবাপন্ন করে তুলে বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি সাধনপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। বৈষ্ণবধর্মমতে ইষ্টকে নিজের মাতা বা পিতা, প্রভু, সখা, সন্তান বা প্রেমাস্পদ বলে ভাবতে হয়; এই ভাবগুলি যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব নামে

পরিচিত। আন্তরিকতার সহিত অনুষ্ঠিত হলে এগুলির প্রত্যেকটিই ভক্তকে শান্তিধামে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

আমরা দেখে এসেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-শিক্ষা-বিহীন মন মা-কালীকে মাতৃজ্ঞানে ও শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ প্রভুজ্ঞানে উপাসনা করে ইতঃপূর্বেই প্রথম দুটি ভাব অবলম্বনে বৈষ্ণবধর্মোক্ত উচ্চাবস্থা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে সখ্যভাব সাধনেও তিনি পূর্ণতা লাভ করেন। এখন বৈষ্ণবভাব সাধনার দুটি মাত্র অঙ্গের সাধন তাঁর বাকী ছিল—বাৎসল্যভাবের ও মধুরভাবের। তান্ত্রিক সাধনা শেষ হবার অব্যবহিত পরেই এদুটি ভাবের প্রথমটি অবলম্বনে সাধন করবার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন তিনি। তাঁর প্রতি ভৈরবীর মাতৃবৎ আচরণই বোধ হয় এর কারণ।

প্রায় এই সময়ে বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ জটাধারী নামে একজন পরিব্রাজক সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, নিজ সন্তান-জ্ঞানে তাঁর সেবা করতেন। জটাধারীর সঙ্গে রামলালার (বালক রামচন্দ্রের) ধাতুনির্মিত একটি মূর্তি থাকত; মূর্তিটিকে তিনি প্রাণ দিয়ে আদর করতেন, স্নেহভরে খাওয়াতেন, তার সঙ্গে খেলা করতেন, এমন কি রাত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে শয়ন করতেন। দীর্ঘদিন এভাবে সেবা-অভ্যাসের ফলে তিনি নিজ অধ্যাত্মসাধনপথের শেষে এসে পৌঁছেছিলেন; এখন খালি চোখেই সর্বক্ষণ এই দেবশিশুর দর্শন পেয়ে পরমানন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। জীবন্ত রামলালা আদুরে ছেলের মতো কখনো তাঁর কাছ ছাড়া হত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতের পবিত্র তীর্থে তীর্থে পর্যটন করে বেড়াচ্ছিলেন; এই পর্যটনের মুখেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থেমে কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে যান। জটাধারী তাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভবের কথা কখনো কাউকে বলেন নি, এবং জীবনের অতি মহার্ঘ গোপন সম্পদজ্ঞানে হৃদয়ের মণি-

কোঠায় তা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে তাঁর হৃদয়-কন্দর দেখতে পেলেন। তাঁর চোখের সামনে রামলালা ও তার ভক্ত-পিতার দিব্য লীলার অভিনয় চলতে লাগল, আর সে অভিনয়ের ভাগ্যবান দর্শক হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রামলালার কথাবার্তা চাল-চলন, জটাধারীর সঙ্গে তার বালকের মতো দুষ্টুমি, এ সবই তিনি প্রতিদিন গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ টের পেলেন, দেব-শিশুটি তাঁর প্রতি দিনে দিনে অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছে, এমনকি জটাধারীর সঙ্গে থাকার চেয়েও তাঁর কাছে থাকতেই তার ভাল লাগছে বেশী।

ফলে রামলালার ওপর তাঁর পিতৃস্নেহ বাঁধনহারা বন্যার মতো ভেঙ্গে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাকে আদর করতে, স্নান করাতে, খাওয়াতে ও তার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে দিলেন। এসব এত সহজ হয়ে গিয়েছিল যে দুষ্টুমি করলে তাকে শাসন করতেও বাধত না তাঁর। অবশ্য এরূপ কঠোর আচরণের পরক্ষণেই অনুতাপে তাঁর বুক ফেটে যেত, আর হৃদয় ভরে উঠত স্নেহের দুলালের প্রতি অনুকম্পায়।

এভাবে বৈষ্ণব সাধনার যে উচ্চভূমিতে কচিৎ কখনো কেউ উঠতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রকে পুত্ররূপে পেয়ে সেই উচ্চভূমিতে অবস্থান করে তিনি আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলে গিয়ে তাঁকে নিজের আদর-যত্ন ও তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, অসহায় বালক বলে ভাবতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা বাস্তবিকই অতি বিরল। তাঁদের ভেতর আবার হাজারে একজন পারেন এ ধরণের উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী হতে। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় পূর্ব হতেই ঈশ্বরের প্রতি পরাপ্রেমে পূর্ণ হয়ে ছিল; বাৎসল্যভাবের চরমে উঠতে এখন শুধু তাঁকে পথটা একটু বদলে নিতে হয়েছিল। রামলালা তাঁর এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তার মুহূর্তের বিচ্ছেদও অসহ্য হয়ে উঠত তাঁর

কাছে। আবার রামলালাও তাঁকে এত ভালবাসত যে, কখন তাঁর সঙ্গ ছেড়ে থাকতেই চাইত না। কিছুকাল পরে জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে মনস্থ করলেন। চলে যাবার মুখে রামলালা বায়না ধরে বসল, সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে যাবে। জটাধারী ইতোমধ্যে দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, এবং প্রাণে প্রাণে বুঝেছিলেন যে বাহ্যপূজার প্রয়োজন তাঁর মিটে গেছে। সেজন্য রামলালার এই ইচ্ছা পূরণ করতে একটুও কষ্ট হল না তাঁর। এতদিন ধরে যাঁর জীবন্ত বিগ্রহকে তিনি বুকে ধরে ফিরেছেন, বিদায়কালে সেই রামলালার ধাতু-মূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি হাসিমুখে দিয়ে গেলেন।

কিছুকাল পরে অবশ্য মধুরভাব প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে তাঁর সারা মন দখল করে বসল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহের দুর্বিষহ জ্বালায় বিদীর্ণহৃদয়া পুরাণবর্ণিতা গোপীদেরই একজন বলে তিনি নিজেকে ভাবতে লাগলেন। তাঁর হাবভাব সব গোপীদের মতোই হয়ে উঠল। কথাবার্তা, বেশভূষা, আচরণ ও চলাফেরায় প্রিয়তমের ঔদাসীন্যে অতিবিধুরা সতী যুবতীর মতোই হয়ে উঠলেন তিনি; দিব্যধামবিহারী প্রেমাস্পদের জন্য উত্তাল প্রেমে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গোপীদের সঙ্গে যেভাবে খেলতেন, তাঁর সঙ্গেও সেই চিরন্তন খেলাই খেলতে লাগলেন—তাঁর মন হরণ করে নিয়ে তাঁকে পাগল করে তুলে, আর নিজে সব সময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দূরে দূরে থেকে এই সর্বগ্রাসী ভাবোচ্ছ্বাসের আগুনে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন। কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতা তাঁকে মর্মাহত করল, গোপীদের হৃদয়ের মতোই দুঃসহ ব্যথায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিরহের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠল, এবং বঞ্চিত প্রেমিকের উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন তিনি; আহারনিদ্রা ত্যাগ করলেন, বহির্জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, আকুল আবেগে অধীর হয়ে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে উন্মাদের মতো খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তাঁর চতুর

প্রেমিককে। তীব্র মানসিক বেদনায় ও অত্যধিক দৈহিক কৃচ্ছ্রতায় আবার তাঁর শারীরিক যন্ত্রণাগুলি ফিরে এল। এই নিয়ে তিনবার এরকম হল। সারা শরীর জ্বলে যাওয়া, রোমকূপ দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়া, এবং ভাবসমাধিকালে দেহের প্রায় সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যাওয়া, সবই আবার দেখা দিল এবং শরীরের সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এনে ফেলল তাঁকে। গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধাই মহাভাবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন ; শ্রীরামকৃষ্ণের রক্তমাংসের শরীরে এই সময় সেই প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার শাস্ত্রবর্ণিত পরিপূর্ণ রূপটি এভাবে ফুটে উঠেছিল।

কৃষ্ণপ্রেমের ব্যর্থতার এই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে কয়েকমাস চলার পর অবশ্য একদিন তিনি ধন্য হলেন মধুরভাবের অনুপম আদর্শ এবং বৃন্দাবনের গোপীগণশ্রেষ্ঠা যথার্থই ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শনলাভে। দেহের স্বর্ণকান্তি এবং রূপলাবণ্যের বিভা ছড়িয়ে শ্রীরাধা একদিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এসে তাঁর শরীরে মিশে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। এই দর্শনের পর বহুদিন যাবৎ শ্রীরাধার সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ হয়ে গিয়েছিল। মহাভাবের শারীরিক ও মানসিক সব লক্ষণগুলিই তাঁর ভেতর ফুটে উঠত এই সময় ; দেখে ভৈরবী, বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরে তাঁর প্রেমের এই মর্মন্তুদ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটল। একটা পর্দা যেন হঠাৎ সরে গেল, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনোহারী মাধুর্য নিয়ে দেখা দিলেন, কাছে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে মিশে গেলেন। তাঁর উন্মত্ত ব্যাকুলতা এতে শান্ত হল, দিব্য আনন্দে হৃদয় ভরপুর হয়ে গেল। এই দর্শনের আনন্দ-শিহরণ তিনমাস কাল তাঁকে বিহ্বল করে রেখেছিল। এ তিনমাস বাহ্যজ্ঞান থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র সর্বক্ষণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন।

রাধাকান্তের মন্দিরের দালানে বসে ভাগবতপাঠ শ্রবণকালে একদিন তাঁর বিশেষ অর্থপূর্ণ একটি দর্শনলাভ হয়; ভাবাবস্থায় দেখেন, জ্যোতির্ময়বপু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর তাঁর পাদপদ্ম হতে একটি জ্যোতির রেখা নির্গত হয়ে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করল, পরে তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে ভাগবত-ভক্ত-ভগবান—এই ত্রয়ীকে কিছুকাল সংযুক্ত করে রেখে দিল। এই দর্শনের ফলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ভগবান ভক্ত ও ভাগবত—এ তিনটি আপাতদৃষ্টিতে পৃথক বলে মনে হলেও মূলতঃ এক—তিনে এক, একে তিন।

যেখানে পৌঁছুলে ভক্ত ভগবানকে প্রেমাস্পদ রূপে পেয়ে তাঁর সঙ্গে চিরতরে মিলিত হবার অপূর্ব উল্লাসের অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সেই শেষ ও দুরধিগম্য শিখরে গিয়ে উঠেছিলেন।

অদ্বৈত সাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তুতঃ ভক্তিমার্গের বা ভালবাসার পথের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। ধর্মানুসন্ধিৎসার প্রারম্ভে তাঁর কর্ণধারহীন মন এ পথ বেছে নিয়েছিল। কাঁটা-গুল্ম, খানা-খন্দ পার হয়ে পাগলের মতো তিনি ছুটে চলেছিলেন, এবং জগজ্জননী কালী ও শ্রীরামচন্দ্র-সহধর্মিণী সীতাদেবীর কাছে রসসিক্তপদে, ক্লান্তদেহে পৌঁছানোর পূর্বে কোথাও থামেন নি। ভৈরবীর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে চলার সময়, ক্রিয়াকলাপ-মণ্ডিত হলেও, এই একই ভালবাসার পথ ধরে তিনি গিয়েছিলেন। বহুবিধ উপলব্ধি ও চিন্ময় দেবীমূর্তি-দর্শন এবং কয়েকটি প্রতীক-ব্যঞ্জক দর্শন তাঁকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের আদিভূতা মহাশক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল। জটাধারী এবং তাঁর রামলালাও এই ভালবাসার পথ ধরেই তাঁকে পিতৃস্নেহ-সঞ্জাত দিব্যানন্দের, বাৎসল্য ভাবের চরম সীমায় নিয়ে

গিয়েছিল। মধুরভাবের সু-উচ্চ শিখরে আরোহণের পরই এ পথ কার্যতঃ ফুরিয়ে গেল।

এভাবে দ্বৈতবাদের সবকিছু অনুভূতিরই অধিকারী তিনি হয়েছিলেন, যে অনুভূতি লাভ করে ভক্ত সাধক সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে দিব্য-প্রেমের ডোরে নিজেকে বেঁধে ধন্য হয়ে যান। বিশ্বের সর্বময় অধিনায়ক ঈশ্বর মাতা, প্রভু, সখা, সন্তান ও প্রণয়ীরূপে সত্য-সত্যই তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। বহুবিধ মূর্তি ও নাম ধরে এসে ঈশ্বর তাঁকে কত আদর করেছেন, কখনো বা তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশেও গেছেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর ধর্মোন্মাদনার শুরু থেকে আরম্ভ করে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত নয় বৎসর কাল ভগবানের কোন না কোন দিব্যভাব অবলম্বনে তাঁকে চিন্তা করা ছাড়া অন্য আর কিছুই করেন নি তিনি ; এই কালের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন নামে ও রূপে সাকার ঈশ্বরের জীবন্ত সান্নিধ্যে তিনি কাটিয়েছেন। ঈশ্বর-প্রেম-সুধার একবিন্দু পান করতে পারলেই সাধারণ পর্যায়ের সাধকের শুষ্ককণ্ঠ রসসিক্ত হয়ে ওঠে, তার দুঃখ ও জাগতিক ক্লেশের চির অবসান ঘটে, এবং অনির্বচনীয় শান্তিতে মন চিরতরে পূর্ণ হয়ে যায় ; ঈশ্বর-প্রেম এমনি জিনিস! কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ কি করে যে এই প্রেমের অকূল সাগরে সত্যসত্যই মগ্ন হয়ে থাকতেন, এবং খুশিমতো নির্বাধে এ সুধা প্রাণভরে পান করতেন তা ভাবতেও শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

এত উঁচুতে ওঠা সত্ত্বেও 'মহান্-যাত্রা'-পথে তাঁকে থামতে দেওয়া হল না। আরো এগিয়ে বিশ্বের মূল কারণ নিরাকার পরমাত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার একত্ব অনুভব করে তাঁর অন্তরের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার চির-অবসান ঘটাবার জন্য জগন্মাতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে চললেন। কিছু কাজ তখনো বাকী ছিল। নিজের সঙ্গে ভগবানের যে বিচ্ছেদের ভাব প্রায়ই তাঁকে অতিমাত্রায় কাতর করে তুলছিল, চরম একত্ববোধরূপ জ্ঞানাতীত অনুভূতি-

লাভ করে তাকে চির-নির্বাসিত করতে হবে। তাঁর 'অহং'-ভাব যদিও পূর্ণ-সংশোধিত এবং ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, তবু তখনো তা একটা স্বচ্ছ আবরণের মতো বিদ্যমান থেকে, অনাদিকাল হতে জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত বিশ্বের আর সব কিছু হতে জ্ঞানের কর্তারূপে তাঁকে পৃথক করে রেখেছিল। 'অহং'-বোধের এটুকু আবরণও খুলে ফেলতে হবে, দেশ, কাল ও কার্যকারণ-সম্বন্ধের সব বেড়াই ভেঙ্গে ফেলতে হবে, জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত সমগ্র দ্বৈত-ভূমি ছাড়িয়ে যেতে হবে, যাতে অদ্বৈত-বেদান্ত যাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে, সেই কারণাতীত অবিকারী চরম সত্তার ও তাঁর মাঝখানে ভেদসৃষ্টি করার মতো প্রাতিভাসিক কোনও কিছুর অস্তিত্ব না থেকে যায়। নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রের জলে গলে একেবারে মিশে যায়, নিরাকার, অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিজের সত্তাকে তেমনি একেবারে মিশিয়ে দিয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্ব অনুভব করতে হবে। জগন্মাতা দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁর ওপর; সাকার ঈশ্বরকে ঘিরে তাঁর যা কিছু আনন্দময় স্বপ্ন, দর্শন ও ভাবসমাধি, সেগুলি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে যতক্ষণ না তিনি দ্বৈতভূমি ছেড়ে আসছিলেন, ততক্ষণ মা তাঁকে থামতে দিলেন না। ঠিক ক্ষণ বুঝেই একজন বেদান্তবাদী আচার্য এসে গেলেন কালীবাড়িতে; এই আচার্যের নির্দেশমতো চলে নুনের পুতুলের মতো ঈশ্বরের নির্গুণ সত্তার সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে মা তাঁকে আদেশ করলেন।

নতুন আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকটি হলেন তোতাপুরী, একজন বেদান্তবাদী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। দীর্ঘ তীর্থভ্রমণের পথে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এসে উঠলেন তিনি; সেখানে তাঁর আগমনে যে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তখনো তা জানতেন না। পঞ্জাব হতে বেরিয়ে গঙ্গা-সাগরে ও পুরীতে তীর্থদর্শন করে তিনি সদ্য ফিরেছেন। অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে ধৈর্য নিয়ে চল্লিশ বছর সাধনার ফলে

ইতঃপূর্বেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে পরমসত্তার সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্বের অনুভূতি তিনি লাভ করেছিলেন। বিধাতার আশীর্বাদরূপে প্রাপ্ত সবল শরীর, সুদৃঢ় মন ও বজ্রকঠিন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে এই মুক্তাত্মা পুরুষ সিংহের মতো দেশময় বিচরণ করে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি গোঁড়া অদ্বৈতবাদী ছিলেন ; নির্গুণ ব্রহ্ম বা চরম সত্তাকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টির আর সব কিছুকে ভ্রম-সঞ্জাত দৃশ্যমাত্র বলেই জানতেন তিনি। এরূপ ছায়াময় কোন বস্তুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না মোটেই। এমনকি সগুণ ঈশ্বরের প্রতিও তাঁর মনের কোন কোণে এতটুকু দরদের ঠাঁই ছিল না ; তাঁর দৃষ্টিতে এই ঈশ্বরও কল্পনা-প্রসূত, সত্য নন। কাজেই দ্বৈতমতের যে-কোন রকম সাধনা দেখলেই তিনি অবজ্ঞার হাসি হাসতেন। দেব-দেবীর প্রতিমার সম্মুখে বৈধ পূজা, প্রার্থনা, স্তবপাঠ ও মন্ত্রজপ করাকে তিনি আধ্যাত্মিকতার শিক্ষালয়ে শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী পর্যায়ে ফেলতেন। সাকার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আতিশয্যকে ভক্তের বিপথচালিত উৎসাহ বলেই ভাবতেন ; ভাবতেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে মায়ার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এঁরা। যাঁরা আধ্যাত্মিকতার অভিলাষী, তাঁর মতে তাঁদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে মায়ার গণ্ডি ভেদ করে বেরিয়ে এসে সমস্ত অজ্ঞানের বিনাশসাধন করা। কাজেই সাধন বলতে সংসারত্যাগ, সদসদ্‌বিচার ও পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্বের ধ্যান ইত্যাদিতেই তাঁর বিশ্বাস সীমায়িত ছিল। কারণ নাম-রূপাত্মক মায়ার রাজ্যের পারে গিয়ে নিরাকার কার্যকারণাতীত পরমসত্তার সঙ্গে নিজস্বরূপের একত্বের উপলব্ধিলাভের পথে কেবলমাত্র এগুলিই সহায়তা করতে পারে। শুধু এই জাতীয় সাধনায়—অদ্বৈতবেদান্ত-নির্দিষ্ট জ্ঞানমার্গে—তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, আর কোন কিছুতেই তাঁর আস্থা ছিল না।

এই ধরনের অসীমসাহসিক জীবন ও চিন্তার আদর্শ নিয়ে তোতাপুরী

যখন এসে হাজির হলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভক্তিপথের শেষপ্রান্তে ওজস্বী মনের গতিবেগ থামিয়ে সবে মাসতিনেক হবে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কালীমন্দিরের সামনের চাঁদনীতে তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থায় তোতাপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর অন্তর্মুখী দৃষ্টি ও আত্মসংস্থ ভাব দেখেই পুরীজী বুঝলেন, আধ্যাত্মিক পথের এরূপ অধিকারী অতি বিরল। কোনরূপ বিলম্ব বা ইতস্ততঃ না করে সেই বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীটি স্বেচ্ছায় গুরুরূপে তাঁকে জ্ঞানমার্গে পরিচালিত করতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, এ বিষয়ে আগে মায়ের অনুমতি না নিয়ে মতামত জানাতে তিনি অক্ষম। মন্দিরে গিয়ে দেখেন অনুমতি দেবার জন্য মা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। হাসিমুখে ফিরে এসে তোতাপুরীকে মার সম্মতিদানের কথা জানিয়ে আধ্যাত্মিকতার নতুন যাত্রাপথে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করলেন তিনি।

তোতাপুরী যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তা দ্বাদশ শতাব্দী ধরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রথানুযায়ী জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে সাধন করার অনুমতিলাভের পূর্বে শিক্ষানবীশকে সন্ন্যাসরূপ সর্বত্যাগের জীবনে দীক্ষিত হতে হয়। আত্মীয়-সংস্রব পরিত্যাগ করে এসে, সমগ্র অতীত জীবনকে শূন্যলীন স্বপ্নজ্ঞানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, জাগতিক বাধ্য-বাধকতার সব বন্ধন ছিন্ন করে তাকে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্গে ত্যাগ ও অধ্যাত্মমুক্তির নতুন জীবন শুরু করতে হয়। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম করণীয় ছিল তাঁর বেদান্তবাদী গুরুর কাছে এই নবজীবনে দীক্ষিত হওয়া।

পঞ্চবটীর কাছে যে কুটীরটিতে এতদিন তিনি সাধন করতেন, শুভদিন দেখে সেখানে গুরুসন্নিধানে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসব্রতের সমস্ত খুঁটিনাটি ক্রিয়া সমাধা করলেন। ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক শিখা-সূত্র সম্মুখস্থ হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়ে তার পরিবর্তে নবজীবনের চিহ্ন গুরুপ্রদত্ত

কৌপীন ও গৈরিক বস্ত্রে ভূষিত হলেন। প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সব সমাধা করে গভীর শ্রদ্ধাভরে তিনি গুরুসকাশে প্রণত হলে তোতাপুরী তাঁকে অদ্বৈতবেদান্তের জ্ঞানালোকদানে উদ্ভাসিত করতে লাগলেন।

উন্নত, সবলদেহ পঞ্জাবী সন্ন্যাসী কিভাবে মাঝারি গড়নের কোমলকায় বাঙ্গালী শিষ্যকে উপদেশ দান করছিলেন, কিভাবে নম্র, নিরহঙ্কার শিষ্যের হৃদয়ের গভীরতায় এই মুক্তপুরুষ মনের সব সঞ্চয় উজাড় করে দিচ্ছিলেন, কল্পনায় সে দৃশ্য বেশ ফুটে ওঠে। তাঁর বজ্রদৃঢ় মনের শৈলশিখরে যে জ্ঞান-স্রোতস্বিনী আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে তখন এভাবে নিম্নে প্রবাহিতা হয়ে সীমাহীন এক সাগরের অতলস্পর্শী গভীরতায় গিয়ে যে প্রবেশ করছে, সেকথা তোতাপুরী তখন ধারণাও করতে পারেন নি।

যাই হোক, নিজ অনুভূতি-সহায়ে অদ্বৈতবেদান্ত-প্রতিপাদিত যে জ্ঞানকে তিনি প্রাণবন্ত করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র, একাগ্র, আলোকিত চিত্তে তা সঞ্চার করতে লেগে গেলেন তিনি: "নিরাকার, অসীম, নিত্য, নিষ্কারণ ও মুক্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু; তিনি ছাড়া আর সবই, নিজের দেহ, মন এমন কি অহঙ্কার পর্যন্ত ভ্রমজ দৃশ্যমাত্র। দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্বই মূল অজ্ঞান- বা অবিদ্যা-সম্ভূত মায়ার রচনা। সত্যজ্ঞান-সহায়ে এই অজ্ঞান দূরীভূত করা মাত্র দেশ, কাল ও কার্যকারণ-সম্বন্ধ দিয়ে গড়া সমগ্র বিশ্বই শূন্যে বিলীন হয়ে যায়, যা থেকে যায়, তাই হল নির্গুণ ব্রহ্মের অনন্ত অস্তিত্ব; এখানে পৌঁছে জ্ঞানযোগী এই অখণ্ড অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের পূর্ণ একত্ব অনুভব করেন। তাঁর দেহ ও মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, জীবনের কোন লক্ষণই তাতে থাকে না; যতক্ষণ এ অবস্থা থাকে, যাঁরা দেখেন তাঁদের সকলেরই চোখে, এমন কি দেহবিদ্যার প্রামাণিক পরীক্ষাতেও, তা মৃতদেহবৎ প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানপথ ধরে চলতে চলতে এ অবস্থায় এসে সাধক পরব্রহ্ম বা নিত্যসত্তার সঙ্গে নিজের নিত্য একত্বের অনুভূতিরূপ

আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক-উদ্ভাসের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ইহাই অতীন্দ্রিয় বা জ্ঞানাতীত অবস্থা, ইহারই শাস্ত্রীয় নাম নির্বিকল্প সমাধি। নিজ গুরুর নির্দেশাধীনে সদসদ্ বিচার করতে করতে 'জগৎ মিথ্যা' এই বোধ আসা মাত্র, এবং বৈরাগ্য ও ধ্যানসহায়ে ভগবানের নির্গুণস্বরূপের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্বের বিশ্বাস অটল হয়ে ওঠা মাত্র সে এই লক্ষ্য লাভ করে।

সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে মন গুটিয়ে এনে নিজ আত্মার সত্য দিব্য স্বরূপের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হতে পুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে আদেশ করলেন। অতি অল্পকালমধ্যে তিনি জাগতিক বিষয় হতে মন গুটিয়ে আনলেন, কিন্তু জগন্মাতার চিন্ময় মূর্তি সেখানে জ্বলজ্বল করতে লাগল, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে তা সরাতে পারলেন না। হতাশ হয়ে অপারগতার কথা গুরুকে জানালেন তিনি; গুরু কিন্তু অটল, ছাড়লেন না তাঁকে। এক টুকরো ভাঙ্গা কাঁচ কুড়িয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ভ্রূমধ্যে তা বিদ্ধ করে দিয়ে, সেই বিন্দুতে মন একাগ্র করতে দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন; এবারে জ্ঞানকে অসিরূপে কল্পনা করে তার সাহায্যে মা-কালীর দিব্যমূর্তি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে সমর্থ হলেন। তাঁর মনের শেষ অবলম্বন চলে গেল, এবং নির্বিকল্প সমাধির অতলস্পর্শী গভীরতায় মন সোজা ডুবে গেল। "জগৎ মুছে গেল। দেশ আর রইল না। মনের অস্পষ্ট গভীরতায় চিন্তাগুলি ছায়ার মতো ভাসতে লাগল। পরে তা-ও লুপ্ত হয়ে 'অহং'-বোধের একটানা স্পন্দন মাত্র রয়ে গেল। শেষে সে স্পন্দনও থেমে গিয়ে শুদ্ধ সত্তা ছাড়া আর কিছুই রইল না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেন। দ্বৈতভাব মুছে গেল। মনবাক্যের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেলেন তিনি।"

একটানা তিনদিন তিনরাত্রি এভাবে অবস্থানের পর গুরু তাঁর দেহে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনলেন। যে উপলব্ধি লাভ করতে তাঁর

নিজের চল্লিশ বছরের সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল, শিষ্যকে তিনদিনে সেই উপলব্ধিতে পৌঁছুতে দেখে তোতাপুরীর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। পুরীজী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, পর্যটনের পথে তিনদিনের বেশী বাস করতেন না কোথাও; কিন্তু এই অদ্ভুত শিষ্যের আকর্ষণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে দীর্ঘ এগারো মাস কাটিয়ে গেলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের পরই শ্রীরামকৃষ্ণের ওজস্বী মনে নির্বিকল্প সমাধিতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল। শীঘ্রই তাঁর চেতনা জ্ঞেয়-জ্ঞাতার রাজ্য ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে গেল। পরবর্তী ছ-মাসের মধ্যে এরাজ্যের এলাকায় কচিৎ কখনো তা ফিরে আসত। মহাভাগ্যবান বিরল কোন সাধক একুশদিন মাত্র এ অবস্থায় থাকার সৌভাগ্য লাভ করলে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে সাধারণতঃ আর ফিরে আসেন না; এই কালের শেষে তাঁর সত্তা থেকে দেহ চির-বিচ্ছিন্ন হয়—শুকনো পাতার মতো আপনি খসে পড়ে যায়। সমুদ্রে নামলে নুনের পুতুল আর ফেরে না। কাজেই ছ-মাস ধরে এই চরম ভাবাতীত রাজ্যে প্রবাসের পর আবার যে তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে সত্যিই ফিরে এসেছিলেন, একে একটা অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক ঘটনাই বলতে হবে। এ সময় দীর্ঘ ব্যবধানে কদাচিৎ তাঁর ঈষণমাত্র বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসত, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্য; তাছাড়া তাঁর দেহে জীবনের কোন লক্ষণই দেখা যেত না এ সময়। বাহ্যজ্ঞানলাভের এই বিরতিগুলিও আবার আপনা-আপনি আসত না। একজন সাধু সে সময় দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে আনন্দময় জ্যোতিঃ দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাহ্যদৃষ্টিতে মৃত বলে প্রতীত এই দেহটির অভ্যন্তরে কি ঘটে চলেছে! ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তেই দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জড়বৎ দেহটিকে রক্ষা করার কাজে লেগে পড়লেন। প্রাণে প্রাণে

তিনি বুঝেছিলেন, এই পলাতক আত্মা দৈব ইচ্ছায় আবার দেহে ফিরে আসবে, জগতের পরম কল্যাণের জন্য কোন মহাকার্য তাকে সাধন করতে হবে। একথা বুঝেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ অটুট রাখার জন্য তিনি প্রাণপণে প্রয়াসী হলেন। দেহটিকে রক্ষা করতে হলে মুখে কোনরকমে জোর করে কিছু খাবার দিতে হবে; তাই সাধারণ জ্ঞানভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাঁর অঙ্গে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করতে দ্বিধা করতেন না। কখনো কখনো এই সাধুর চেষ্টা কিছুটা সফল হত, তখন মুখে কিছু ভাত গুঁজে দিলে পেটে গিয়ে তা পৌঁছুত। এত কাণ্ড ঘটেছিল, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ছ-মাসের মরণ-মূর্ছা সত্ত্বেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। এই কালের শেষে মানব-কল্যাণার্থে ভাবমুখে থাকার জন্য তিনি জগন্মাতার আদেশ লাভ করেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক আমাশয় রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হলেন। একটানা ছ-মাস এই অসুখে তিনি ভুগেছিলেন। এই কালে ব্যাধির দুর্বিষহ শারীরিক যন্ত্রণা তাঁর মনকে সাধারণ-ভূমিতে নামিয়ে নিয়ে আসে।

এভাবে অতি অল্পসময়ে, মাত্র একদিনে জ্ঞানযোগ-সাধনার গোটা পথটি অতিক্রম করেছিলেন এই অনলস পথ-যাত্রী—প্রায় দৌড়েই গিয়েছিলেন; আর পথের শেষে পৌঁছে প্রায় ছয় মাসকাল জ্ঞানাতীত পরতত্ত্বে লীন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের শেষ বাধা অতিক্রম করে ও জড়ের কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে তাঁর আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে একত্বে লীন হল, তখন তাঁর পাবার আর কিছু বাকী রইল না; কার্যতঃ তিনি তখন ধর্মপথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। কারণ অদ্বৈত সাধনার শেষ ধাপ নির্বিকল্প সমাধিতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে বিশ্বরূপে পরিস্ফুট সমগ্র দৃশ্যটির অন্তরালে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।

অজ্ঞেয়বাদীরা যাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলে থাকেন, সেই চরম সত্তা তাঁর কাছে জ্ঞাত হওয়ার চেয়েও বেশী কিছু হয়েছিল, কারণ তার সঙ্গে মিশে তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা অদ্বিতীয় চেতনাসাগরে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল; সীমাহীন অস্তিত্বের কাছে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর কোন অর্থই ছিল না; প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ সব দ্রবীভূত হয়ে এক অসীম, পরম, নিত্য আনন্দে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। চিরবিদ্যমানতায় কাল গিয়েছিল লুপ্ত হয়ে; মহাশূন্যতায় দেশ হয়েছিল অদৃশ্য; কার্যকারণ-সম্বন্ধের কোন সঙ্গতিই ছিল না সেখানে। এই উপলব্ধির স্বরূপ যে কি, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না, তা বাক্য-মনের অতীত। এ শান্তিধামে যিনি গেছেন, একমাত্র তিনিই এর স্বরূপ জানেন। তিনিও কিন্তু মানব-মনের অধিগম্য মায়ার রাজ্যের ভাষায় এই জ্ঞানাতীত অনুভূতি প্রকাশ করতে অক্ষম। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হয় নাই। বেদ পর্যন্ত ব্রহ্মের বর্ণনা দিতে অপারগ হয়ে তার আভাস মাত্র দিয়ে গেছে।

যাই হোক, সাধারণ অবস্থায় একটু ধাতস্থ হবার পর তাঁর সর্বমায়া-বিনির্মুক্ত মনে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অন্তরালে অবস্থিত মহিমময় একত্বের অনুভূতি জেগেই থাকত; সে-মন মগ্ন হয়ে থাকত দিব্যানন্দের অবিরাম প্রবাহে। নিপুণ শিল্পীর মতো এখন তিনি হৃদয়বীণায় ভক্তি ও জ্ঞানের তন্ত্রীর যে কোনটিতে খুশিমতো সুরলহরী তুলতে পারতেন। দৃঢ়প্রত্যয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি এখন বলতে পারতেন, 'পরতত্ত্বকে যখন নিষ্ক্রিয় বলে ভাবি, যখন ভাবি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কিছুই তিনি করেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বা নিরাকার ঈশ্বর—পুরুষ—বলি। আর যখন তাঁকে সক্রিয় ভাবি, যখন ভাবি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বা মায়া বা সাকার ঈশ্বর—প্রকৃতি—বলে থাকি। ভিন্ন নামে অভিহিত করলেও এ দুই-এর মধ্যে কোন ভেদ নেই। দুধ আর তার ধবলত্ব,

মণি আর তার জ্যোতিঃ, সাপ আর তার তির্যক-গতির মতো সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ভাবলেই আর একটিকে ভাবতেই হয়। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ।' তাছাড়া সমান দক্ষতা নিয়েই তিনি যোগ এবং কর্মের যুগ্ম তন্ত্রীতেও সুর-লহরী তুলতে পারতেন; তন্ত্রসাধনার সময় এ কাজে নিপুণ হয়েছিলেন তিনি। কাজেই অদ্বৈত-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর হিন্দুধর্মের কাছে শিখবার মতো কিছুই আর তাঁর বাকী রইল না।

অ-হিন্দু সাধন-মার্গে

তবু জগন্মাতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ আগের মতো সরল বালকই রয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের পায়ে তিনি নিজের ইচ্ছা নিঃশেষে সমর্পণ করে-ছিলেন। তাঁকে চালাবার দড়ি মায়ের হাতেই ধরা ছিল, মা যখন যেমন খুশি সেটা টেনে তাঁকে চালাতেন। মা অজানা সাগরের বিক্ষুব্ধ বুকে তাঁকে ছুড়ে দিয়েছেন; অসংখ্য পূর্বগ হিন্দু সত্যদ্রষ্টা যে-সব পথ ধরে ভগবান লাভ করেছেন, সেই সুপরিচিত পথের সবগুলির ওপর দিয়ে তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছেন। মা এভাবে আধ্যাত্মিক সত্য ও আনন্দের সর্ববিধ রূপ ও অবস্থার সঙ্গেই ইতোমধ্যে তাঁর প্রাণের যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তাঁকে দিয়ে মা আর কি করাতে চান? হিন্দু সাধন-সমুদ্রের সর্বত্র পাড়ি দেওয়া শেষ হওয়ামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মনে অ-হিন্দু মতগুলির সাগরজলে আবিষ্কারের অভিযানে বের হবার প্রেরণা জাগল। মা তাঁর চলা থামতে দিলেন না, এবং ক্রমান্বয়ে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মরূপ হিন্দুধর্মেতর ধর্মের সাধনপথ ধরে চলার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেন।

ইসলাম ধর্ম

আমাশয়ের ভীষণ আক্রমণ থেকে সেরে ওঠার মুখে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মন প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়,

এবং তখনই সাহস নিয়ে তিনি এই ধর্মমতের* সাধনায় লেগে পড়েন। এ সময় কালীবাড়িতে একজন ভক্তিমান মুসলমানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা, নম্রতা ও তন্ময় ভাব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভগবানলাভ হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণের এইটাই অব্যবহিত পূর্বের কারণ। মুসলমানটির নাম গোবিন্দ রায়; নাম শুনে মনে হয়, তিনি হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা জানালেন।

আনুষ্ঠানিক দীক্ষার পর তাঁর নমনীয় মন ইসলামের ছাঁচে পুরোপুরি গড়ে উঠল। অ-হিন্দু দর্শনার্থীদের একজনের মতো হয়ে তিনি মন্দির-সীমানার বাইরে এসে বাস করতে লাগলেন এবং খাওয়া-পরা, প্রার্থনাদি সর্ববিষয়েই নৈষ্ঠিক মুসলমানের মতো আচরণ শুরু করে দিলেন। হিন্দু দেবদেবী-সংশ্লিষ্ট সমস্ত চিন্তা, দর্শন ও ভাবাবেগ তাঁর মন থেকে তখনকার মতো একেবারে লুপ্ত হল এবং তাঁর পবিত্র চিত্ত নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতো ইসলাম ভাবের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতিফলনের জন্য প্রতীক্ষারত হয়ে রইল। তিনি 'আল্লা'-মন্ত্র জপ করে চললেন, শ্রদ্ধাবান মুসলমান ফকিরের মতো নিয়মিতভাবে নামাজ পড়তে লাগলেন। এই নব ধর্মমতে যেভাবে নির্দেশ রয়েছে সেভাবে চলে ভগবানকে সেভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর আন্তরিকতা এবং ভক্তি ও ধ্যানের আগ্রহ সীমাহীন হয়ে উঠল। ফলে ইসলাম সাধনপথে প্রচণ্ড গতিতে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন এবং অবিশ্বাস্য রকমের কম সময়ের মধ্যে, তিন দিনের ভেতরেই, তিনি পথের শেষে পৌঁছে গেলেন।

যাত্রাপথের শেষে তাঁর একটি দর্শনলাভ হয়; বোধ হয়, মহম্মদকে তিনি দেখেছিলেন: দেখলেন শ্বেতশ্মশ্রু, গম্ভীরানন এক পুরুষ নিজ প্রদীপ্ত মহিমায় মণ্ডিত হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের বর্ণানুরূপ গুণসমন্বিত নিরাকার ভগবানের উপলব্ধি করলেন,

এবং তারপর ভগবানের নিরাকার স্বরূপে, নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়ে গেলেন। ইতঃপূর্বে অদ্বৈতসাধনমার্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে অত্যুচ্চ শিখরে তিনি উঠেছিলেন, এভাবে ইসলাম সাধনপথ অবলম্বনেও তিনি সেখানেই পৌঁছে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি হতেই মনে হয়, এই চরম সত্যই, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্বমালিন্যবর্জিত পরব্রহ্মরূপ জ্ঞানাতীত ভূমিই হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই শেষ লক্ষ্য; উভয় পথই সাধককে চরমে এই একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। কাজেই একথা বলা যুক্তিযুক্ত যে, অদ্বৈত-অনুভূতিই এই উভয় ধর্মের সাধারণ ভূমি। পবিত্র ইসলাম ধর্মমতে সাধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনুভূতি লাভ করেছিলেন, লোকে যেদিন সে বিষয়ে চিন্তা করে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে, সেদিন এই সাধারণ যোগসূত্রই ভারতের এ দুটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়কে একসঙ্গে মিলিত করে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবে বলে আশা জাগে।

খৃষ্টধর্ম

এর প্রায় আট বৎসর পরে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে বাসনা জাগে, খৃস্টধর্মের পথটি কোথায় নিয়ে পৌঁছে দেয়, তা দেখতে হবে। তাঁর বিপুল বিচিত্র ধর্মানুভূতিগুলি এতদিনে তাঁকে গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেও যে-কোন ধর্মপথে চলার মতো যথেষ্ট সাহসী করে তুলেছিল। তাঁর প্রয়োজন ছিল শুধু রাস্তার একটা মানচিত্র। এই নতুন ধর্মমতের ভেতর কি আছে, এর ভাব ও আদর্শই বা কিরূপ, এসব বলে দিতে পারে এমন একজন লোক তিনি চাইছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গিয়ে এরূপ একজন লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। কলকাতার একজন ধনী বিদ্বান ব্যক্তি, শ্রীশম্ভুচরণ মল্লিক, কালীবাড়ির কাছেই তাঁর নিজের একটি বড় বাগানবাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ হবার পর তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে শম্ভুবাবু তাঁকে বাইবেল পড়ে শোনাতে

থাকেন। যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে যা কিছু শুনলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তা সবই সাগ্রহে মনে গেঁথে নিলেন। যীশুর অতি পবিত্র স্বর্গীয় জীবন তাঁকে মুগ্ধ করল, আকৃষ্ট করল।

এর অল্প কিছুদিন পরে কালীবাড়িব কাছেই আর এক জায়গায় শ্রীযদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় বসে একসময় তিনি টের পেলেন, তাঁর কাছে এই আকর্ষণের অর্থ কী এবং যীশুখৃষ্টের অপূর্ব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি কতখানি জড়িয়ে পড়েছেন। দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি সব দেখছিলেন তিনি; দেখেন তার ভেতর একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে—শিশু যীশুখৃষ্টকে কোলে করে ম্যাডোনা বসে আছেন। ছবিটি তিনি একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, ছবির মূর্তিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে; দেখেন সেখান থেকে আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর শরীর ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশ করছে। তৎক্ষণাৎ খৃষ্ট ও তৎপ্রচারিত আদর্শের প্রতি তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়ে শৈল-স্খলিত বিশালকায় তুহিনরাশির মতো ছুটে এল, এবং তার বিপুল ভারে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁর সমস্ত চিন্তা ও অনুরাগ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। অতর্কিতে বিদ্যুৎবেগে মনে একটি আমূল পরিবর্তন এল। অবাক হয়ে গেলেন তিনি, সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বোধ কবলেন। হতভম্ব হয়ে ভয়বিহ্বল চিত্তে চীৎকার করে উঠলেন—"মা, আমার এ কী করলি! দেখা দিয়ে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্, মা!" তাঁর এই করুণ নিবেদনে মা কানই দিলেন না, কোন সাহায্য এল না মায়ের কাছ থেকে। মা-ই তো পিছনে থেকে তাঁকে চালাচ্ছিলেন—কাজেই এই নতুন খেলা শেষ হবার আগে তাঁকে ছাড়বেন কি করে? তাঁর অসহায় মন এই নতুন ভাবের প্রভাব কাটিয়ে পুরাতন ভাবধারা আঁকড়ে থাকার জন্য কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করল, কিন্তু নবভাব ও নবাদর্শের প্রচণ্ড চাপ সেখান থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে জোর করে এই বিপর্যয়ময় পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়ে দিল। জগন্মাতার হিন্দুসন্তান

সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলেন ঈশ্বরের পুত্র যীশুখৃষ্টের ভক্তে। যীশুর ভাব ও আদর্শে তাঁর চিত্ত ভরে উঠল। পর পর তিন দিন তাঁর মনে কেবল খৃষ্টানজনোচিত চিন্তা ও ভালবাসা ছাড়া আর কোন কিছুর স্থান ছিল না।

চতুর্থ দিন বিকালবেলা পঞ্চবটীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় একটু দূরে একজন অপরিচিত পুরুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। চেহারা দেখে বুঝলেন তিনি বিদেশী। দেখেন, তাঁর দেহ গৌরবর্ণ, নয়ন দুটি বিশাল ও সুন্দর। মুখের ভাব অসাধারণ রকম শান্ত, দৃষ্টি তাঁরই প্রতি একাগ্র-নিবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন এ আগন্তুকটি কে, এমন সময় তিনি খুব কাছে এগিয়ে আসতে তাঁর অন্তর বলে উঠল, "ইনি ঈশামসি, মানবজাতির উদ্ধারের জন্য ইনিই হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করেছিলেন, অশেষ দুঃখ বরণ করে নিয়েছিলেন। এরূপ হবার পরই ঈশ্বরের পুত্র জগন্মাতার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। যীশুখৃষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সবিকল্প সমাধিতে একেবারে তলিয়ে গিয়ে সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করলেন। এই অনুভূতির ফলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে যীশুখৃষ্ট ভগবানের অবতার।

এখানেই তাঁর দীর্ঘ ও বহুবিচিত্র আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তি। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্রুতগতিতে তিনি একের পর এক আধ্যাত্মিক সাধনা করেই চলেছিলেন; বিশ্রামের জন্য বিশেষ অবকাশ পান নি। ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য প্রত্যক্ষ করার পর এই সাধন-পর্যায়ের শেষ হয়। আশ্চর্য, তাঁর জীবনের শেষ সাধন-পথটিতে, খৃষ্টধর্মের পথে, তিনি চলতে শুরু করলেন মাঝখানে প্রায় আট বছরের ব্যবধান দিয়ে, যা এর আগে কখনো হয় নি। এই সাধনের আর একটা বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। শুধু এই খৃষ্টধর্মমতে সাধনার বেলাতেই সাধনপথের

প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের জন্য তাঁকে কালীবাড়ির সীমানার বাইরে যেতে হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পরিক্রমার অতুলনীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে পৃথিবীর বড় বড় ধর্মগুলির অন্যতম বৌদ্ধধর্মের কোন স্থান নেই, একথার উল্লেখ করা কারো পক্ষে অবশ্য অযৌক্তিক নয়। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, অদ্বৈতবেদান্ত-সাধনকালে আসলে এ পথটির ওপর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। সাধনপদ্ধতি ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্ম বস্তুতঃ অদ্বৈতবেদান্তের অন্তর্গত। সমভাবে দুটি পথকেই জ্ঞানপথ বলা চলে।

সাকার ঈশ্বর এবং দ্বৈতভাবের সর্ববিধ চিন্তা ও উপাসনা-পদ্ধতি পরিহার করার কথা উভয় মতই জোর দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে থাকে। নীতিপরায়ণতায় পূর্ণতা লাভ করা, দৃশ্যমান জগতের অনিত্যতার অনুধ্যান করা ও অজ্ঞানের রাজ্য থেকে মন সম্পূর্ণ গুটিয়ে আনাকেই আধ্যাত্মিক সাধনার প্রধান অঙ্গ বলে উভয় ধর্মই সমানভাবে জোর দেয়। উভয় মতই সাধনপ্রণালীর দিক থেকে এপর্যন্ত সমান। আধ্যাত্মিক সাধনার অতি-প্রয়োজনীয় করণীয় হিসাবে অদ্বৈত বেদান্ত এটুকু শুধু বেশী বলে যে, মানুষের আত্মার সত্যতা ও নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তার একত্বের ধ্যানে মগ্ন হতে হবে। মোটকথা, জ্ঞানযোগীকে বৌদ্ধধর্মনির্দিষ্ট সমস্ত সাধনই করে যেতে হয়। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম বলতে এখানে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত বিশুদ্ধ ধর্ম-নির্দেশের কথাই বলা হচ্ছে। লক্ষ্যের কথা ধরলে বৌদ্ধদের নির্বাণ চরম সত্তায় বিলীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, অদ্বৈতবাদীদের নির্বিকল্প সমাধিও তাই।

কাজেই অদ্বৈতসাধন-পথের সবটুকু চলা শেষ করার পর এবং পরতত্ত্বরূপ জ্ঞানাতীত ভূমিতে ছ'মাস কাটাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের বৌদ্ধমতে সাধন করে

নতুন আর কিছু পাবার ছিল না। তাঁর নৈতিক পূর্ণতা ছিল প্রশ্নাতীত। অহিংসা তাঁর জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ হয়ে গিয়েছিল। তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের ওপর দিয়ে পদতলে কোমল তৃণ দ'লে চলার সময় সত্যিই তিনি বুকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতেন; মনে হত কেউ যেন তাঁরই বুকের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এভাবে অদ্বৈতসাধনার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের সাধন ও উদ্দেশ্য উভয়ই পূর্ণভাবে তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার-জ্ঞানে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বৌদ্ধধর্ম ও তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলতেন, "বুদ্ধ যে ভগবানের অবতার, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। তাঁর উপদেশ ও বেদের জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।"

সাধনপথে পরিক্রমার অবসান

অদ্বৈত-উপলব্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বিভিন্ন পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের অক্লান্ত ও প্রায় অবিরাম পথ চলা শেষ হয়। এর ঠিক পরই মুসলমান ধর্মপথে, এবং প্রায় আট বছর পরে খৃষ্টান ধর্মপথ ধরেও তিনি চলেছিলেন, সন্দেহ নাই; উভয় পথেই লক্ষ্য লাভ করতে তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র তিন দিন করে। তবে, এ পথচলা যেন তাঁর ছুটির দিনে দেশভ্রমণে যাবার মতো। বাস্তবিক অদ্বৈতসাধনার পথে চলে ভগবানের জ্ঞানাতীত নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি পূর্ণ অধিগত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন স্থানই তাঁর আর অজানা ছিল না। অ-হিন্দু ধর্মপথে তাঁর চলার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এটুকু দেখার জন্য যে, যে-ঈশ্বরীয় লক্ষ্যকে তাঁর সর্ববিধ রূপ ও ভাবে পূর্বে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এ পথগুলিও সেখানেই নিয়ে যায় কি না। দেখে তিনি পরিতৃপ্তই হয়েছিলেন। কাজেই ইসলাম ও খৃষ্টান মতে সাধনার সঙ্গে তাঁর আর সব আধ্যাত্মিক অন্বেষণগুলির অনেক প্রভেদ দেখা যায়। পরব্রহ্মরূপ উচ্চ জ্ঞানাতীত ভূমিতে তাঁর ছ'মাস অবস্থানই এই অন্বেষণগুলির

যথাযোগ্য পরিসমাপ্তি ঘটায়। এর পরই বস্তুতঃ তাঁর পথ চলা থেমে গেল, এবং বাকী দিনগুলি তিনি মানুষের সঙ্গে কাটাতে চাইলেন। তাঁব অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে প্রার্থনা জাগল, "মা, আমায় মানুষের সংস্পর্শে রাখিস, আমায় রসে বসে রাখিস, শুকনো সাধু করিস না।" জগন্মাতা তাঁর এ প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন অলঙ্ঘ্য আদেশ দিয়ে, "মানবপ্রেমের জন্য তুই ভাবমুখে (শুদ্ধ ও আপেক্ষিক চৈতন্যের মিলনসীমায়) থাক্।"

নিরাপদ তটভূমিতে

এই অক্লান্ত ডুবুরীটি দীর্ঘদিন পরে অবশেষে গভীর বারিধি হতে শুষ্ক নিরাপদ তটভূমিতে ফিবে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন অপূর্ব সম্পদ—সর্ববিধ মহামূল্য মণিবত্ন, যা তিনি এতদিন ডুবে ডুবে সংগ্রহ করে চলেছিলেন। জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, জগন্মাতার রোমাঞ্চকর নরলীলা প্রাণভরে উপভোগ করেছিলেন। জ্ঞানালোক-সমুজ্জ্বল চোখে তিনি বিশ্বকে অজ্ঞানের আবরণমুক্ত রূপে দেখতে পেতেন। নিজেকে সবার মধ্যে ও সকলকে নিজের মধ্যে দেখতেন তিনি। থেকে থেকে তাঁর আত্মা ভেদের রাজ্য ছাড়িয়ে লীন হয়ে যেত অদ্বিতীয় সত্তায়। নির্বিকল্প সমাধিতে এরূপ মগ্ন হওয়ার ঠিক পরই কিন্তু তিনি ঊর্ধ্ব-অধঃ অন্তর-বাহির সর্বত্রই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র দেখতে পেতেন। প্রকৃতির বহুধাবিভক্ত বস্তুনিচয়কে যেন সাগরের ফেনার মতো, ছোট বড় সব তরঙ্গের মতো বলে তাঁর বোধ হত। এই সর্বত্রপরিব্যাপ্ত পরমানন্দোপেত একত্বে নিবদ্ধদৃষ্টি ও দিব্যপ্রেমামৃতে পরিপূর্ণহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ-জীবনের চাহিদা মেটাতে প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁর অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যে আসত সেই-ই যে তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতো আচ্ছন্ন হত, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিজের বিমল

পবিত্রতা, পূর্ণ নিরহঙ্কার ভাব এবং উচ্ছ্বসিত মানবপ্রেম প্রভাবে প্রকাণ্ড একটা চুম্বকের মতো তিনি সকলকেই আকর্ষণ করে নিতেন।

তাঁর সাদাসিধে আচরণ, তাঁর প্রশান্ত আনন, তাঁর কথা—যা প্রায়ই জ্ঞানালোকবর্ষী নীতিগর্ভ গল্পে ও উজ্জ্বল হাস্যকৌতুকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত, তাঁর সদাপ্রফুল্ল ভাব—মাঝে মাঝে যা দিব্য ভাবাবেশের শান্ত স্থৈর্যে রূপায়িত হত, এবং সর্বোপরি প্রত্যেকের জন্যই তাঁর অসীম সহানুভূতি—এসব তাঁর সমীপাগত সৎব্যক্তিদেব সকলকেই মুগ্ধ করত এবং তাঁদের ভেতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিত। অনেক উৎসুক ও একাগ্রহৃদয় ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলেন—প্রকৃত আধ্যাত্মিক সম্পদ, আধ্যাত্মিক রত্ন বলতে কি বোঝায়, এবং তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা ও উপদেশ লাভ করে সেই রত্নের সন্ধানে তাঁরা একে একে ধর্মের সাগরে ডুব দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী একটি বর্ণনায় তাঁকে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন: "এই পুণ্যাত্মা সৎব্যক্তি হিন্দুধর্মের গভীরতা ও মাধুর্যের জীবন্ত বিগ্রহ। দেহকে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয় করেছেন। তাঁর ভেতরটা আত্মা, ধর্মের সত্যতা, আনন্দ ও পুণ্য পবিত্রতায় ভরে রয়েছে। জগতের অনিত্যতা ও অসারগর্ভতার সাক্ষিস্বরূপ সিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী তিনি; তাঁর সাক্ষ্য প্রত্যেক হিন্দুব হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সাড়া জাগায়। তাঁর সাদাসিধে জীবনে ঈশ্বর ছাড়া আব কোন চিন্তা নেই, আর কোন কর্ম নেই, আর কোন বন্ধু বা আত্মীয় নেই। যে-ঈশ্বর তাঁর হৃদয় পূর্ণ করেও উপচে পড়েন। তাঁর বিমল পবিত্রতা, তাঁর গভীর বর্ণনাতীত দিব্যানন্দ, কোন বই না পড়া সত্ত্বেও তাঁর অগাধ জ্ঞান, বালকের মতো প্রশান্তিমগ্নতা ও সর্বমানবের প্রতি তাঁর ভালবাসা, এবং ভগবানের জন্য তাঁর সর্বগ্রাসী আকুল প্রেমই তাঁর প্রচেষ্টার একমাত্র পুরস্কার।" ঠিক পাকা হিন্দু বলা চলে না, এমন একজন লোকের লেখনী-নিঃসৃত এই কথাগুলি পড়লেই সঠিক

ধারণা হয়, লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর কি দেখতে পেত, দেখার মতো চোখ ও শোনার মতো কান নিয়ে যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁদের ওপর কতখানি প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক প্রভাব তিনি বিস্তার করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে বা পঞ্চবটীর ছায়া-সুনিবিড় পাদপতলে তাঁর কাছে বসে আরো কয়েকজন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি আনন্দ-আত্মহারা নিবিষ্ট মনে তাঁর জ্ঞান-প্রোজ্জ্বল হৃদয়ের ভাবোদ্দীপ্ত বাণী শুনছেন—মনশ্চক্ষে এদৃশ্য দেখতেও আনন্দ জাগে। শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারা চমকপ্রদ না হলেও সুশ্রী ছিল, চেহারায় একটা সূক্ষ্ম মাধুর্য ছিল। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখে অল্প দাড়ি; আয়ত কৃষ্ণ হাস্যোজ্জ্বল নয়নযুগল সর্বদা অর্ধনিমীলিত হয়ে থাকত—তাঁর মনের অন্তর্মুখী ভাব ফুটে উঠত তাতে। চিত্তাপহারী মৃদুহাসির ঝলক প্রায়ই উদ্ভাসিত হত তাঁর স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে। সাদাসিধে একখানা কাপড় কোমরে জড়িয়ে তার একপ্রান্ত বুকের ওপর দিয়ে কাঁধে ফেলে পদ্মাসনে যুক্তকরে বসতেন তিনি—সামনে থাকত স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি সশ্রদ্ধ শ্রোতা; হৃদয়ের অন্তস্তল হতে উৎসারিত কথামৃত বর্ষণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে-সব শ্রোতাদের তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। তাঁর ভাবে অপরের চেয়ে নিজেকে কোন অংশে বড় ভাববার বিন্দুমাত্র নামগন্ধ কখনো প্রকাশ পেত না; সরল নির্দোষ বালকের মতো ছিল তাঁর আচরণ। এতে তাঁর বেছে-নেওয়া শ্রোতাদের মনে বিনয়ের একটা নিখুঁত ছবি গেঁথে যেত। নিজের কোন মৌলিকত্বের দাবি কখনো করেন নি তিনি, বলতেন—তাঁর কথার অন্তর্নিহিত জ্ঞানের কৃতিত্ব হচ্ছে মায়ের, এবং অনুভব করতেন মা-ই তাঁর ভাব ও ভাষা যুগিয়ে দিচ্ছেন। শহুরে অভিজাত লোকাচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার মাধুর্যে মণ্ডিত ছিলেন তিনি; তাঁর ভাষা সভ্যসমাজের ভাষার মতো মার্জিত ছিল না, তাঁর উচ্চারণও সেরূপ নয়, নিপুণ সুবক্তার চমকপ্রদ বাক্যালঙ্কারও থাকত না তাঁর কথায়। তিনি গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতেন; বাংলার যে জেলায়

তাঁর জন্ম হয়েছিল (হুগলী জেলা) সেখানকার সরল গ্রামবাসীদের কথায় টান থাকত তাতে। তাছাড়া, সামান্য একটু তোতলামির জন্য তাঁর কথা কতকটা থেমে থেমে যেত, অবশ্য এতে তা খুবই শ্রুতিমধুর হত। "কিন্তু তাঁর কথা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সম্পদ দিয়ে, উপমাদৃষ্টান্তের অফুরন্ত ভাণ্ডার দিয়ে, পর্যবেক্ষণের অতুলনীয় শক্তি দিয়ে, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম হাস্যরস দিয়ে; মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত সহানুভূতির অপূর্ব ঔদার্যের ও জ্ঞানের অবিরাম ধারায় নিষ্ণাত করে"—তাঁকে দেখে-ছিলেন এমন এক ব্যক্তি একথা লিখেছেন—"এত উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি সমাসীন ছিলেন যে, যাঁরা তাঁকে দেখতে যেত তাঁদের শুধু অবাক বিস্ময়ে সে উচ্চভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। তাঁর কথা শুনে সেকথার মর্মগ্রহণ করেই হোক বা রহস্যাবৃত থেকেই হোক, মানুষকে চমৎকৃত হতেই হত। তাঁর স্পষ্টতা যেমন আশ্চর্যরকমের, তাঁর জ্ঞানও তেমনি অতল-স্পর্শী।" ইনি আরো বলেছেন, "তাঁর মুখ থেকে অপূর্ব জ্ঞানের ধারা শান্তছন্দে অবিরাম বয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবে কথা বলতেন, সেভাবে কথা বলতে আর কাউকে মানুষ আজ পর্যন্ত দেখেছে বলে জানা নেই। প্রাচীন আর্য-ঋষিদের জ্ঞান-সম্পদ, উপনিষদের কঠিন শিক্ষা, বেদান্তের জটিলতা, সবই তাঁর কাছে এত সুপরিচিত ছিল যে, মনে হত তিনি যেন সারাজীবন এসব অধ্যয়ন করেই কাটিয়েছেন।"

সনাতনপন্থী পণ্ডিত ও ভক্ত সঙ্গে

পূর্বেই, তান্ত্রিক সাধনা শেষ করার পরই, জগন্মাতা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কালে তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিলাভের জন্য অনেক সব ভক্ত আসবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। বাস্তবিকই কোন বিশেষ ধর্মপথ অবলম্বনে সাধন শেষ করে সত্য উপলব্ধি করা মাত্রই সেই

মতের ভক্তের দল তাঁর কাছে এসে জুটত এবং তাঁর অনুপ্রেরণাময় অভিজ্ঞতায় ও অমূল্য উপদেশে উৎসাহিত এবং জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ফিরে যেত। এভাবে কার্যপরিণত ধর্মের ভাবগুলি ছড়িয়ে পড়ত শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে বহু সত্য- ও দিব্যানন্দ-অনুসন্ধিৎসুর কাছে, এবং তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আবার তাঁদের নিজ নিজ ভক্ত ও অনুরাগীদের দলের ভেতর। এভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন দলগত ধর্মলাভেচ্ছুদের ভক্তি দ্রুত প্রাণবন্ত হয়ে ফলপ্রসূ হয়ে উঠত আধ্যাত্মিক সত্যের সর্ববিধ ভাব ও রূপের দ্রষ্টা এই অদ্ভুত ঋষির সঞ্জীবনী স্পর্শে। কোন ডঙ্কা-নিনাদ না করে, সাধারণের মধ্যে কোন চমকপ্রদ বক্তৃতা না দিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির শান্ত নিভৃতে বসে থেকেই হিন্দুধর্মের সর্ববিধ বহুবিচিত্র শাখার ভিতরে প্রাণসঞ্চার করে হিন্দুধর্মের নবজাগরণের যুগের সূত্রপাত করেন। নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে তিনি তাঁর বিস্ময়কর বিচিত্র উপলব্ধিগুলির বীজ সযত্নে বপন করেছিলেন নির্বাচিত বিভিন্ন চিত্ত-ভূমিতে, যার ফলে সারা দেশ জুড়ে বহুবিধ আধ্যাত্মিক জাগরণের উদ্ভব ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল।

তান্ত্রিক সাধনার পর থেকে তাঁর আকর্ষণীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও অনুপ্রেরণা-প্রদায়ী সংস্পর্শে এসে হৃদয়ে একটা গভীর ছাপ নিয়ে গিয়েছিল —এমন সব বিবিধ শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থ ও যথার্থতঃ ভগবদ্-উপলব্ধিকামী সনাতনপন্থী প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতালিপ্সুদের সংখ্যা ছিল অগণিত। এই সব সত্যান্বেষীরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর আধ্যাত্মিকতার জাজ্জ্বল্যমান শিখা থেকে নিজ নিজ হৃদয়দীপ জ্বেলে নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যেতেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের অস্তিত্বের কোন চিহ্নও রেখে যেতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে এইসব ভাগ্যবানদের নাম উল্লেখ করতেন, কিন্তু এঁদের ভেতর অতি অল্প কয়েকজনের চিত্তাকর্ষক বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তাঁদের

দু-একজনের মনোভাব অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করছি—আশা করি তা ভালই লাগবে।

পণ্ডিত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্ব হতেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; সংসারে বীতরাগ হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের তীব্র ব্যাকুলতা হৃদয়ে ধরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করার পর তাঁর অনুমতি নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হবার জন্য তিনি নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েন। রাজপুতানার একজন হিন্দুষড়্‌দর্শনাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী, শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করে তাঁর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করার পর নীরবে সে স্থান পরিত্যাগ করেন। বর্ধমানের মহারাজার প্রধান সভাপণ্ডিত পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে ভক্তি করতেন এবং তাঁর চিত্তহারী সঙ্গলাভে প্রভূত উপকৃত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত কৃষ্ণকিশোর দক্ষিণেশ্বর থেকে মাইল দুয়েকের ভেতরেই বাস করতেন; শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গনিবাসী চন্দ্র ও গিরিজা পরস্পরের গুরুভ্রাতা ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শিষ্য ছিলেন। তান্ত্রিক সাধনার ফলে এঁদের কিছু সিদ্ধাই হয়েছিল; শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এঁদের সাক্ষাৎকার হয় এবং চলার পথে আশে-পাশে না তাকিয়ে ভগবানলাভের জন্য সোজা এগিয়ে চলার প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই এঁরা লাভ করেছিলেন।

গুরুসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু অদ্বৈতসাধনার সনাতন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের (নির্বিকল্প সমাধিলাভে) অপূর্ব সাফল্য দেখে

অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে অতীব মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে একটানা এগারো মাস বাস করলেন। পুরীজী যতই তাঁর সঙ্গ করতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মনে ততই গভীর রেখাপাত করতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর অদ্ভুত একটা মৌলিকত্ব লক্ষ্য করলেন তিনি। আপেক্ষিক জগৎ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণাগুলি তিনি ধীরে ধীরে মেনে নিলেন। শেষ পর্যন্ত সবই মেনেছিলেন।

খাঁটি অদ্বৈতবেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মতো পুরীজী দৃশ্যস্থানীয় সমগ্র বিশ্বকে, এমন কি সাকার ঈশ্বরকেও শিশুসুলভ বাসনায় গড়া সোনার স্বপ্ন বলে জেনে অস্বীকার করে চলতেন। সেজন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পরও শ্রীরামকৃষ্ণকে জগন্মাতার ভাবে তন্ময় হয়ে যেতে দেখে প্রায়ই তিনি ঠাট্টা করতেন, কারণ এ ভাবরাজ্যও অজ্ঞানেরই অন্তর্গত। শিক্ষানবীশদের তো কথাই নেই, তোতাপুরীর মতো মুক্তাত্মা অদ্বৈতবাদীরাও এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে দূরে থাকতে চান। অনাদি অজ্ঞান ও ভ্রমের মোহিনী মায়াই হচ্ছে সর্ববিধ বন্ধনের কারণ। যে-সত্যজ্ঞান লাভ করে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়, মায়া সে-সত্যজ্ঞানকে আবৃত করে রাখে, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে লুকিয়ে রাখে। জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যা দৃষ্টিভঙ্গী, তা ভ্রমজ; সে-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চললে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষার খোরাক যুগিয়ে চলে, এমন একটা জড়বস্তুর রাজত্ব ছাড়া সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকৃতির ভেতর অন্য আর কিছুই দেখা যায় না। কাজেই যতদিন এ ভ্রম থাকে, ততদিন আসক্তির চিরক্রীতদাস হয়ে মানুষকে ইন্দ্রিয়-জগতেই শৃঙ্খলিত হয়ে থাকতে হয়; হিন্দুশাস্ত্রমতে যন্ত্রণাময় জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন থেকে ততদিন তার মুক্তি নেই। এই জন্যই জ্ঞানপথের যাত্রীদের যাত্রার প্রারম্ভ থেকেই শেখানো হয়, 'প্রকৃতির এই ভ্রমজ রূপের সঙ্গে কোনরূপ আপস কোরো না, সংগ্রাম করে একে একেবারে বিনষ্ট করে ফেল।' এই ভ্রমই হচ্ছে জ্ঞানমার্গীদের চিরশত্রু; এরই নাম মায়া। চিরমুক্তি ও পূর্ণতা রূপ

দিব্যানন্দময় লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে এই মায়াকে তাঁদের উৎখাত করতেই হয়। সেজন্য মনে হয়, লক্ষ্যলাভ করে ফিরে আসার পরও এই পথের মুক্তপুরুষদের হৃদয়ে মায়ার প্রতি পূর্বের মনোভাবই থেকে যায়; এই বিজিত শত্রুকে তাঁরা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অন্যরূপ। তিনিও অবশ্য নিজের গুরুর মতোই ভালভাবে জানতেন যে, সৃষ্টি ভ্রমজ দৃশ্যমাত্র; জগতের স্বরূপ—চিরন্তন সত্য—রয়েছে এই দৃশ্যের পিছনে। তবু উপেক্ষা না করে সৃষ্টিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। সৃষ্টির ভেতর একটা রহস্যঘন মহিমামণ্ডিত ঈশ্বরীয় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন বলে চারিদিকের সব কিছুর মধ্যে নিত্য পরাচৈতন্যের উপলব্ধি হত তাঁর। অতি উচ্চ জ্ঞানাতীত ভূমিতে তিনি যে চৈতন্য-সত্তাকে প্রত্যক্ষ করতেন, সেখান থেকে বহু নিম্নে এসে বিশ্বের নামরূপের রহস্যময় আবরণের ভেতরেও সেই সত্তাকেই দেখতে পেতেন। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নামরূপের খোলটা অতি স্বচ্ছ দেখাত; তার ভেতর ঈশ্বরীয় প্রকাশের মহিমা ও অপরূপ মাধুর্য তিনি দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখতে পেতেন। আর দেখতেন, এ খোলগুলি যিনি বুনেছেন সেই মহাশক্তিমতী মায়াই হচ্ছেন তাঁর মা-কালী, জগজ্জননী। তিনিই আদিভূতা শক্তি, প্রকৃতি। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো নির্গুণ ব্রহ্ম ও তিনি অভেদ। জগতের শাঁস ও খোল দুই-ই তিনি; তিনিই আধার, তিনিই আধেয়। মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকে জাল বের করে আবার তা নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, তিনিও তেমনি নিজের ভেতর থেকে এ সৃষ্টিকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন, আবার একে নিজের ভেতর সংহরণও করে নেবেন। তিনিই বিশ্বজননী, তিনিই বেদান্ত বা উপনিষদের ব্রহ্ম, আত্মা। নিত্যা বিশ্বনিয়ন্ত্রী তিনি; তিনিই নিয়ম সৃষ্টি করেন, সে নিয়ম আবার পালটান-ও তিনি। তাঁর অমোঘ ইচ্ছাতেই কর্ম ফলপ্রসূ হয়। তিনিই আমাদের মায়াজালে বদ্ধ করেছেন, তিনিই আবার

বন্ধন খুলে দিয়ে আমাদের মুক্ত করে দেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চের সর্বময়ী অধীশ্বরী তিনি, তাঁরই ইচ্ছার অঙ্গুলি-নির্দেশে বিশ্বের চেতন-অচেতন সবকিছু চালিত হচ্ছে। এমন কি নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের পর্যন্ত মায়ার এলাকায় আবার ফিরে আসতে হয় তাঁর ইচ্ছামাত্রে। চেতনায় জগৎবোধের লেশমাত্রও যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আধিপত্যের বাইরে কেউ যেতে পাবে না।

বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে ওতপ্রোতভাবে প্রত্যক্ষ করার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মায়ার দুটি বিভিন্ন রূপ আছে; এর একটিকে তিনি অবিদ্যামায়া বলতেন, অপরটিকে বলতেন বিদ্যামায়া। বিশ্বের স্থূলরূপ ফুটিয়ে তোলে প্রথমটি; তার প্রভাবে মানুষ ইন্দ্রিয়-জগতে আসক্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর আবর্তনে ঘুরতে থাকে। অজ্ঞানের এই দিকটির সঙ্গে লড়াই করার কথাই অদ্বৈতবাদী সাধকদের বলা হয়; সে লড়াই-এর প্রয়োজনও আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে, অবিদ্যামায়া জয় করে পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্বানুভূতি লাভান্তে বাহ্যজগতে ফিরে আসার পর মায়াকে দেখতে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মূর্তিতে। শুধু দৃষ্টিকোণ সামান্য একটু ঘুরিয়ে নিলেই মুক্তপুরুষগণ নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, মায়াকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করার প্রয়োজন আর নেই। জাগতিক বস্তুর বাইরের আকার অবশ্য তাঁরা আগের মতোই দেখতে পান, কিন্তু তাঁদের কাছে তার অর্থ ও মূল্য যে আগের মতো আর থাকে না, একথা নিশ্চিত। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার ক্ষেত্র বলে আর মনে হয় না জগৎকে, তাঁদের দৃষ্টি রোধ করার মতো কিছুই আর থাকে না সেখানে। নির্বিকল্প সমাধিতে তাঁরা যে সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এখানেও দেখতে পাবেন সেই একই সত্তাকে। ছাদে উঠে নেমে আসার পর দেখবার ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই তাঁরা দেখতে পাবেন যে, ওঠার সময় সিঁড়ির যে ধাপগুলিকে পিছনে ছেড়ে আসতে হয়েছিল সেগুলিও যা দিয়ে তৈরী, ছাদও তৈরী সেই একই

উপাদানে। জ্ঞানাতীত সত্তাই প্রাতিভাসিক জগতের রূপ ধারণ করেছে। যে মায়াশক্তির প্রভাবে জগতের এই রূপটি দেখতে পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ার সেই দিকটিকেই বিদ্যামায়া বলেছেন। জগন্মাতার লীলার আর একটি দিক এটি—তাঁর অপূর্ব লীলার মুক্তি-বিতরণের দিক; লীলায় অন্যান্য সব বদ্ধ মানবের বাঁধন খুলে মুক্ত করে দেবার সজ্ঞান যন্ত্রস্বরূপ করে তিনি মুক্তপুরুষদের এ জগতে রেখে দেন।

জগন্মাতার আদেশে আপেক্ষিক চেতনার দ্বারদেশে (ভাবমুখে) দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে সত্তা ও তার প্রাতিভাসিকতা দুই-ই দেখতে পাচ্ছিলেন একসঙ্গে। তাঁর চেতনা যেন একই ব্রহ্মের শুদ্ধ ও আপেক্ষিক অস্তিত্বের, জ্ঞানাতীত ও প্রাতিভাসিক ভূমির প্রত্যন্তপ্রদেশ ঘিরে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল, এবং মৃদুভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল এদুটি ভূমির মিলন-রেখার উভয় দিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো জগন্মাতা কালী ও তাঁর লীলাব প্রতি ভক্তিভাবাবেশে আপ্লুত হচ্ছিলেন তিনি, কখনো বা একেবারে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ণ একত্বের প্রশান্ত সাগরে। এর ফলে ব্রহ্মের নিত্য ও লীলা এই উভয় ভাবের ওপরেই সমানভাবে জোর দিতে দেখা যেত তাঁকে।

উপনিষদে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, সন্দেহ নেই। স্পষ্টই বোঝা যায়, কালক্রমে এ-দুটি ভাব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে আধ্যাত্মিকতালিপ্সুদের জ্ঞানী ও ভক্ত এই দুই পৃথক শ্রেণীর জন্য দুটি পৃথক আদর্শ গড়ে তুলেছিল; সেজন্য ভগবদ্গীতায় এদের সামঞ্জস্যবিধান করতে হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে এ-দুটি ভাব বাহ্য দৃষ্টিতে আবার পৃথক হয়ে যায়। জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত স্বরূপের দিকটিকেই একমাত্র সত্য মনে করতেন বলে মনের প্রায় সবটাই নিবিষ্ট রাখতেন সেদিকে। অপর দিকটিকে অলীক, স্বপ্নমাত্র জেনে সেদিকে অপাঙ্গে একটু চাইতেন মাত্র; ভক্তের বিশ্বাসরূপ ছেলেখেলার সহায়ক হবে ভেবে এবং সে ছেলেখেলার খানিকটা প্রয়োজনও আছে জেনে কৃপা করে যেন তার আপেক্ষিক মূল্য স্বীকার করতেন।

এদিকে ভক্তেরা আবার ঈশ্বরের সর্বভূতস্থ হয়ে প্রকাশিত হওয়ার দিকটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন; লীলাময়ের বলে বলীয়ান হয়ে ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত স্বরূপের দিকে ফিরেও চাইতেন না। ভাবতেন, তাঁর জ্ঞানাতীত নির্গুণ স্বরূপের দিকে তাকালে ঈশ্বরের যে সর্বভূতান্তরাত্মা সাকার ভাব অবলম্বন করে চিরদিন তাঁরা আনন্দ করতে চান, সে ভগবৎপ্রেম বোধ হয় একেবারে শুকিয়ে যাবে। তাঁরা চিনি খেতে ভালবাসেন, চিনি হতে চান না। ঈশ্বরের পরমানন্দময় সঙ্গই তাঁদের কাম্য, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে রাজী নন তাঁরা। দ্বৈতবাদী ভক্তদের তো কথাই নেই, ভক্তদের মধ্যে যাঁরা একত্বে বিশ্বাসী, ভগবানের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্ব যাঁরা স্বাকার করেন, তাঁরাও সেখানে একটা সীমা পর্যন্ত দ্বৈতবাদের রং ধরিয়ে রেখে নিজেদের অদ্বৈত-দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষ গুণান্বিত বলে রঞ্জিত করে রাখাটা পছন্দ করতেন। এভাবে জ্ঞানী বা পূর্ণ-অদ্বৈতবাদিগণ এবং দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী উভয়বিধ ভক্তগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলেছিলেন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের পথের ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলেছিল।

এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করতেন, জ্ঞানযোগী তোতাপুরী তাঁর ভাবে আঘাত দিয়ে বিদ্রূপ করে বলতেন, “আরে, কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো?” এই জন্যই আবার ভক্তি-পথযাত্রী ভৈরবী ব্রাহ্মণী শুক্‌নো জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নির্দেশাধীনে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতসাধনাকে সুচক্ষে দেখতে পারতেন না। কিন্তু এই উভয়বিধ মতের আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ এ-দুটি মতেরই শক্তি ও সীমা যে কতদূর, দৈবানুকম্পায় স্পষ্টভাবে তা জানতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের পশ্চাতে যে-সত্য নিহিত রয়েছে তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এই যুগান্তকারী আবিষ্কারসহায়ে দু-দিকেই ভারসাম্য বজায় রেখে উভয়ের মাঝখানে সংযোগ-সেতুর মতো দাঁড়িয়ে মধ্যবর্তী

ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। ভালবাসা, ভক্তি ও চরম নম্রতা অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর বিদ্রূপ গায়ে না মেখে সময় বুঝে তাঁকে তাঁর আংশিক ও একদেশদর্শী দৃষ্টির দোষগুলি দেখিয়ে দিতেন। ধীরে ধীরে এই কঠোর সন্ন্যাসীর অনমনীয় মনকে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু নোয়াতে পারলেন এবং তাঁকে অনুভব করাতে সক্ষম হলেন যে, নিরাকার সচ্চিদানন্দসাগরই ভক্তিহিমে জ'মে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন মূর্তিতে সাকার ঈশ্বররূপে প্রতীত হন, এবং সেই সাকার ঈশ্বরই আবার যেন প্রদীপ্ত জ্ঞানাগ্নির তাপে গলে নির্গুণ নিরাকার হয়ে যান। নিজ শিষ্যের অনুভূতির অন্তরালে যে বিস্ময়কর সত্য নিহিত ছিল, তা একটু ধারণা করার দিকে ও তদনুসারে নিজমত পরিবর্তন করার দিকে তোতাপুরী ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চললেন। দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগের পূর্বে জগন্মাতার অস্তিত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণত হয়েছিলেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর তান্ত্রিক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীব সম্পর্কও কম জটিল ছিল না। তিনি ভৈরবীর শিষ্য ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহচর্যে এসে ভৈরবীকে অনেককিছু শিখতে হয়েছিল। পরিচয়ের পর হতে ভৈরবীকে তিনি মায়ের মতো দেখতেন ; পরিবারে আত্মীয়দেরই একজনের মতো ছয় বৎসর কাল ভৈরবী তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অসুস্থতার জন্য স্থানপরিবর্তনের প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে পল্লীগ্রামে তাঁর জন্মস্থানে (কামারপুকুরে) যান, সে সময় ভৈরবীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সাতমাসকাল সেখানে ছিলেন ; শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত আনন্দময় পরিবেশ খুবই ভাল লেগেছিল তাঁর। বহুলোক এ সময় আসত তাঁর কাছে ; তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত কথা শুনে তাঁদের মনের আঁধার কেটে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী, চতুর্দশ বৎসরের বালিকা সারদামণিও তাঁর কাছে থাকার জন্য সে সময় এসেছিলেন সেখানে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিজ শুদ্ধ দিব্য প্রেমের অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি

দিলেন ; সারদামণির হৃদয় এতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সারদামণির মনে হীন বাসনার কোন স্থান ছিল না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসতেন, ভক্তি করতেন, মনপ্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতেন এবং প্রতিদানে স্বামীর কামগন্ধ-হীন ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার এবং তাঁকে আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়ে তোলার ভাব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

তবু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সংস্রব এবং তাঁর প্রতি প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন ভৈরবীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ভৈরবী আধ্যাত্মিক পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তখনও চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন নি। তাঁর মন নিঃশেষে সর্বমালিন্য-বর্জিত হয় নি তখনো। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জ্ঞানপথ ধরে চলার নির্দেশলাভের জন্য তোতাপুরীর শিষ্যত্ব বরণ করেন, তখন ভৈরবীর মনে ভীষণ আলোড়ন উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ প্রায় বশীকরণের যাদুতে রূপায়িত হয়েছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের মতো যোগ্য শিষ্যের অধিকার-গর্বে তিনি স্ফীত হয়ে উঠেছিলেন। অহংকার তাঁকে কিছুকালের জন্য সত্যই তমসাবৃত করে রেখেছিল, এবং সকলের প্রতি তাঁর আচরণ চলেছিল তাঁর আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গীকৃত জীবনের প্রতিকূল পথ ধরেই।

কিন্তু সু-পুত্রের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ এসব সহ্য করে যেতেন, ভৈরবীর প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণে ঈষন্মাত্র বৈষম্য প্রকাশ করতেন না কখনো। নিজের বালিকাবধূ সারদাকেও তিনি বলে দিয়েছিলেন ভৈরবীকে নিজ শ্বশ্রূর মতো সম্মান করে চলতে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধৈর্যমণ্ডিত, সস্নেহ ও জ্ঞানালোকবর্ষী সাহচর্যে ভৈরবী শীঘ্রই নিজের দোষ ধরতে পারলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় গভীরভাবে ডুবে যাবার জন্য হঠাৎ একদিন সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন

এবং তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বলে সম্বর্ধনা করে তাঁকে মালাচন্দনে ভূষিত করেন। ছয় বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য লাভ করে ভৈরবী এভাবে তাঁর মহান্ ধর্মপথযাত্রায় লক্ষ্যলাভের জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন. এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয়ে যান অনেকখানি। উত্তরকালে তীর্থভ্রমণের পথে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাশীতে আর একবার তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

আত্মীয়সঙ্গে

গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়গণের সঙ্গে দীর্ঘ সাতমাসকাল বাস করে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসের চিরাচরিত জীবনধারার ব্যতিক্রম করেছিলেন নিশ্চয়ই। সন্ন্যাস মানে যা আত্মীয়-অনাত্মীয়ে কোন পার্থক্য রাখে না, যা সর্ববিধ জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়, এবং নিজ আত্মীয়দের প্রতি সর্ববিধ বাধ্য-বাধকতা থেকে চিরমুক্তি দান করে। জীবনে আত্মার পূর্ণ মুক্তিই সন্ন্যাসের তাৎপর্য—যে-জীবনে অতি নিকট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পূর্বসম্পর্কের স্মৃতি পর্যন্ত বন্ধন হয়ে থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তো সত্যদ্রষ্টা, পরমহংস ছিলেন, সন্ন্যাসজীবনের সম্পূর্ণতা তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্ববন্ধনমুক্ত পুরুষ, তাঁকে বেঁধে রাখবার মতো সামর্থ্য বোধ হয় কোন কিছুরই ছিল না।

তবু একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, সন্ন্যাসজীবনের প্রচলিত ধারা লঙ্ঘন করে নিজের জন্য নতুন একটা পথ তিনি তৈরী করে নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে যে পারিবারিক বন্ধন একদা স্বহস্তে ছিন্ন করে আসতে হয়, মুক্ত সন্ন্যাসীদের ভেতর কেউ সে বন্ধন পুনরায় বরণ করে নিয়েছেন, একথা শোনা যায় নি কখনো। যেমন, কঠোরব্রতী তোতাপুরী ঘরে ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে আবার মেলামেশা করেছেন, একথা কল্পনা করা যায় কি? কখনই তা ভাবতে পারা যায় না। তবু বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুতাপে

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কাজই করেছিলেন। কোন সংস্কারকের মনোভাব নিয়ে এ ব্যতিক্রম তিনি করেন নি, সংস্কারের কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কারণ দেখা যায় নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাউকেই তিনি এ পথ অনুসরণ করতে বলেন নি। এ তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত জীবনধারা, যা সম্পূর্ণ সরল সহজ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের জন্যই বা এ নতুন ধারার প্রবর্তন তিনি করলেন কেন?

অবশ্য বলা যায়, গোঁড়া সন্ন্যাসীদের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে করুণার ভাব অনেক বেশী ছিল বলেই নিজের ওপর আত্মীয়গণের দাবি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। অতি কোমলহৃদয় ও প্রেমিক ছিলেন তিনি। তোতাপুরীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর জননী দক্ষিণেশ্বরেই বাস করতেন। ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দেখলে মায়ের প্রাণে আঘাত লাগতে পারে ভেবে পুরীজীর কাছে তিনি গোপনে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ত্যাগের জীবন বরণ করার প্রাক্কালেও মায়ের সুখ-দুঃখের চিন্তা তাঁর এতখানি মন জুড়ে ছিল। তবু অনুকম্পার দোহাই দিয়ে তাঁর আচরণের ব্যাখ্যা এতদূর পর্যন্ত করা যায় বলে মনে হয় না। আত্মীয়তার বিশেষ বন্ধন এবং স্বল্প কয়েকজন পরিজনের প্রতি বাধ্যবাধকতা স্বীকার না করেও তো তিনি জগৎ জুড়ে অবাধে করুণা-বিতরণ করতে পারতেন! এরূপ ভাবা কিছু অসঙ্গত নয়। আর অল্প কয়েকজন আত্মীয়ের কথা ধরলে বলা যায়, স্বামী বা সন্তানের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ না করেও তো তিনি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে তাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে পারতেন! শ্রীচৈতন্য বা ভগবান বুদ্ধ যেমন করেছিলেন। তাঁদের করুণা সম্বন্ধে তো আর সন্দেহ করার কোন কারণ নেই! জ্ঞানলাভের পর তাঁরা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সপ্রেম, সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু কেউ গৃহস্থের ভূমিকায় অভিনয় করতে চান নি। সন্ন্যাসের নির্দিষ্ট সীমা শ্রীরামকৃষ্ণ কেন যে অতিক্রম করলেন, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়স্থ

করুণাকেই এর কারণ বলে স্থির করলে বাস্তবিকই তা যথেষ্ট হবে না। এর কারণ খুঁজতে গেলে যেতে হবে আরো গভীর প্রদেশে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখে এসেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন; মূল অজ্ঞান বা মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, তোতাপুরীর মতো মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও এ দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান বিরাট। নিত্য ও লীলা—উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে সমভাবে প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁর এই ভাবমুখে (ভাব ও ভাবাতীত ভূমির সঙ্গমস্থলে) অবস্থানই সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রমদ্বয়ের আপাতবিরোধী জীবন-পরিকল্পনাকে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্যের ভাবে গেঁথে দিতে সহায়তা করেছিল; এই অনবদ্য, অনুপম, অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য উভয় জীবনধারার আদর্শকে সমান স্বচ্ছতায় ও সমান পরিপূর্ণতায় প্রকট করে তুলেছিল। এ বিষয়ে আলোকসম্পাত করার মতো একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিজ জননীর মৃত্যুর পর খাঁটি গৃহস্থের মতো একদিন তিনি জল নিয়ে তর্পণ করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও কিছুতেই তা করে উঠতে পারলেন না। তর্পণের জন্য বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জল তুলে নেবামাত্র তাঁর হাতের আঙ্গুল আপনা আপনি ফাঁক হয়ে গিয়ে সব জল হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি যে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীকে মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে নেই! সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ মিশে একীভূত হয়ে গেলে কি রূপ নেয়, তার একটা নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে এ ঘটনায়।

জগৎকে তার সমগ্র বৈচিত্র্যসহ তিনি গ্রহণ করেছিলেন; কারণ সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে তিনি জগন্মাতার খেলা দেখতে পেতেন, দেখে আনন্দে বিভোর হতেন। জগন্মাতাই তো তাঁর আত্মীয় সেজে নিজেরই নাটকের অভিনয়ে নিজে নেমেছেন! এসব তিনি সাক্ষাৎ দেখতেন; আর নাটকের বিভিন্ন অভিনেতাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে, আপন আপন

ভূমিকায় তাঁদের স্বচ্ছন্দে অভিনয় করার সুযোগ দিয়ে, এই দিব্য লীলার রস বজায় রাখতে সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট হতেন। মাতা, পত্নী, ভাইপো, ভাইঝি প্রভৃতি বিভিন্ন মুখোসগুলির অন্তরালে মা-কালীকেই দেখতে পেতেন তিনি। কাজেই তাঁর সঙ্গে যাদের যা সম্পর্ক ছিল, সেটা মেনে চলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। একজন আদর্শ সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের সাজে সেজে রঙ্গমঞ্চে নেমে তিনি নিপুণ অভিনেতার মতোই নিজ ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন। আত্মীয়গণ তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা, মনোযোগ ও আন্তরিক সেবা যতটা আশা করা যেতে পারে ততটাই পেয়েছিলেন। তবে একথাও সত্য যে, গৃহস্থের ভূমিকায় অভিনয় করার সময়ও এমন কিছু তিনি করতে পারতেন না, অভিনেতার পোশাকের ভিতরকার সন্ন্যাসীটির মর্মে যা আঘাত করতে পারে। তর্পণ করার ব্যাপারে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। নিজ পত্নীর প্রতি আচরণেও আমরা তা দেখার সুযোগ পাব আবার। তাছাড়া, তিনি যে মুদ্রা স্পর্শ করতে পারতেন না, অর্থসঞ্চয়ের চিন্তাতেও তাঁর প্রকৃতি যে প্রতিবাদ করে উঠত, তাঁর সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য জনৈক মাড়োয়ারী ভক্ত তাঁকে দশহাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি যে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাঁর মুখ থেকে যে পরিহাস-ছলেও মিথ্যা কথা বের হত না, ধূর্ত বিষয়ী লোকের সংস্পর্শ যে তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হত, রমণীমাত্রেরই মধ্যে, এমন কি পতিতা রমণীর মধ্যেও তিনি যে মা-কালীকে দেখতে পেতেন, কখনো তার ব্যতিক্রম হত না, এবং ইন্দ্রিয়জগতের স্থূল বিষয় দূর হতেও তিনি যে স্পর্শ করতে পারতেন না—এ সব ঘটনা থেকেই অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, গৃহস্থের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে তাঁর যে হৃদয়টি ছিল, তা স্থায়িভাবে বাঁধা ছিল সন্ন্যাসধর্মাদর্শের সুরের খুব উঁচু পর্দায়। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হয়ে উঠেছিল সামঞ্জস্যের অতুলনীয় সৃষ্টি—গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এ-দুটি বিপরীতমুখী জীবনযাত্রাপ্রণালীর অনন্যসাধারণ আদর্শের সমন্বয়-সৌধ, যার

দুটি অংশের প্রত্যেকটিই ছিল তার নিজস্ব ভাবের নিখুঁত আদর্শস্থল। এই অপূর্ব জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই নিজ নিজ জীবন গঠনপূর্বক পূর্ণতা লাভ করতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রাদেবী প্রথম দুই পুত্রের এবং এক পুত্রবধূর মৃত্যুতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন; তোতাপুরীর আগমনের কিছু পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে এসে কালীবাড়ির পবিত্র পরিবেশে তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে তিনি জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাচ্ছিলেন। মথুরবাবু সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, নহবতের ঘরে তাঁর স্থায়িভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রার যৎসামান্য প্রয়োজন মথুরবাবুই মিটিয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখতেন, বিমল ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর মনের জ্বালা জুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে চন্দ্রাদেবী তৃপ্ত হয়েছিলেন; কর্তব্যপরায়ণ পুত্রের কাছ থেকে যা কিছু আশা করা যায়, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিজ দেহত্যাগের পূর্বদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে তা সবই তিনি পেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় (খুড়তুতো ভগ্নীর পুত্র) হৃদয় বহুকাল তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। হৃদয় মামার সেবা করতেন, মামার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতেন, মাঝে মাঝে মন্দিরের কাজেও তাঁকে সহায়তা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভালবাসায় ডুবিয়ে রাখতেন, তাঁর মঙ্গলের জন্য খুব উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করতেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রামলালও এসে দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে লাগলেন। যুবক রামলালও খুল্লতাতের কোমল ও সস্নেহ যত্নলাভে বঞ্চিত হলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মাতুল বা খুল্লতাত ভেবেই তাঁর সঙ্গে তদনুরূপ আচরণ করতে হৃদয় ও রামলালকে অনুমতি দিলেন। তাঁর মন কত উর্ধ্বে উঠে থাকত, তবু আত্মীয়দের প্রতি তাঁর মনোভাবে কখনো কোন অস্বাভাবিকতা দেখা

যেত না। ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে তিনি করুণভাবে বিলাপ করেছেন—এ দৃশ্যও দেখা গেছে। গৃহস্থের মতো আচরণ করার ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সময়ও তাঁর অভ্যন্তরস্থ সন্ন্যাসীটি গৃহস্থের পোশাকের আড়ালে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখত।

নিজ লীলাসঙ্গিনীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ কিন্তু আর সব কিছুকেই হার মানিয়ে দিয়েছে। এ আচরণ অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব এবং স্পষ্টতই মানবের ধারণার অতীত। একজন পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় আদর্শ সন্ন্যাসীকে স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করতে কে আর কবে দেখেছে? এই সমন্বয়সাধন দুটি বিপরীত মেরুপ্রান্তকে একত্র করার মতই অদ্ভুত! এই অতিমানব-দম্পতীর নিষ্কলঙ্ক অন্তরে বয়ে চলত কামগন্ধহীন প্রেমের ধারা। সমস্ত দিক দিয়েই দেখা যায়, বিমল পবিত্র এ দুটি আত্মার মিলন অনন্যসাধারণ; দেহাতীত প্রেমের যে কল্পনা আমরা করে থাকি, তাই যেন রক্তমাংসের শরীরে রূপ পরিগ্রহ করেছে এখানে। এ দুটি পবিত্র হৃদয়ের কোনটিতেই বিন্দুমাত্র লালসারও কোন স্থান ছিল না।

আধুনিক যৌন-মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কার দেখে অনেকের ধারণা জন্মে যে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালন মানবপ্রকৃতির প্রয়োজনহীন, এমন কি ক্ষতিকর উৎপথগামিত্ব মাত্র। জোর করে যৌনপ্রবৃত্তির দমনকে কয়েকটি মানসিক ব্যাধির কারণ বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে জোর করে মনের মধ্যে চেপে রেখে দেওয়া, আর উচ্চতর মনোবৃত্তি সহায়ে মন থেকে তাকে মুছে ফেলা, এ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেকথা যেন আমরা না ভুলি। মন থেকে কামেচ্ছা চলে গেলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া তো দূরের কথা, শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তি তার ফলে প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, দ্বাদশ বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারলে মানুষ অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী হয়। আশা করা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি কামপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উন্নীত সম্পূর্ণ সুস্থ লোকদের

নিয়ে পরীক্ষা করে এ সত্যটি আবিষ্কার করে ফেলবে এবং তার ফলে এই জাতীয় লোকের মন থেকে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে অসম্বদ্ধ ধারণা দূরীভূত হবে।

আরো একদল লোক আছেন যাঁরা অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা যৎসামান্য। তাঁদের ধারণা ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভের জন্য অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরানুভূতির মধ্যেও বহু স্তর রয়েছে; সব অনুভূতির মূল্য ও তাৎপর্য এক নয়, সত্যের একই পর্যায়ে পড়ে না সবগুলি: কাজেই বেশ বোঝা যায়, বিভিন্ন অনুভূতি লাভের জন্য একই প্রকার মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযমে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পারলে সর্বোচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ অসম্ভব। ফরাসী পণ্ডিতপ্রবর রোঁমা রোঁলা বলেছেন, "যৌন-প্রবৃত্তি-সঞ্জাত দৈহিক ও মানসিক অপচয় রোধ করতে পারলে তা একাগ্র চিত্তের, সঞ্চিত প্রজনন-শক্তির কী যে প্রচণ্ড তেজের উন্মেষ ঘটায়, সেকথা সমস্ত অতীন্দ্রিয়-বাদীরা, অধিকাংশ মহান্ আদর্শবাদীরা এবং আত্মশক্তির উদ্বোধকদের মধ্যে মহামানবেরা সহজাত প্রবৃত্তিবশেই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।" পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, ভগবানলাভ করতে হলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

যাই হোক, নিজ পত্নীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ ছিল কামগন্ধহীন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করতে করতে সারদামণি জানতে চেয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কি ধারণা? তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" ভাবতেও বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়, কত সহজভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ পত্নীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখতেন, অথচ গভীর নিশীথে তাঁকে নিজের পদসেবা করার অনুমতি দিয়ে কত নিখুঁতভাবে স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে

চলতেন একই সঙ্গে। বোধ হয় জগন্মাতা হতে নিজেকে ঈষণ্মাত্রও পৃথক ভাবতেন না তিনি; তা না হলে পত্নী সেজে এলেও তাঁকে পাদস্পর্শ করতে দেওয়া কখনো সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এবং তাঁর নিজেরর মধ্যে বাস্তবিকই তিনি জগন্মাতার এক অখণ্ড প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন।

তিনি যে স্বীয় পত্নীর আবরণের ভেতর মা-কালীকে দেখতে পেতেন, একবার তার অতি গভীর স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মে মাসের অমানিশায় তিনি সারদাদেবীকে যথাবিধি নিজের সামনে বসিয়ে তন্ত্রনিবদ্ধ ষোড়শীপূজার সমস্ত বিস্তারিত পদ্ধতির অনুষ্ঠানসহ পূজা করেছিলেন। পূজার সময় সারদাদেবী প্রথম থেকেই অতীন্দ্রিয় ভাবে আবিষ্ট ছিলেন; পূজা শেষ হতেই শ্রীরামকৃষ্ণও দিব্যভাবে সমাহিত হয়ে যান। এই দেবদম্পতী এভাবে কিছুকালের জন্য অতীন্দ্রিয় ভূমিতে চলে গিয়েছিলেন, এবং বোধ হয় উভয়ের দিব্য মিলন ঘটেছিল পূর্ণ একত্বরূপ জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে একীভূত হয়ে।

তবু, সারদাদেবীকে জগন্মাতারূপে দেখা এবং সেভাবে সত্যই তাঁকে পূজা করা সত্ত্বেও, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিজের পত্নীরূপেও দেখতেন। শিষ্যদের কাছে, বিশেষ করে প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের কাছে কখনো কখনো রহস্যচ্ছলে তিনি বলেছেন, "আমার আবার বিয়ে হল কিজন্যে বল দেখি? একবার ভাব তো, স্ত্রী না থাকলে আমার চলত কি করে; এ দুর্বল শরীরটার দিকে নজর রাখত কে? আমার পেটে কি সয় না সয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এত যত্ন করে রান্না করে দিত কে?" যাই হোক, পত্নীর প্রতি খুব স্নেহপরায়ণ ছিলেন তিনি, এবং নারীত্বের আদর্শে তাঁকে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতেন। সারদামণি যখনই এসে তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতা নিয়ে আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক সর্ববিষয়ে তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন। পত্নীর কাছ হতে তিনি পেতেন অপরিসীম পবিত্র ভালবাসা, একান্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সেবা।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কামারপুকুরবাসের পর এই দেবদম্পতী দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসা ও ভক্তির অপূর্ব বন্ধনে বেঁধে একত্রে বাস করেছিলেন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হতে শুরু করে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে "শ্রীশ্রীমা" নামে পরিচিতা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে যে স্বল্প কয়েকরাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একই ঘরে রাত্রিযাপন করার অনুমতি পেয়েছিলেন, সে-সময়কার নিজ মনের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব-আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! পরে কখন তাঁর সমাধি হয় ভেবে আমি সারারাত জেগে থাকি টের পেয়ে তিনি নহবতের ঘরে আমার বিছানা পাঠিয়ে দেন।"

সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণকে মা-কালীরূপে দেখতেন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ ভাবটি বজায় রেখেছিলেন; শুনতে যতই অদ্ভুত বলে মনে হোক, এ ঘটনা সত্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় অনাথা বালিকার মতো তিনি কেঁদে উঠেছিলেন, "মা-কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো?" তবে অভিনয়-কালে তিনি স্ত্রীর ভূমিকা পুরোপুরি বজায় রেখে চলতেন। স্বামীর দেহত্যাগে বিধবা হয়েছেন ভেবে তিনি বিধবার বেশ ধারণ করতে আরম্ভ করেছিলেন; পরে নিজ সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য উপস্থিতি অনুভব করার ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা আর করা হয়ে ওঠে নি।

এসব ঘটনায় বুদ্ধি আরো গুলিয়ে যায়, আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি আমরা। জগন্মাতা, প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয় শিষ্যের সর্বত্রসমভাবাপন্ন

সমন্বয়ে কি বস্তু যে হয়, তা কল্পনায় আনা দুরূহ। আবার জগন্মাতা, প্রেমাস্পদ স্বামী ও গুরুর একত্র সমাবেশ কেমন দেখায়, তা-ও ধারণা করা যায় কি? এসব নিশ্চয়ই মানুষের ধারণাতীত; ভাষা এসব প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অপারগ। এসবের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষ নিজ নিজ রুচি অনুসারে 'অসাধারণ', 'অতিমানবিক', 'অস্বাভাবিক' এমন কি 'ঈশ্বরীয়' পর্যন্ত বিশেষণগুলি ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু তাতেও বোধ হয়, যে বহুবিধ ভাবের সমন্বয়সঞ্জাত রাগ এই দেবদম্পতীর দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুরঞ্জিত করে তুলেছিল, তার সম্বন্ধে কোন ধারণা সে কামলিপ্ত মানুষের মনে এনে দিতে পারবে না। একটা জিনিস অবশ্য খুবই পরিষ্কার; এই অভূতপূর্ব সমন্বয় যে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়ের জন্যই কামবিরহিত জীবনাদর্শের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে গেছে, এ কথাটা খুবই ভালভাবে বোঝা যায়। এই সমন্বয় গৃহস্থের সংযমের আদর্শকে উন্নত করে দিব্য পবিত্রতার পর্যায়ে তুলে ধরেছে, আর সন্ন্যাসীর দেহজয়ের আদর্শকে প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ করিয়ে কামগন্ধহীনতার অত্যুচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে। আর এ সমন্বয়বিধান করেছেন দম্পতীর উভয়েই, যাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর মানুষই ইন্দ্রিয়জয়ে সিদ্ধকাম হবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় আলোর সন্ধান পেতে পারে।

আর্ত জনগণ সঙ্গে

আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয়গণ তাঁর আন্তরিক নিঃস্বার্থ ভালবাসার ন্যায্য অংশ সকলেই পেয়েছিলেন; তার বেশী আর কিছু তাঁদের চাইবার ছিল না। তবু তাঁর ভালবাসা কেবল আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে ভালবাসা উদার আকাশের মতো সারা জগৎ ছেয়ে ফেলেছিল, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের, ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার করে নি।

তাঁর প্রেম অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়ত ; সে প্রবাহ হতে প্রেম-সলিল পান করার দ্বার তৃষ্ণার্ত সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে তিনি জগন্মাতার প্রকাশ দেখতে পেতেন, এবং জীব ও ঈশ্বর উভয়ের জন্যই তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার তীব্রতা ছিল সমান। কারো কষ্ট দেখলে তাঁর বুক ফেটে যেত। আসলে তিনি আর্ত জনগণের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলতেন, আর্তজনের আকুলতাকে তিনি নিজেরই আকুলতা বলে অনুভব করতেন এবং সেই আকুলতা নিয়েই তার দুঃখের প্রতিকার খুঁজতে সচেষ্ট হতেন। নিজের খাওয়ার প্রয়োজনবোধ যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ তাঁকে দেখতে হত মা-কালীর খাওয়া হল কি না, এবং চোখের সামনে ক্ষুধার্ত যারা রয়েছে, তারাও খেয়েছে কি না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বের হয়ে কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্যটন করেন ; প্রতি তীর্থেই সেখানকার প্রধান দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে তিনি তীর্থের মহিমার সত্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। এই তীর্থযাত্রার পথে তিনি দেওঘর বা বৈদ্যনাথধামে যান। দেওঘর ও তার চারিদিকে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ চলেছে। সেখানকার অধিবাসী সাঁওতালরা তখন দিনের পর দিন খেতে পাচ্ছিল না ; তাদের দেহ অস্থিচর্মসার, পরনে কাপড় ছিল না বললেই চলে ; অনাহারে বহুলোক মারাও যাচ্ছিল। এ দৃশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অসহ্য ! হতভাগ্য দুর্ভিক্ষ-কবলিতদের পাশে গিয়ে তিনি বসে পড়লেন, তাদেরই একজন সমব্যথীর মতো অজস্রধারায় তাদের সঙ্গে কাঁদতে লাগলেন এবং তাদের এ দুর্দশার কিছু প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাদেরই সঙ্গে অনশনে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হলেন। মথুরবাবু সঙ্কটে পড়লেন ; প্রচুর অর্থব্যয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করে তবে এ সঙ্কটের হাত থেকে তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনাও বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের

কোন সময় মথুরবাবু তাঁর একটি তালুকে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিলেন ; সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। বৈষয়িক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, মথুরবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বোকামি করেছিলেন, এ বোকামির জন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারতও দিতে হয়েছিল। প্রজাদের তখন দুঃসময় চলেছে। পর পর দু'বছর ফসল হয় নি, ফলে স্থানীয় লোকেদের প্রায় অনশনের অবস্থা এসে গিয়েছিল। চারিদিকের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্মাহত হলেন, এবং তক্ষুনি মথুর-বাবুকে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে এবং খাজনা আদায় না করে উল্টে তাদের অর্থসাহায্য করতে বললেন। মথুরবাবুকে তিনি বোঝালেন যে, আসলে মা-কালী-ই তাঁর সম্পত্তির মালিক, তিনি তাঁর দেওয়ান মাত্র ; কাজেই মায়ের প্রজাদের দুঃখ দূর করার জন্য মথুরের অর্থব্যয় করা উচিত ; মথুরবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামতোই চলতে হল। প্রজাদের প্রতি জমিদারের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, নিঃসন্দেহে তার একটা দৃষ্টান্ত তিনি তখন এভাবে স্থাপন করেছিলেন।

কখনো কখনো চোখের সামনে কোন হতভাগ্যকে শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর দেখলে তাঁর সমবেদনায় অতি-কাতর হৃদয়ে ও সমভাবে সংবেদনশীল শরীরে সে যাতনার স্পন্দন উঠত। একবার নৌকার ওপর একটি মাঝিকে একজন লোক প্রহার করছে দেখে সত্যিই তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন, "আমায় মেরে ফেললো, রক্ষা কর!" এবং আশ্চর্যের কথা, প্রহৃত মাঝির পিঠে যেমন কালশিরে পড়েছিল, দেখা গেল, তাঁর পিঠেও ঠিক তারই অনুরূপ দাগ পড়েছে—মাঝিকে যে মারছিল তার পাঁচটা আঙুলের মাপে। সর্বদা মহিমময় একত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতি বহির্জগতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার পরিমাপ করবে কে? বাস্তবিকই এই ঘটনায় সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্যটিই মনে পড়ে, 'স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন বহু জিনিস রয়েছে, দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও যার কল্পনা করতে পারে না।'

শোকার্তদের দেখামাত্র তাঁর হৃদয় গলে যেত, তিনি নিজেই যেন তাঁদের একজন হয়ে যেতেন। এভাবে দুঃখের অংশগ্রহণের ফলেই তাঁদের হৃদয়ের ভার অনেকখানি লাঘব হত। তারপর তিনি স্নিগ্ধবাক্যে তাঁদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে চলতেন ; সে বাক্যের শক্তিতে ব্যথিত চিত্তের ক্ষত যতক্ষণ না একেবারে নিরাময় হয়ে উঠত, ততক্ষণ তিনি থামতেন না।

সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার ফলে একটা নতুন দৃশ্যসম্ভারের দিকে তাঁর দৃষ্টি অবারিত হয়েছিল ; সেখানে তাঁর মা-কালীকে, তাঁর আত্মীয়গণকে, দুর্গত জনগণকে, এককথায় সকলকেই তিনি সত্যের একই ভূমিতে, তার বিকাশের একই পর্যায়ে দেখতে পেতেন। বিদ্যামায়ার এইসব বিভিন্ন বিকাশগুলির প্রতি, দেবতা-মানব ছোট-বড সবকিছুর প্রতি একই অসীম প্রেম ও ভক্তির ভাব তিনি হৃদয়ে পোষণ করতেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে জ্ঞানযোগীদের তফাৎ অনেকখানি, কারণ মায়াময় জগতের প্রতি জ্ঞানীদের বিন্দুমাত্র দরদ থাকে না ; মন থেকে জগৎকে মুছে ফেলতে তাঁরা উঠে-পড়ে লেগে যান। মায়ার স্বপ্নরাজ্যে শূন্যময় ছায়ার মতো যারা ঘুরে বেডাচ্ছে, সেইসব অবাস্তব জীবের দুঃখমোচনকল্পে মায়াকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে তাকে তাঁরা সমর্থন করবেন কিরূপে ? ব্যথিতের জন্য সহানুভূতি দেখাতে গেলেই ভ্রমজ দৃশ্যের সত্যতা স্বীকার করতে হবে, তাতে অদ্বৈত সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে নিশ্চিত ; কারণ সে সাধনার শিক্ষাই হচ্ছে, "পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, আর যা কিছু সবই মিথ্যা।" অদ্বৈতবাদিগণকে এ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে তুলতে হবে। এ পথের নব-দীক্ষিতেরা সেজন্য দুস্থ জনগণের দিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে রাখেন ; আর মুক্তপুরুষরা এদের অস্তিত্বই হেসে উড়িয়ে দেন, যেমন তাঁরা উড়িয়ে দেন সাকার ঈশ্বরকে, তাঁকে বালসুলভ সোনার স্বপ্ন মাত্র জ্ঞান করে। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে এ পথের মুক্তপুরুষ তোতাপুরীর হৃদয়ে জগন্মাতা সম্বন্ধে জ্ঞানের আলোকসম্পাত করে তাঁর চোখ খুলে

দিয়েছিলেন ; ঠিক এই ভাবেই দুর্দশাগ্রস্ত মানবজাতি সম্বন্ধে অভূতপূর্ব শিক্ষার জ্ঞানালোক বর্ষণ করে পরবর্তী কালে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধী যুবকশিষ্য নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, জীব ও শিব অভেদ ; বিশেষ নামের ও রূপের আবরণ জড়িয়ে প্রতিটি প্রাণীর ভেতর ঈশ্বর স্বয়ং অবস্থান করছেন। নরেন্দ্রনাথ (পরজীবনে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্বসমক্ষে আবির্ভূত হন) গুরুকৃপায় এভাবে ভগবানের আপেক্ষিক প্রকাশের মধ্যে নিহিত এই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

দুর্গত মানবের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আবার ভক্তদের আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গীকেও ছাড়িয়ে যায়। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী উভয়বিধ ভক্তেরাই জগৎ ও তদন্তর্গত সব কিছুকেই হয় ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, আর না হয় তৎকর্তৃক অভিক্ষিপ্ত বলে গ্রহণ করেন। কাজেই এরূপ জগতের দুঃখ দেখে তাঁদের মনে ব্যথা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য করুণাবর্ষণই হচ্ছে তাঁদের হৃদয়ের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। ভক্তিযোগের মহান্ প্রচারক শ্রীচৈতন্য সর্বজীবের প্রতি দয়ার ভাবকে প্রকৃত ভক্তের হৃদয়গঠনের জন্য প্রধান প্রয়োজনগুলির অন্যতম বলে প্রচার করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ মনোভাব নিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। একদা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন, "জীবে দয়া করার কথা বলে সবাই! জীবই শিব ; কাজেই তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের চিন্তার দুঃসাহসিকতা আসে কোথা থেকে? মনে কৃপা করার ভাব না রেখে জীবকে শিবজ্ঞানে ভক্তি করে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তার সেবায় অগ্রসর হতে হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে ঈশ্বরময় দেখতেন ; তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দয়ার ভাব সত্যিই খাপ খায় না। দুস্থ ব্যক্তির চেয়ে নিজেকে উঁচু আসনে বসিয়ে তাকে অনুগ্রহ করার জন্য হস্তপ্রসারণ করা দেবত্বের অবমাননার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দাতার অহমিকা ত্যাগ করে ভাগ্যহীন দুস্থের বেশধারী

ভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে, প্রয়োজন হলে হৃদয়ের রক্ত দিয়েও তাঁর পূজা করতে হবে।

এ যে সত্যের এক নব রূপের উন্মোচন! আধ্যাত্মিকতা-লিপ্সুদের চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং ঈশ্বরকে সর্বভূতস্বরূপে প্রত্যক্ষ করার স্তর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দেবার জন্য ভগবৎ-উপাসনার একেবারে নতুন একটি পথ আবিষ্কৃত হয়েছে এতে; আধ্যাত্মিকতার যে ধাপে উঠলে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন হয়, তার ঠিক পরের ধাপই হচ্ছে পরব্রহ্মরূপ ভাবাতীত ভূমি। অভূতপূর্ব এবং সম্ভাবনার প্রাচুর্যে ভরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী ধর্ম-বীণার জ্ঞান ও ভক্তি রূপ দুটি তারকেই এক মোচড়ে গতানুগতিক সুরের পর্দার চেয়ে অনেক উঁচু পর্দায় বেঁধে দিয়েছে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একথা যেদিন শোনেন, সেইদিনই নরেন্দ্রনাথ তাঁর এক গুরুভাইকে বলেছিলেন, "আজ যা শুনলাম, সে কথার তাৎপর্যের কোন তুলনাই হয় না। যদি দিন আসে, এই অদ্ভুত বাণীর গভীর রহস্য একদিন সারা জগৎকে শোনাব।" আর, এ প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য বেঁচে থেকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে দুর্গত মানবকে সেবা করা রূপ নতুন অধ্যাত্মসাধনার প্রবর্তন জগতে করে গেছেন, এবং এই সাধন-পদ্ধতির আধ্যাত্মিক মূল্য চোখের সামনে কার্যকর করে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশন।

খৃষ্টানদের দানধর্মের ও বৌদ্ধদের মানব-সেবাধর্মের ভাবের সঙ্গে এই ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে সেবার ভাবের মূলগত পার্থক্য অনেক। বস্তুগত দিক থেকে অবশ্য সবগুলিরই সাদৃশ্য রয়েছে। এ তিনটির মধ্যেই মানুষের দুঃখমোচনের জন্য সেবাকার্যের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়; এ-পর্যন্ত এগুলির ভেতর পার্থক্য আনার মতো কিছুই নজরে পড়ে না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সঙ্গে, দুস্থ মানবের সেবার মাধ্যমে ভগবদর্চনার সঙ্গে, অনেকেই বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের দয়াব্রতকে গুলিয়ে ফেলেন। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের এই দয়াব্রত আধ্যাত্মিকতালিপ্সুদের সম্যক্-আচরণের একটা দিক মাত্র,

নৈতিক শিক্ষার সহায়ক পদ্ধতির একটা অংশ মাত্র। বৌদ্ধধর্ম তো কোনও রূপ ঈশ্বরারাধনায় বিশ্বাসই করে না, আর খৃষ্টধর্মে বলা হয়েছে, "প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসো"। খৃষ্টধর্মে 'আত্মা' বলতে কখনো ঈশ্বরকে বোঝায় না, কারণ খৃষ্টধর্ম অদ্বৈতবাদীদের মতো জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের অভেদত্বে বিশ্বাসী নয়। কাজেই অপরকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখানোর জন্য খৃষ্টধর্মের এই নির্দেশ শুধু জোর দেয় অপরের দুঃখকষ্টকে নিজেরই দুঃখকষ্ট বলে ভাবার ওপর। যে দিক দিয়েই ধরা যাক না কেন, এই উভয় ধর্মের মতেই মানবসেবারূপ কার্য আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির একটি অংশ মাত্র; সেখানে শুধু নৈতিক মূল্যই দেওয়া হয়েছে একে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। নিজ শিষ্য বিবেকানন্দকে যন্ত্রস্বরূপ করে তিনি ঈশ্বরারাধনার নতুন নিয়ম ও পদ্ধতির প্রবর্তন করে গেছেন। ঈশ্বরেরই পূজা করা হচ্ছে—এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব নিয়ে দুস্থ মানবের সেবা করাটা আধ্যাত্মিক সাধনার একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি, এবং দেখা গেছে এ পদ্ধতি আর কোনকিছুর অপেক্ষা না রেখেই সাধককে ঈশ্বর-উপলব্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এটি যে একটি নতুন পন্থার প্রবর্তন, এবং জগতের ধর্মসাধনার ভাণ্ডারে একটি মহামূল্য নতুন সঞ্চয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর ভিত্তিভূমি। প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজার মতো মানবরূপ বিগ্রহ অবলম্বনে তাঁর সেবার মাধ্যমে মানুষ যে নিশ্চিতই ঈশ্বরলাভ করতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সাধনা হিসাবে একবার তাঁর একজন ভক্তকে তিনি এভাবে সাধন করতে বলেছিলেন, এবং স্বল্পকালের মধ্যেই এই অভূতপূর্ব সাধনা অপূর্ব ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানতে পেরে-ছিলেন। ভক্তটি স্ত্রীলোক, মণিলাল মল্লিক নামক শ্রীরামকৃষ্ণের অতীব শ্রদ্ধাবান একজন ব্রাহ্ম ভক্তের কন্যা। ধ্যানকালে বাজে চিন্তা এসে

স্ত্রীলোকটির মনের বিক্ষেপ ঘটাত। তাঁর অসুবিধার কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন, বললেন যে একটি ভাইপো তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেই ভাইপোটিকে আরো বেশী করে ভালবাসতে বললেন, যত গভীরভাবে পারা যায় ততটা ; তবে ছেলেটিকে নিজের ভাইপো না ভেবে গোপাল (বালক শ্রীকৃষ্ণ) বলে ভাবতে বললেন। স্ত্রীলোকটি সশ্রদ্ধ আন্তরিকতা নিয়ে এই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক উপদেশ মেনে চলতে লাগলেন ; অচিরে তাঁর মন খুব উঁচু আধ্যাত্মিক ভাবে সমাহিত হল, তিনি চোখের সামনে ভাইপোকে জ্যোতির্ময় বালকৃষ্ণ মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে যেতে প্রত্যক্ষ করলেন। ভাইপোর প্রতি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের ফলে তিনি বহু দিব্যদর্শনের অধিকারী হয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

ঘটনাটি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এতে দেখা যায়, দৃষ্টিকোণ সামান্য একটু পালটে নেবার ফলে কিভাবে মহিলাটির আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসাটুকু আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিতে রূপায়িত হয়ে তাঁকে ঈশ্বরানুভূতির রাজ্যে দ্রুত উন্নীত করেছিল। ক্লিষ্ট মানবের প্রতি পরহিতৈষীদের ভালবাসাও ঠিক এই ভাবেই শক্তিশালী আধ্যাত্মিক সাধনার রূপ নিতে পারে, একথা সহজেই বোঝা যায়। প্রিয়পাত্রকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে, এবং তাকে সেবা করার সময় 'ঈশ্বরের পূজা করছি'—এই ভাব বজায় রাখলে আত্মীয়ের প্রতি সাধারণ ভালবাসার বা পরকল্যাণচিকীর্ষুদের অপরের প্রতি ভালবাসার ভেতর একটা আধ্যাত্মিক মূল্য এসে যায়। শুধু মানবিকতার দিক থেকে মনে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার পুষ্টিসাধন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে এই জন্যই আত্মীয়ের প্রতি মানুষের সাধারণ ভালবাসা থেকে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'কে, ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষকে ভালবাসাকে আলাদা করে দেখতে হবে ; এমন কি পরহিতৈষীদের ভালবাসা থেকেও। কারণ সেসব ভালবাসায়

প্রায় সর্বক্ষেত্রে স্বার্থের একটু গন্ধ থেকেই যায়। তাৎপর্য ও মূল্যের দিক থেকে এই দ্বিবিধ সেবার ভেতর আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণও জনহিতকর কার্যের দুটি ভাগ করেছিলেন—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। তাঁর পরিচিত একজন ধনী ব্যক্তি, শ্রীশম্ভুচন্দ্র মল্লিক, একদিন তাঁকে বললেন যে, কয়েকটি দাতব্য কর্মানুষ্ঠানে বেশ কিছু টাকা তিনি খরচ করবেন বলে ভেবেছেন। তাঁর এই শুভ ইচ্ছায় উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁকে বিস্মিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু কড়া সুরেই বললেন, "প্রতিদানের কোনরূপ আশা মনে না রেখে এজাতীয় কাজ যদি করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা মহৎ কর্ম। কিন্তু এভাবে করা খুব কঠিন। যাই হোক, ক্ষণেকের জন্যও যেন ভুলো না, এসব কাজ মানুষের পূর্ণতালাভের উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। ভগবানকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসা ও তাঁকে লাভ করাই হল মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। আচ্ছা বলতো, ভগবান যদি এখন তোমায় দেখা দেন, তাহলে তাঁর কাছে কি চাইবে? কয়েকটা হাসপাতাল আর ডিস্পেন্সারী চাইবে, না সর্বক্ষণ তাঁর দর্শন আর কৃপালাভ যাতে হয়, তাই চাইবে? ভুলে যেওনা, ভগবানই সত্য, আর সব অনিত্য। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে লাভ করার জন্য সাধনায় ডুবে যাও। ভগবানকে ভুলে গিয়ে কতকগুলো দাতব্য কর্মানুষ্ঠানে জড়িয়ে যাওয়া তোমার মতো লোকের শোভা পায় না।" এ কথার বিকৃত অর্থ করে প্রমাণ করা চলে না যে জনহিতকর কার্যের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের কোন দরদ ছিল না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ব্যথা তাঁর প্রাণে যতখানি সাড়া জাগিয়েছিল, বিনা-চিকিৎসায় যারা অসুখে ভুগছে তাদের জন্যও নিশ্চয়ই তিনি ব্যথিত হতেন ততখানিই। হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি কখনই ছোট করে দেখতে পারেন না। দেওঘরের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবার জন্য এবং তালুকের প্রজাদের দুঃখমোচনের জন্য মথুরবাবুর কাছে তাঁর কাতর প্রার্থনা, এবং কোন গ্রামের পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য অপর একজন ভদ্রলোকের

কাছে তাঁর আবেদন হতেই বোঝা যায় দুস্থ মানবের জন্য তাঁর অন্তরের বেদনা কত গভীর ছিল! বোঝাই যাচ্ছে, শম্ভুবাবুর প্রতি তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরনের এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শম্ভুবাবুর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের মন্দীভূত স্পৃহাকে সতেজ করে তোলা। স্পষ্টই বোঝা যায়, শম্ভুবাবুর অন্তরে ভগবানলাভের চেয়ে দান করার আগ্রহই তীব্রতর হয়েছিল; এবং একথা নিশ্চিত যে, সাধারণ লোকে যে ভাব নিয়ে দান করে, শম্ভুবাবুর মনে এ বিষয়ে তার চেয়ে উঁচু ভাব ছিল না। কাজেই এ ধরনের সমাজসেবা নিয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবানলাভের দিকে তাঁকে দৃষ্টি ফেরাতে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব সঙ্গত কাজই করেছিলেন। শম্ভুবাবুর অন্তরে আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে দেখেই বোধ হয় জনহিতকর কাজ থেকে ধর্মসাধনার দিকে তাঁর মতি ফিরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়োজনবোধে তাঁকে নৈতিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। মণিলাল মল্লিকের কন্যাকে ভগবান লাভের জন্য মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার যে বিধান তিনি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে শম্ভুবাবুর ভাবানুরূপ জনহিতকর কার্যের পার্থক্য শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নির্ণয় করতেন, তার নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ঘটনাটিতে। দুস্থ মানবের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করার—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করার—যে বাণী তিনি রেখে গেছেন, জনহিতকর কাজের সাধারণ লোকপ্রিয় ভাবের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

আধুনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে

আধ্যাত্মিকতা-রসে বঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্মাহত হতেন, প্রকৃতিপ্রদত্ত একটা শাস্তি বলেই মনে করতেন তিনি এ অভাবকে।

আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভেতর অনেকেই গর্বান্ধ হয়ে যেভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে একটা ধাপ্পা ভেবে উপহাস ও ঘৃণা করতেন, তা দেখে তাঁর অন্তর বিপুল বেদনায় ভরে উঠত। এই সব নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী পণ্ডিতদের কারো সঙ্গে যখনই তাঁর সাক্ষাৎ হত, তখনই তিনি নিজের বিনয়নম্র অথচ সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য সহায়ে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের চটুল মনোভাবের পরিবর্তনসাধনের জন্য সর্বপ্রযত্নে প্রয়াসী হতেন। অবশ্য পণ্ডিতদের ভেতর ধর্মজীবনে কারো যথার্থ নিষ্ঠা এসেছে জানতে পারলে তাঁর জন্য সব সময়ই তিনি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন; তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, লক্ষ্য করতেন আধ্যাত্মিক পথে কতখানি তাঁরা এগিয়েছেন। আধুনিক প্রথায় শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও ধর্মাচরণে আন্তরিক উৎসাহ যথেষ্ট রয়েছে, এমন বহু ব্যক্তির সঙ্গে এভাবে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে দু-একজন ছিলেন অধ্যাত্মজীবনে বিশেষভাবে উন্নত। এসব ব্যক্তির সঙ্গ করে খুব খুশী হতেন তিনি এবং ধর্মবিষয়ে এঁদের দৃষ্টি আরো প্রসারিত করে দেবার জন্য ভগবানলাভরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে খুব উৎসাহ দিতেন। প্রাণপ্রদ ধর্মালোচনার মাধ্যমে সেবার ভাব নিয়ে বিনয়নম্রচিত্তে একাজে ব্রতী হতেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বিখ্যাত মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগগুলির মধ্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির অনতিদূরে একটি বাগান-বাড়িতে স্বনামধন্য ব্রাহ্মনেতা শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সাক্ষাৎকারই সব চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। এই

সাক্ষাৎকারের ফলে অতি সাধারণ পর্যায়ের বলে প্রতীত, নামেমাত্র শিক্ষিত দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রখ্যাত আচার্যের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন কখনো সমাজগৃহে, কখনো তাঁর বাড়িতে। কখনো বা কেশব দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তাঁর চিত্তাকর্ষক স্মৃতি-কথায় তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক সুস্পষ্ট বর্ণনা সহায়ে এ-দুজন মহৎ ব্যক্তির রোমাঞ্চকর মিলনগুলির মধ্যে একটির চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদর্শন-মানসে কেশবের গমনকালে তাঁর বিশেষ ইচ্ছায় আমিও একবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কালীবাড়িতে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটে নি। কেশব তাঁর জামাতা কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের একটি ছোট বজরা নিয়ে নদীপথে এসেছিলেন, আমি এবং আরো কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলাম সেখানে। ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বজরায় উঠলেন। বজরা উজান বেয়ে চলতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব খোলা ডকে পায়ের ওপর পা মুড়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসলেন। খুব কাছাকাছি বসেছিলেন তাঁরা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যতই উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতে লাগলেন, ততই তিনি কেশবের দিকে আরো এগিয়ে যেতে লাগলেন; শেষে তাঁর হাঁটু ও জানু কেশবের কোলের ওপর গিয়ে উঠল। পরমহংসদেব প্রায় আটঘণ্টাকাল বজরায় ছিলেন; এর ভেতর যে কয় মিনিট তিনি সমাধিস্থ হচ্ছিলেন, সেটুকু সময় ছাড়া আর কোন সময়ই তাঁর কথা বলা বন্ধ হয় নি। যেভাবে তিনি কথা বলছিলেন, সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আর কাউকে আমি সেভাবে কথা বলতে শুনি নি। কথোপকথন যাকে বলে, তা হচ্ছিল না মোটেই; এই আটঘণ্টার ভেতর তীক্ষ্ণধী বাগ্মী ও গুণী পণ্ডিত কেশবচন্দ্র বড় জোর গোটা দশ-বারো বাক্য বলেছিলেন। অনেকক্ষণ

পর পর শুধু একটা করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন তিনি অথবা তাঁর কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বলছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন ; নিম্নের উর্মিমুখরা গঙ্গার ধারার মতো তাঁর কথাও অবিরামধারে বয়ে চলেছিল। হৃদয়ের অন্তস্তল হতে নিঃসৃত সেই শান্ত কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না, অর্ধনিমীলিতনেত্র ক্রোড়স্থাপিত-বদ্ধাঞ্জলি সম্মুখবর্তী সেই শীর্ণকায় সন্ন্যাসীকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাঁর কম্পিত ওষ্ঠাধর হতে অতি সহজবোধ্য কথা নিঃসৃত হত, কিন্তু চিন্তার চেয়ে আরো উর্ধ্বে উঠতে, আরো গভীরতায় তলিয়ে যেতে পারত তা। প্রতিটি চিন্তাই ছিল নবালোকের বার্তাবহ, প্রতিটি গল্প, প্রতিটি বাক্যালঙ্কার, প্রতিটি উপমা ছিল অপরূপ। মানুষের মুখের গড়ন এবং সে গড়নের বিভিন্নতা কিরূপ বিভিন্ন চরিত্রের পরিচায়ক, তা বোঝাচ্ছিলেন তিনি; নিজের বিবিধ সাধনলব্ধ বহুবিধ অনুভূতির কথা বলছিলেন, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারজনিত নিত্যভাবাবেশের কথা বলছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলতে বলতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, তাঁর মুখ থেকে দিব্যানন্দের বিভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হতে লাগল।”

সর্ব ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ও সার্বজনীন ভাব, তাঁর মৌলিক সন্দেহবিনাশী বাণী, এবং সর্বোপরি তাঁর জ্বলন্ত আধ্যাত্মিক জীবন দেখে কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে কেশবচন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে চলতেন বিভিন্ন ধর্মসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক মহানন্দপ্রদ কথাগুলি। বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি তিনি যে শুধু সহিষ্ণুমনোভাবাপন্ন ছিলেন তা নয়, ঈশ্বর-লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে সমস্ত ধর্মমতকে সত্য সত্যই তিনি গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন : ভগবান এক ছাড়া দুই নন ; বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে সেই একই ভগবানের অর্চনা করছে পৃথিবীর সব ভক্ত সাধকরাই।

নিজ বিশ্বাসের ওপর অটলভাবে স্থিত হয়ে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ঘোষণা করতেন, "হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সব ধর্মমতেই আমি সাধনা করেছি, আবার হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতানুযায়ীও চলেছি ; ··· আমি দেখেছি সব মতই মানুষকে সেই একই ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে ; ···হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির সর্বত্রই দেখি ধর্মের নামে ঝগড়া-বিবাদ চলেছে—কখনও তারা ভাবে না যে যাঁকে কৃষ্ণ বলা হচ্ছে, তাঁরই নাম শিব, তাঁরই নাম শক্তি, তাঁকেই আবার যীশু ও আল্লা বলা হয় ; এক রাম, সহস্র নাম। একটা পুকুরে কয়েকটা ঘাট আছে। একটা ঘাটে হিন্দুরা কলসী ভরে জল নিচ্ছে, বলছে 'জল' ; আর একটা ঘাটে মুসলমানরা চামড়ার মশকে করে জল তুলছে, বলছে 'পানি' ; তৃতীয় ঘাটে খৃষ্টানরা জল নিয়ে বলছে 'ওয়াটার'। একথা কি ভাবা যায় যে জল 'জল' নয়, শুধু 'পানি' বা 'ওয়াটার' ? এটা একটা হাসির কথা নয় কি ? নানান নাম, কিন্তু বস্তু একই ; সেই একই বস্তুকে সবাই চাইছে ; ভেদ শুধু অবস্থা, রুচি ও নামের। যে যার নিজের মত ধরে চলুক। আন্তরিকভাবে ব্যাকুল হয়ে যদি কেউ ঈশ্বরকে জানতে চায়, তার কল্যাণ হোক, সে নিশ্চিতই ভগবান লাভ করবে।"

সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে নিজের ধারণাবিষয়ক শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ সহজ, স্পষ্ট, ওজস্বী ও মর্মস্পর্শী উক্তি সমীপাগত ব্রাহ্মভক্তদের ধর্মনিষ্ঠ, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করত, কল্পনায় তা বেশ বোঝা যায়। গুণবান ব্রাহ্ম আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন ; তিনি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে নিজ ধারণার নির্ভরযোগ্য নিদর্শনলিপি কিছু রেখে গেছেন। বাংলার পূর্বতন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর রচিত 'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'থিয়িষ্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' হতে পুনর্মুদ্রিত 'পরমহংস

রামকৃষ্ণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ থেকে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিজের কথা বহুলাংশে উদ্ধৃত করেছেন ; এই উদ্ধৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্রের ধারণার নিখুঁত একটি ছবি ফুটে উঠেছে : " 'তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) ও আমার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ?'—প্রশ্ন করেছেন তিনি। 'আমি পাশ্চাত্য-ভাবানুপ্রাণিত, সভ্য, আত্মকেন্দ্রিক, অর্ধ-সন্দিগ্ধচিত্ত, তথাকথিত শিক্ষিত, বিচারশীল ব্যক্তি ; আর তিনি ? একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, অমার্জিত, অর্ধ-পৌত্তলিক, বান্ধবহীন হিন্দু ভক্ত ! ডিসরেলি ও ফসেট্, ষ্টান্‌লি ও ম্যাক্সমূলার এবং ইউরোপের প্রায় সব পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বক্তৃতা আমি শুনেছি ; আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আশায় দীর্ঘকাল তাঁর কাছে বসে থাকতে যাই কি জন্য ?···আর একা আমি নই, আরো ডজন ডজন লোক তাই করে।' এবং যথেষ্ট চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর পরিচয়ের অনুকূলে রয়েছে শুধু তাঁর ধর্ম। কিন্তু তাঁর ধর্মও একটি প্রহেলিকা। 'তিনি শিবের পূজা করেন, আবার কালীর পূজাও করেন ; তিনি রামের পূজা করেন, কৃষ্ণের পূজা করেন, আবার বেদান্তমতের একজন স্থিরনিশ্চয় সমর্থকও তিনি। তিনি প্রতিমা-পূজক, অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এবং অতি শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে অদ্বিতীয়, নিরাকার, পরব্রহ্মরূপ অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যানও করেন···। পরমানন্দই তাঁর ধর্ম, জ্ঞানাতীত অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর পূজা ; এক অদ্ভুত বিশ্বাস ও অনুভূতির আগুনের এবং ব্যাকুলতার শিখায় তাঁর সমগ্র প্রকৃতি দিবারাত্র প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে।' "

শ্রীরামকৃষ্ণের যথোচিত গুণগ্রহণ ও তৎপ্রতি প্রতাপচন্দ্রের মনোভাব তাঁর নিম্নলিখিত কথায় আরো বিশদভাবে ফুটে উঠেছে : "যতক্ষণ তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) পাওয়া যায়, তাঁর কাছ থেকে পবিত্রতা সম্বন্ধে অতি উচ্চাঙ্গের উপদেশ পাবার জন্য এবং বিষয়বুদ্ধিহীনতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্-প্রেমোন্মত্ততা শিখবার জন্য ততক্ষণ আমরা সানন্দে তাঁর পদতলে বসে থাকব।" যে ক'জন ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ

পেয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় কতখানি যে মগ্ন হয়েছিলেন তা এই ভদ্রমহোদয়েরই আর একটি উক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে: "তিনি তাঁর বালকের মতো সরল ভক্তি সহায়ে এবং এক চির-উন্মুখ মাতৃত্বে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় সহায়ে আমাদের মনের সামনে অদ্ভুতভাবে তা (ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনার ভাব) খুলে ধরেছিলেন…। তাঁর সংস্পর্শে এসেই পৌরাণিক ভারতের পুরাণবর্ণিত তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরীয় ভাবগুলি আমরা আরো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম।"

ব্রাহ্মসমাজের কাগজে ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক এইসব বিবরণীগুলি হতেই পরিষ্কার বোঝা যায় ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটি একদল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের ওপর কি প্রচণ্ড প্রভাবই না বিস্তার করেছিলেন; বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের প্রতিটি অঙ্গ ও প্রতিটি ভাবে পূর্ণ আস্থাবান, এমন কি প্রতিমা-পূজাতেও বিশ্বাসী একজন হিন্দু—হিন্দুদের মধ্যেও আবার বিশেষভাবে হিন্দু—কিভাবে এইসব বিচার-প্রবণ ও বিশ্লেষণ-পরায়ণ মনগুলির ওপর নিজ অনুভূত সত্য মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এধরনের প্রকাশনে আরো একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছিল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে প্রয়োজনটি। এরই মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পেয়েছিলেন কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা, যাদের ভেতর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ শিষ্যেরাই এসেছিলেন।

শিষ্যসঙ্গে

জগন্মাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে সেভাবে জীবনযাপন করার জন্য এক থাকের পবিত্র ও ভগবান-লাভেচ্ছু লোক তাঁর কাছে আসবেন, তাঁরই নির্দেশে আধ্যাত্মিক পথে চলে

তাঁরা আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর লাভ করবেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মানব-সমাজে তাঁর বাণী প্রচার করবেন। এঁদের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বে কতদিনই না উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছেন তিনি! দেখা হবার পূর্বেই এঁদের জন্য তাঁর ভালবাসা অতি গভীর হয়ে উঠেছিল; এঁরা আসতে দেরি করছেন দেখে আর সহ্য করতে না পেরে প্রায়ই তিনি ছাদে উঠে চীৎকার করে কাঁদতেন, "ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয়রে! তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারছি না!"

ব্রাহ্মসমাজের একটি সাময়িক পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম দেখে এই থাকের ভক্তেরা তাঁর সন্ধান পান। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে এঁদের আগমন শুরু হয়; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা চলেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার জলন্ত শিখা থেকে নিজেদের হৃদয়বর্তিকা জেলে নেবার জন্য এই থাকের যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের ভেতর কয়েক-জন, বিশেষ করে যাঁদের বয়স একটু বেশী হয়েছিল তাঁরা, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গৃহস্থই থেকে গিয়েছিলেন; আর যুবকদের ভেতর অধিকাংশই বরণ করেছিলেন সন্ন্যাস-জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত পরি-চালনায় ও অনুপ্রেরণায় তাঁর গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়বিধ শিষ্যেরাই নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। গৃহস্থদের মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, দুর্গাচরণ নাগ, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আরো অনেকেই; কয়েকটি স্ত্রীভক্তও। এসব পুণ্যাত্মাদের প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যুবক শিষ্যদের যেভাবে উপদেশ দিতেন, এসব বয়স্ক ভক্তদের উপদেশ দিতেন তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। তাঁদের সংসার ত্যাগ করতে নিষেধ করতেন তিনি; কর্মযোগীর মতো কিভাবে সংসারের মধ্যে থেকেই অনাসক্ত হয়ে ভগবানে মন নিবিষ্ট করতে হয়, তা শেখাতেন। কর্তৃত্ববোধ পরিহার

করতে শেখাতেন তাঁদের। বিশ্বাস করতে শেখাতেন যে, তাঁদের পার্থিব সম্পদ ও প্রিয়-পরিজন সবই আসলে শ্রীভগবানেরই সম্পত্তি। শেখাতেন যে, সংসারের প্রতিটি কর্তব্যই ঈশ্বরপ্রদত্ত পবিত্র কর্ম—এই ভাব নিয়ে তাঁর দীন দাসেব মতো ঐকান্তিকতার সঙ্গে তা করে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্নিময়ী বাণী এভাবে গৃহস্থ ভক্তদের মনে শ্রীমদ্ভবদ্গীতোক্ত ভগবদ্ভক্তি ও নিঃস্বার্থ কর্মের সমন্বয়ের চিরন্তন বাণীটি চিরমুদ্রিত করে দিত: "যখন কাজ করবে, এক হাত ভগবানের পায়ে রেখে অপর হাত দিয়ে কাজ করবে। যখন কাজ থাকবে না, তখন দু'হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে বুকে টেনে নেবে।" কখনো কখনো জীবনের যাত্রাপথে নিজ কর্তব্য কর্মে নিবত থাকতে তাঁদের উৎসাহিত করতেন এই বলে: "সংসার ত্যাগ করে লাভ কি? তোমাদের কাছে সংসার তো কেল্লার মতো। তাছাড়া, যার জ্ঞান হয়েছে সে তো সব সময়েই মুক্ত। পাগলেই শুধু বলে, 'আমি বদ্ধ', এবং শেষে তা-ই হয়ে যায়। মনই সব। মন মুক্ত থাকলে তুমিও মুক্ত। ভাববে, বনেই থাকি আর সংসারেই থাকি, কোন অবস্থাতেই, কোনকালে আমি বদ্ধ নই। আমি রাজরাজেশ্বব ঈশ্বরের সন্তান। আমাকে বদ্ধ করতে সাহস হবে কার?"

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন প্রত্যেক ব্যক্তিরই আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা বিশেষ ধারা আছে, এবং প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষ ভক্তকে সেই ধারায়, তার নিজস্ব পথেই তিনি চালিত করতেন। সেজন্য বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনার উপদেশের পরিধিও বিপুল-বিস্তৃত। ব্যক্তিবিশেষকে প্রদত্ত তাঁর শিক্ষাপ্রণালী দেখে অনেক সময় অবাক্ হতে হয়: তবু অপরাপর ব্যক্তিকে সাধারণভাবে যে প্রণালীতে তিনি শিক্ষা দিতেন, তারই মতো সমানভাবে ফলপ্রসূ হত ব্যক্তিবিশেষকে প্রদত্ত তাঁর শিক্ষাপ্রণালীও। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, বাংলার প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে তিনি কখনো মদ্যপান ত্যাগ করতে বা বারাঙ্গনাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে

অবতীর্ণ হবার কাজ ছেড়ে দিতে বলেন নি। এমন কি প্রার্থনা ও ধ্যান করার কাজ থেকেও তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তাঁকে শুধু বলেছিলেন, স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে কিছু করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে। এ অদ্ভুত ব্যবস্থাপত্র সত্যিই তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলেছিল; প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ শিষ্যদের মধ্যে তিনি অতি উচ্চাঙ্গের ভক্তপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। ভক্তদের মনের ভিতরকার সবকিছু প্রত্যক্ষ করে তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ উন্নতির পথে পৃথকভাবে পরিচালিত করার শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। ইচ্ছা দৃষ্টি বা স্পর্শ সহায়ে তিনি তাঁদের ভেতর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও অনুভূতি সঞ্চারিত করতে পারতেন।

গৃহস্থ ভক্তগণ একবার শ্রীরামকৃষ্ণের তড়িৎ-স্পর্শে নিজেদের ওপর দৈবী কৃপার অদ্ভুত অবতরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি। আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ স্মরণীয় দিন হিসাবে তাঁদের কয়েকজন প্রতি বছর এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপিত করে আসছেন। কলকাতার উত্তর শহরতলী কাশীপুরের এক বাগানবাটীতে শরীরত্যাগের কিছুকাল পূর্বে চিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়েছিল; এখানে প্রায় ত্রিশজন গৃহস্থ ভক্ত সেদিন তাঁর কাছে সমবেত হয়েছিলেন। দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন এঁদের প্রত্যেককেই পৃথক্‌ভাবে স্পর্শ করে দেন, এবং সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাব হঠাৎ হু-হু করে বেরিয়ে এসে হৃদয় অভিভূত করে দেয়। ফলে, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে দিলেন, কেউ বা ভগবানের জন্য করুণস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন; বাকী সবাই স্থির হয়ে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁদের চোখের সামনে আধ্যাত্মিক আনন্দ ও আলোকে উদ্ভাসিত এক নতুন জগতের আবরণ উন্মোচিত হল এবং সে সময়ের জন্য প্রত্যেকেই বাহ্যজগতের কথা

সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে এই নবজীবনের প্রচণ্ড স্পন্দনে এবং ঈশ্বরানুভূতির গভীর আনন্দ ও বিস্ময়ে শিহরিত হতে লাগলেন।

উদ্যানবাটীতে উপস্থিত থাকলেও যুবক ভক্তেরা অবশ্য তাঁর এই কৃপার ভাব থাকাকালীন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। এই ঘটনাতেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তাঁদের আলাদা পথ ধরে চলার প্রয়োজন ছিল। সামনে একটা বিরাট কাজ ছিল, সেই কাজের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুবকদের গড়ে তুলছিলেন। এঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা শুধু নিজেদের আনন্দ ও মুক্তিলাভে নিঃশেষিত হবার জন্য নয়, সেই সঙ্গে হাজার হাজার লোককে আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে ঠেলে তোলার জন্য বিশাল যন্ত্ররূপেও নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। এই জন্যই এই দলের যুবক-ভক্তদের দুর্ধর্ষ নেতা নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) যখন নির্বিকল্প সমাধির দিব্য আনন্দে নিরন্তর মগ্ন হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "লজ্জা করে না তোর। ভেবেছিলাম কোথায় একটা বিরাট বটবৃক্ষের মতো হয়ে হাজার হাজার তাপিত লোককে আশ্রয় দিবি, তা নয় স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের মঙ্গল চাচ্ছিস? এসব ছোট জিনিস চেয়ো না, বাবা!" মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁর সাধনলব্ধ সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ এঁদের হাতে তুলে দিয়ে যাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকভক্তদের এই ছোট দলটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে নীরবে একটি নতুন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে তুলছিলেন। এঁরা তাঁর বাণী গ্রহণ করে নিজ নিজ অনুভূতিসহায়ে তার সত্যতা যাচাই করবেন, জীবনে তা রূপায়িত করবেন, এবং পরে ভগবদ্‌লাভেচ্ছু লোকদের কাছে পৌঁছে দেবেন সে বাণী: জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের যোগ্য আধার হয়ে উঠতে হবে এঁদের।

কাজেই পরে যে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে, তার ভার সহ্য করার মতো সুদৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে হবে এঁদের জীবন। সস্তা

হালকা ভাবের দিকে ছোটা, বা কোনওরূপে কম্পিতপদে অধ্যাত্ম ভাব-সমাধির রাজ্যে গিয়ে পৌঁছানো—এসব এঁদের জন্য নয়। কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার আগুনে পুড়িয়ে এঁদের মনকে গলিয়ে নিয়ে সমস্ত খাদ বের করে দিতে হবে, যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ছাঁচের সুস্পষ্ট স্থায়ী ছাপ গ্রহণ করে সে ধারণ করে রাখতে পারে। উপযুক্ত সময় বুঝে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শক্তিমান স্পর্শ দৃষ্টি ও ইচ্ছা সহায়ে দিব্যানন্দের পূর্বাস্বাদ এঁদের দিয়েছিলেন; কিন্তু সে শুধু লক্ষ্যলাভের পথে উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার জন্য। এঁদের 'মহাগুরু' চেয়েছিলেন এইসব মহাবীরেরা বুকভাঙ্গা পরিশ্রম করে ধর্মের খাড়াই পথে হেঁটে চলুক, নিজের চেষ্টায় তার উচ্চতম শিখরে উঠুক; তাহলে সেই গগন-স্পর্শী শিখর থেকে নেমে আসার পর এরা উপযুক্ত পথপ্রদর্শক হতে পারবে। যে পথ দিয়ে হাজার হাজার ক্লান্ত, উৎসাহী তীর্থযাত্রীকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে পথের প্রতিটি ইঞ্চির খবর জেনে রাখা এদের প্রয়োজন।

ঠিক এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই বাছাই-করা দলে টেনে নেবার আগে সজাগ দৃষ্টিতে প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক শক্তি পরীক্ষা করে নিতেন। এই শুদ্ধ দলে টেনে নেবার সময় তিনি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতেন কাঁচা তরুণ মনকে, যা তখনো বিষয়চিন্তার কালিমালিপ্ত হয়ে ওঠে নি, যা তাঁর আধ্যাত্মিক ছাঁচে ঢেলে গড়ার পক্ষে যথেষ্ট নমনীয়। কাজেই এই দলের ভেতর বেশীরভাগই ছিলেন উৎসাহী যুবক; কয়েকজনের বয়স তখন কুড়ি বছরেরও কম। আর, শুধু একজন ছাড়া এঁরা সবাই বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন।

লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ছিলেন এর একমাত্র ব্যতিক্রম। বিহারে তাঁর জন্ম; একজন বাঙ্গালী ভক্তের পরিবারে বালক-ভৃত্য ছিলেন তিনি; লেখা-পড়া কিছুই জানতেন না। গোপালের (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বয়স একটু বেশীই ছিল; তারক (স্বামী শিবানন্দ) ছিলেন বাকী আর সকলের চেয়ে

বয়সে বড়। হরির (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বয়স বড়জোর চৌদ্দ বছর; সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ), গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) ও কালীর (স্বামী অভেদানন্দ) বয়সও এর কাছাকাছি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) ছিলেন একেবারে ছেলেমানুষ। হরিপ্রসন্ন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ), যিনি কিছুকাল পরে সঙ্ঘে যোগ দেবার জন্য দৈবনির্দিষ্ট ছিলেন, শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও শশীর (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন; তখন তাঁরা সবাই কলেজে পড়ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে আগমনকালে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ, যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) ও নিরঞ্জনের (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) বয়সও প্রায় এঁদেরই মতো ছিল, কিংবা তখন হয়ত তাঁরা সবে বিশের কোঠায় পা দিচ্ছেন।

জগন্মাতার বালক শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের সবাইকে পেয়ে বাস্তবিকই খুব খুশী হয়েছিলেন। স্নেহময়ী জননীর মতো কোমল হৃদয়ের প্রগাঢ় স্নেহধারা বর্ষণে তিনি এঁদের আপ্লুত করে রাখতেন। তাঁর সান্নিধ্যে এই তরুণ-দলের কল্পনারঙীন চিত্ত এমন একটা আনন্দের রাজ্যে ঘুরে বেড়াত, যাতে জীবনের আর সব কিছুই ভুল হয়ে যেত। এই আকর্ষণই সাধারণ জীবনপথ থেকে তাঁদের অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্ন করে আকর্ষণের প্রচণ্ড রহস্যময় কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে আসে। ঠাকুরের সামান্য একটু মোহিনী হাস্য ও দু'চারটে আদরের কথার জন্য এই মুগ্ধ যুবকদল আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকতেন। ক্রমে বাড়ির পরিবেশ তাঁদের আলুনি বোধ হতে লাগল এবং তাঁদের প্রেমের বিগ্রহকে একটিবার মাত্র চোখে দেখার জন্য এবং কয়েক ঘণ্টা তাঁর রোমাঞ্চকর সঙ্গলাভের জন্য স্কুল থেকে বা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে তাঁরা মোটেই দ্বিধা করতেন না। রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলেই আনন্দে লাফিয়ে উঠতেন এবং আদুরে

ছেলের মতো ছুটে এসে তাঁর কোলে বসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন, আর নরেন ছিলেন তাঁর নয়নের মণি। দেবদুর্লভ পবিত্রতার পুরস্কারস্বরূপ সমাধিকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণ করে থাকবার দুর্লভ অধিকার পেয়েছিলেন বাবুরাম। যোগীনকে প্রায়ই তিনি উৎসাহিত করতেন আরো একটু সাহস, দৃঢ়তা ও বাস্তববুদ্ধি দেখাবার জন্য, আর উগ্রস্বভাব নিরঞ্জনকে মিষ্টি কথায় বোঝাতেন তাঁর বেপরোয়া উৎসাহের রাশ একটু টেনে রাখতে। এভাবে এই দেব-পরিবারের প্রত্যেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত স্পর্শ গভীরভাবে ও স্পষ্টরূপে হৃদয়ে অনুভব করে তাঁকে অতি প্রিয়- ও আপন-জন বলে জানতে পেরেছিলেন।

এই যুবকদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত রকমের। চিরন্তন প্রথানুসারী গুরুদের মতো কঠিন হস্তে তিনি শাসন করতেন না তাঁদের, জোর করে তাঁদের তরুণ মনের ওপর কতকগুলো বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার নীতিতেও বিশ্বাস করতেন না। সর্বদা দোষ-ত্রুটি খুঁজে তত্ত্বাবধান করা তো শ্রীরামকৃষ্ণের ধাতের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। যুবক ভক্তদের জন্য তাঁর হৃদয় স্নেহ ও সহানুভূতিতে সর্বদা পূর্ণ হয়ে থাকত এবং তাঁদের সমভূমিতে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে তিনি ভালবাসতেন। অতি মধুর আচরণের মাধ্যমে, অথচ প্রয়োজনকালে কঠিন হয়ে, প্রত্যেকের রুচি ধাত ও সামর্থ্যের পক্ষে যে-পথ সবচেয়ে বেশী অনুকূল, সেই পথেই তিনি তাঁদের হাত ধরে নিয়ে যেতেন। এইসব তরুণ মনগুলিকে চেঁচেছুলে গড়ে সেখানে কোন একটা নির্দিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তুলতে, অথবা নিজের আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের ভাণ্ডার থেকে উপাদান আহরণ করে তাঁদের মনের ওপর কতকগুলো বিরাট বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে প্রয়াসী হন নি তিনি। তিনি জানতেন তাঁর কাজ হচ্ছে বাগানের মালীর মতো,—সূত্রধর বা রাজমিস্ত্রীর মতো নয়। আধুনিক-কালের শিক্ষাপদ্ধতি যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে বলে, শিষ্যদের

প্রতি তাঁর এই মনোভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গীরই পূর্বলক্ষণ নিশ্চিতরূপে সূচিত। সে যাই হোক, একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ মালীর মতো তিনি এসব তরুণ মনকে লালন করতে লেগে গেলেন, এবং তাঁদের নিজস্ব গঠন যা রয়েছে তারই পূর্ণতার দিকে ভেতর থেকে যাতে তাঁরা নিজেরাই বেড়ে যেতে পারে তার জন্য প্রত্যেককে সাহায্য করতে লাগলেন। সকলের প্রতিই সস্নেহ সজাগ দৃষ্টি রাখতেন তিনি, এবং যা কিছু তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করতেন, সর্বদা সাবধানে নিপুণহস্তে তা সরিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকতেন। তাছাড়া, তাঁর ভাস্বর আত্মশক্তি তাঁর সমীপবর্তী এসব স্ফুটনোন্মুখ বিভিন্ন হৃদয়-কলিগুলির কাছে নীরবে ও প্রায় অগোচর থেকে কোমল স্পর্শ দিয়ে প্রাণের প্রাচুর্য এনে দিত,—প্রত্যেকটি কোরক যাতে নিজস্ব বিশেষ রূপ ও গন্ধের অপরূপ মাধুর্যের সম্ভার নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে।

আধ্যাত্মিকতাঅভীপ্সু যুবকেরা এক অফুরন্ত আনন্দ ও স্বাধীনতার পরিবেশে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতেন ; তাঁদের অনুপম আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক তাঁদের উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন হিসাবে এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের কোমল হৃদয়ে উদাসীর বিমর্ষভাব আসতে দিতেন না তিনি। বরং প্রায়ই মিষ্টি কথা, মজার গল্প ও হাসির কথা বলে এবং রসিকতা করে তিনি এসব তরুণ মনের দীপ্তি ও প্রফুল্লতা অটুট রাখতে চেষ্টা করতেন ; কখনো কখনো তাঁকে বিষয়ী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কৌতুকজনক নানা অঙ্গভঙ্গীর অদ্ভুত অনুকরণ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে করতে দেখে তাঁরা হেসে লুটোপুটি খেতেন। এমন কি, যে পাপবোধ কোন কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ভক্তদের মনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে, তাও এসব যুবকদের প্রফুল্ল মুখে নিরানন্দের ছায়াপাত করবার অবকাশ পেত না। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্টভাষায় তাঁদের বলতেন, "যে দুর্ভাগা দিনরাত শুধু 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' বলে, সে তাই-ই হয়ে যায়।" মুখে আনন্দোজ্জ্বল

স্বর্গীয় হাসি নিয়ে এবং কথায় রসিকতার ঝলক দিয়ে তিনি এই তরুণ সেনাদলটিকে মহান্ অভিযানের জন্য সুসংহত করে রাখতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে তাঁরা অনুভব করতেন যে, লক্ষ্য সুদূরবর্তী নয়, আর সেদিকে এগিয়ে চলাও হচ্ছে একটা আনন্দমধুর পর্যটন মাত্র। উৎসাহে ভরা কথায় তিনি তাঁদের মধ্যে দৃঢ়প্রত্যয় এনে দিতেন যে, যে মুহূর্তে তাঁরা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবেন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন। তিনি বলতেন, "মুক্ত হবার জন্য ইচ্ছা জাগাও, তাহলেই মুক্ত হয়ে যাবে। যে নির্বোধ সব সময় বলে 'আমি বদ্ধ', শেষে সে বদ্ধই হয়ে যায়...। কিন্তু যে ভাবে সংসারবন্ধন আমার নেই, আমি মুক্ত; আমি কি ঈশ্বরের সন্তান নই?'—সে মুক্তই হয়ে যায়।" "মনেই বদ্ধ, আবার মনেই মুক্ত।"

তাঁদের মনের ওপর ধর্মের কোন অনুশাসন চাপিয়ে দিতেন না তিনি, শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা তাঁদের চরণ শৃঙ্খলিতও করতেন না; তার পরিবর্তে তিনি কেবল তাঁদের উৎসাহিত করতেন নিজেরা পরীক্ষা করে নিজেদের উপলব্ধ জ্ঞান সহায়ে শাস্ত্রোক্ত সত্যগুলিকে যাচাই করে নিতে। চলার জন্য প্রত্যেককে একটা বিশেষ পথ নির্দিষ্ট করে দিতেন তিনি; আর বলতেন, প্রয়োগবাদীদের মতো, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যাঁরা জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মতো, সুসমঞ্জস মনোভাব নিয়ে চলে সে পথের শেষে যে পরম আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রয়েছে নিজেদেরই তা আবিষ্কার করে নিতে। এসব সত্য সম্বন্ধে নিজের পূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস থাকলেও তাঁদের মনে বিচারসম্মত উপায়ে অনুসন্ধান করার প্রাণপ্রদ সদিচ্ছা জাগিয়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। আধুনিক মনের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল তাঁর এই পদ্ধতি, আর এইসব তরুণ শিষ্যদের বিচারপ্রবণ মন খুব সহজভাবেই তা গ্রহণ করত। তাছাড়া মনোবিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বের বিরোধী মতবাদ নিয়ে বৃথা তর্কে তাঁদের প্রবৃত্ত হতে দিতেন না তিনি।

নিজের উপস্থিতি-প্রভাবে এবং সুস্পষ্ট ও শক্তিমণ্ডিত উপদেশ সহায়ে তাঁদের মনে ঈশ্বরলাভের একটা তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতেন। বলতেন, "তর্ক আমার ভাল লাগে না। ঈশ্বর যুক্তিতর্কের অতীত। আমি দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বরই সবকিছু হয়েছেন। কাজেই বিচার কিজন্য করব? বাগানে গিয়ে আম খেয়ে চলে এসো, আমগাছের পাতা গুনতে তো আর যাচ্ছ না সেখানে! কাজেই অবতারতত্ত্ব ও পৌত্তলিকতা নিয়ে তর্কে সময় নষ্ট করে লাভ কি?"

আর ভগবানলাভ সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্টরূপেই বলেছিলেন যে ভাসা-ভাসা চেষ্টায় তা হবার নয়। চরম সত্যের সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াতে হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে মনকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে এনে অন্তর্মুখী করতে হবে। কামকাঞ্চন-আসক্তির সঙ্গে কোনরকম আপস করা চলবে না। সত্যিই যদি তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্যলাভ করতে চান, তাহলে ভোগলালসা ও ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে ত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা ও পবিত্রতার জীবন বরণ করার জন্য তিনি তাঁদের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতেন। একদিন তিনি সত্যিই তাঁদের সন্ন্যাসীদের মতো ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন। আর একদিন, গৃহস্থের সঙ্গে হিন্দু সন্ন্যাসীর পার্থক্য-জ্ঞাপক গৈরিক বসন তাঁদের পরতে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে এই বাছাই-করা যুবক শিষ্যদলটির নমনীয় অথচ বজ্রদৃঢ় চিত্তে সন্ন্যাসজীবনের প্রাণ সঞ্চারিত করেছিলেন, সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে তাঁদের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এরূপে এক সুদৃঢ় ও নিরাপদ ভিত্তি তিনি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, যার ওপর যথাকালে রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গড়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শেষ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, সেই সময়েই তাঁর যুবকভক্তগণ (কাশীপুরে) সমবেত হয়ে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে বাস্তবিকই দিব্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মারাত্মক কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। এ অসুখে প্রায় একবছর তিনি ভুগেছিলেন; এর

ভেতর প্রায় চার মাস তাঁকে কলকাতায় থাকতে হয়েছিল, আর কলকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরের একটি বাগানবাটীতে ছিলেন প্রায় আটমাস। গৃহস্থ ভক্তেরা তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন, আর যুবক ভক্তরা শ্রীশ্রীমায়ের (সারদাদেবীর) উপস্থিতি ও অতন্দ্র সেবার বিপুল উৎসাহে বলীয়ান হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার দায়িত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের ভেতর বারো জন বাড়ি থেকে চলে এসে শুশ্রূষার জন্য সবসময়ই তাঁর কাছে থাকতেন, বাকী তিনজন প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের সেবা করার জন্য প্রায়ই এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করতেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করতে এসেছিলেন; সেখানে এসে থাকার সময় সন্ন্যাসজীবনের আদর্শে সবাই উদ্দীপিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

নরেন্দ্রনাথের ভিতর প্রচ্ছন্ন নেতৃত্বশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছিলেন, "সাধারণ লোকে জগৎকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে ভয় পায়। হাবাতে কাঠ কোন রকমে নিজে ভেসে যেতে পারে, তার ওপর একটা পাখীও এসে বসলে তক্ষুনি ডুবে যায়। কিন্তু নরেনের কথা আলাদা। সে যেন বড বড় গাছের গুঁড়ির মতো, যার ওপর অনেক মানুষ ও পশু উঠলেও তাদের নিয়েই গঙ্গাবক্ষে ভেসে যেতে পারে।" কাজেই যুবক ভক্তদের এই দলটির প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি নজর রেখে পবিত্র ভ্রাতৃত্ববন্ধনে তাঁদের সুসংহত করে রাখার গুরুদায়িত্ব তিনি নরেন্দ্রনাথের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে খোলাখুলি বলেছিলেন, "এসব ছোকরাদের তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। এদের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানে সচেষ্ট থেকো।" ঠাকুরের মধুর পিতৃস্নেহ, তাঁর মানবলীলা সংবরণের সময় আসন্ন হওয়ার জন্য মর্মন্তুদ বেদনা, এবং সকলের কল্যাণের জন্য তাঁদের তরুণ নেতার গভীর সস্নেহ উদ্বেগ—এসব মিলে তরুণ উৎসাহীদের মনে লক্ষ্যলাভ করার জন্য একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। জগতের

সব কিছু ভুলে গিয়ে তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় একেবারে ডুবে গেলেন। তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োজিত হল প্রাণপ্রিয় গুরুর সেবায় এবং আধ্যাত্মিক সত্যের আকুল অন্বেষণে।

এই সময়েই একদিন নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে চরম সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানাতীত অনুভূতি লাভ করে ধন্য হন। সাধারণ জ্ঞানের ভূমিতে মন ফিরে আসামাত্র গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রাণস্পর্শী কথায় নরেন্দ্রনাথকে বিস্ময়াভিভূত করে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে দিয়েছিলেন, "মা তো তোমায় সবই দেখিয়ে দিলেন। এসব এখন তালাবন্ধ রইল···। মায়ের কাজ শেষ হলে আবার সব ফিরে পাবে।" দেহত্যাগের তিনচার দিন পূর্বে নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁর দিকে সস্নেহ-দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর নরেন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ করুণস্বরে তাঁকে বলছেন, "আজ তোমায় আমার সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হয়ে গেলাম। এই শক্তি দিয়ে তুমি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত করবে। একাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ফিরে যাওয়া হবে না।" এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন; এই আধ্যাত্মিক শক্তিই যে তাঁর সর্বস্ব, তাঁর অত্যুত্তম জীবনপটের টানা-পোড়েন, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা তাঁর শিষ্যের দেহমন্দিরে প্রবেশ করলেন; নরেন্দ্রনাথের দেহ অবলম্বন করে স্বীয় আবদ্ধ কর্ম চালিয়ে যাবার জন্য আরবদেশীয় উপকথার 'ফিনিক্স' পাখীর মত শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এভাবে নতুন দেহ ধারণ করলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তাঁর জীবনের শেষদিনে শেষ সমাধিতে লীন হয়ে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করার পূর্বে তিনি নরেন্দ্রনাথকে একটি দায়িত্ব অর্পণ করে যান, বারংবার বলেন, "এসব ছেলেদের দেখাশোনা করার ভার রইল তোমার ওপর।"

একটি পৃথক অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব, নরেন্দ্রনাথ প্রাণপ্রিয় গুরু-

কর্তৃক ন্যস্ত সে দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে প্রাণপণ সস্নেহ প্রযত্নে নিজের গুরুভাইদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন ; আর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ'-রূপ যে সৌধের ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে কার্যকরভাবে স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তার ওপর এঁদের সহায়তায় সে সৌধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

আলোকস্তম্ভ

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবনের ওপর দিয়ে আমরা দ্রুতগতিতে চোখ বুলিয়ে এলাম, সে জীবন আধুনিক মনের কাছে কিছুটা হেঁয়ালির মতোই মনে হতে পারে। এ জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে, যা বিশ্লেষণ-পরায়ণ যুক্তির ও বাস্তববাদী সাধারণবুদ্ধির এই যুগে চোখে পড়া আশা করতে পারা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জন্ম সম্বন্ধে তাঁর পিতার স্বপ্ন, তাঁর বাল্যকালের ভাবসমাধি-জনিত উপলব্ধি, বয়সের তুলনায় কিছু পূর্বেই আগত কৈশোরে তাঁর 'চালকলাবাঁধা-বিদ্যার' বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন, যৌবনে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্য তাঁর ব্যাকুল অন্বেষণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মগুরুগণের নির্দেশমতো তাঁর ঐকান্তিক কঠোর অধ্যাত্মসাধনা, এসব বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির প্রত্যেকটি অবলম্বনে অচিন্তনীয় অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর ঈশ্বরানুভূতি, সস্নেহ প্রবল ইচ্ছাসহায়ে তাঁর শিষ্যদের জ্ঞানালোকদান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধান এবং সর্বোপরি মহাপ্রয়াণের পূর্বে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর রহস্যময় শক্তিসঞ্চার—এসব কিছুই নিশ্চয়ই সাধারণ অনুভূতির গণ্ডির বাইরের জিনিস। এমন কি তাঁর অদৃষ্টপূর্ব পবিত্রতা ও ভালবাসা, নিজ জীবনে বিপরীত অবস্থা চিন্তা ও ভাবের মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর সমন্বয়সাধন, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ভক্ত ও নিজ গুরুগণের সঙ্গে এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষিগণের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাপ্রদ সংযোগ এবং তাঁর ধর্মসমন্বয়ের বাণী গ্রহণের ফলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর

প্রসারলাভ—এগুলিও সাধারণ পর্যায়ের ঘটনা নয়। আবার, পৃথিবীর কয়েকটি ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত সর্ববিধ ভাব ও আদর্শের প্রচার করা, তাঁর যুবক শিষ্যগণকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা ও নরেন্দ্রনাথের অন্তরে আর্তগণের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনার ভাব সঞ্চারিত করা—এগুলির ভেতর পর্যন্ত এমন সব উপাদান রয়েছে, আমাদের বহুভাব-বিভ্রান্ত মন যা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। পূর্বের জীবনালেখ্য পাঠ করে আধুনিক মনে যেসব সন্দেহ ওঠা খুবই স্বাভাবিক, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন করার মতো অবস্থায় আসার পূর্বে সেসব সন্দেহের নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

এ ঘটনাগুলিকে কি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন-সূত্রের ওপর জগন্মাতার স্বেচ্ছাকৃত জোড়াতালি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে? এ ঘটনাগুলি তাঁর জীবনে জগন্মাতা ইচ্ছা করে ঘটিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য তাই বিশ্বাস করতে বলতেন, অথবা এগুলি শুধু প্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত ব্যতিক্রম? আধুনিকদের ভেতর অনেকেই আছেন, যাঁরা বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের অনুভবের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারেন না, এবং যাঁরা ধর্মকে বালসুলভ অপরিণত মনের অবসর-বিনোদনের বিষয়মাত্র বলে মনে করেন। এসব সাহসী স্বাধীন-চিন্তাশীল লোকের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অলৌকিক অংশগুলি রূপকথার স্বপ্নজড়িত অলীক বিষয় বলে মনে হতে পারে, এগুলিকে তাঁরা স্নায়ুদৌর্বল্যঘটিত মানসিক বিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ বলেও ভাবতে পারেন। কিন্তু এরূপ কোন মতামত দেবার পূর্বে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, পূর্ববর্ণিত এ জীবনপ্রসঙ্গটি এমন একজনের জীবনের ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যিনি এই কিছুদিন আগে, একরকম আমাদের চোখের সামনেই, বেঁচে ছিলেন, এবং যাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এখনো জীবিত আছেন*;

* ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মূলগ্রন্থটি লিখিত হয়; শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যেও তখন তিনজন স্থূলদেহে ছিলেন—স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ।—অনুবাদক

তাছাড়া বিশ্লেষণপরায়ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে একথাও একবার ভেবে দেখা উচিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব জীবন থেকে আধ্যাত্মিক সত্যের অনুকূলে টাটকা ও বিশ্বাসযোগ্য প্রচুর পরিমাণ প্রামাণ্য উপাদান জগৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে পেয়ে গেল কিনা। জগতের সত্যদ্রষ্টা ও আচার্যদের বাণীর পিছনে—যা দিব্যবাণী বলেই প্রতীয়মান হয়—যদি কোন সত্য থাকে, জগতের ধর্মশাস্ত্রগুলির ভেতর উচ্চতর ও জ্ঞানাতীত সত্য সম্বন্ধে—যে সত্যকে জগতের চেতন-অচেতন সমস্ত বাহ্য প্রকাশের চেয়ে আরো পরিষ্কাররূপে, আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ দাবি করতেন—যদি কোন সঠিক সংবাদ থাকে, তাহলে আমরা তার সত্যাসত্য নির্ণয় করব কিরূপে? এ প্রশ্নের পরিষ্কার খোলাখুলি একটা উত্তরের প্রয়োজন।

আধুনিক জ্ঞান যেমন নিশ্চিত ও কার্যকরভাবে সনাতনপন্থী ও গোঁড়া বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করে চলেছে, নিরীশ্বরবাদেরও মূলোচ্ছেদ করেছে ঠিক সেইভাবেই। অক্টোভিয়াস বি. ফ্রথিংহাম তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য-সহাগে আধুনিক চিন্তাধারার গতি বোধ হয় পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—"ঈশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, প্রতিমাগুলি ভেঙে পড়ছে, প্রতীকসমূহ খসে খসে পড়ে যাচ্ছে; কিন্তু অতলস্পর্শ গহ্বর থেকে অস্পষ্টভাবে উত্থিত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বা এই পটভূমি হতে স্থির পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে।" আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের ভেতরও অনেকেই জন হেনস হোমসের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় একসুরে মর্মস্পর্শী স্বীকারোক্তি করেছেন—"তিনটি কারণে আমি নিরীশ্বরবাদী নই। জীবন সম্বন্ধে নিরীশ্বরবাদের মনোভাব সবটাই গোঁড়ামিতে ভরা। একেবারে নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তা জীবনের তথ্যনির্ণয়ে অগ্রসর হয়। এই বিশ্বের একটা ব্যাখ্যা আবশ্যক, কিন্তু নিরীশ্বরবাদ কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে না।" "অস্তিত্বের একটা যুক্তিসম্মত অবলম্বন-ভূমি অথবা বিশ্বচরাচর যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এমন একটা আদি মূল আধার"-এর বাস্তবতা স্বীকারে আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রায় একমত হয়ে আসছেন;

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনেব একথাও স্বীকাব করে নেন তাঁরা—"বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও গতিবিধি দেখে তার পেছনে যে একটা পূর্বপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তার প্রমাণের আভাস পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ আপনা-আপনি সৃষ্টির সবকিছু ঘটে চলেছে একথা বলা চলে না।" রালফ ওয়ালডো এমারসন আবেগময় কণ্ঠে একই সত্য ঘোষণা করে গেছেন, "প্রকৃতির আবরণ খুবই পাতলা; সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা সে আববণ ভেদ করে সর্বত্রই প্রকট হয়ে পড়ে। শোন ভাই, ঈশ্বর রয়েছেন। প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলে ও মানুষের ইচ্ছাব ওপরে আত্মা আছেন। আত্মার প্রতিটি কার্যের মধ্যে মানুষ ও ঈশ্বরের যে মিলন, তা ভাষায় অপ্রকাশ্য।"

গভীর, সুদূরপ্রসারী পর্যবেক্ষণ-সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের পুরাণ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতিগুলি পৃথক ও আপাতপ্রতীয়মান অসম্পূর্ণতাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত ধর্মেরই লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের মূল অবলম্বনভূমি, বিশ্বের আদি কারণ ঈশ্বরের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁরা পর্যন্ত এ সত্যটিকে প্রায়ই উপেক্ষা করে বা ভুল বুঝে থাকেন। তাঁর এই আবিষ্কারমতে ঈশ্বরবাদীদের ভগবান আর দার্শনিকদের 'অস্তিত্বের বিচার-সম্মত ভূমি' একই জিনিস, এবং বিশ্বের মূল কারণ বলতেও তাই বোঝায়; কাজেই তা আমাদের ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মনের ধারণার অতীত। আমাদের এরূপ মনের সর্বোচ্চ চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটে ঈশ্বরকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করে; অথবা প্রকাশমান চরম সত্তা বা জগৎ-প্রক্ষেপকারী সমষ্টিমন প্রভৃতি ধারণাতীত সূক্ষ্ম ভাব উত্থাপন করে; অথবা এ ধরনের মনে বোধ হয় পরিতৃপ্তি আসতে পারে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে দাবি মেটানোর ক্ষেত্রে আস্তিক্যবাদের প্রায়োগিক মূল্য স্বীকার করে। অজ্ঞেয়বাদীর চরম সত্তার স্বরূপকে অতিমানসিক বলে স্বীকার করে ধর্মকে বুদ্ধির অনধিগম্য করে রেখেছেন; আবার বুদ্ধিসঞ্জাত গভীর চিন্তার মাধ্যমে আস্তিক্যবাদের

সহিত ভাববাদীদের আপসও যে চরম সত্যের জীবন্ত সান্নিধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে, তারও কোন আশা নেই। অজ্ঞেয়বাদীদের সশস্ত্র অপক্ষপাতিত্ব, বস্তুনিষ্ঠ আদর্শবাদীদের শান্তিবাদী ভঙ্গী, আত্মবাদীদের (সলিপসিস্ট) আত্মতুষ্টির মনোভাব; প্রয়োজনবাদীদের উপযোগাত্মক মানসিকতা—বুদ্ধিব অবদান হিসাবে এগুলিব কোনটাই তুচ্ছ নয়; তবে একথাও নিশ্চিত যে, বিশ্বেব অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করার মতো সামর্থ্যেব দাবি এবা কেউ-ই রাখে না। কার্যকারণসম্বন্ধ কোথা থেকে এল, তাব সন্ধানলাভে বুদ্ধির অপারগতা খুবই স্পষ্ট।

অপর দিকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান শুধু কার্যের অব্যবহিত কাবণপবম্পবাব আবিষ্কারেই ব্যস্ত, মূল কাবণ নিয়ে তা মাথা ঘামায় না। তবু বিজ্ঞান আজ জড়পদার্থেব পরমাণুকে অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি-বিন্দুতে বিশ্লেষিত কবেছে, অবাধিত দেশ ও কালের ধারণাকে উড়িয়ে দিয়েছে, দেশ ও কাল-রূপ ছেদ দুটিকে একত্র করে 'দেশকাল'-রূপ এক কাল্পনিক সত্তাব সৃষ্টি করে চতুর্বিধ মাত্রাবিশিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, এবং জড়প্রকৃতির কার্যকলাপের অমোঘ নিয়মের ভেতর নিশ্চিত ব্যতিক্রমও দেখতে পাচ্ছে; কাজেই আধুনিককালের বৈজ্ঞানিকেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী ও যান্ত্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছেন, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ঠিকই বলেছেন, "পদার্থবিদ্যার পুরাতন শ্রেণীবিভাগগুলি জড়জগতেব পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। আর যান্ত্রিকতাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে একটা অতি সাধারণ জীবদেহের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করাও সম্ভবপর হয় না; চেতন-সত্তাই মহৎ-বিশ্ব-প্রক্রিয়ার মূলগত সত্য।" আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে স্যাব জেমস জীনস ও স্যার আর্থার এডিংটনের মতো বিজ্ঞানের বিশিষ্ট পূজারীদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিশ্বের পিছনে তার নিমিত্ত ও সমবায়ী কারণরূপে একটা বিরাট মনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই বার্কলীর যুক্তিবাদী দর্শনেব মতাবলম্বীদের প্রায় সমপর্যায়ে এসে

গেছেন তাঁরা। বিজ্ঞানের বিশ্লেষণপরায়ণ দৃষ্টি প্রকৃতির বাইরের খোলসটির তথ্যটুকু শুধু জানতে পেরেছে। এটা আজ বিজ্ঞানও বুঝছে এবং স্বীকার করে যে, পদার্থবিদ্‌দের মতে বাহ্যজগৎ বলতে বোঝায় একটা অদৃষ্ট ও এখনো অনিশ্চিতস্বরূপ বস্তু; বাহ্যজগৎ বলতে যা বুঝি, তা হচ্ছে এই অদৃষ্ট ও অনিশ্চিতস্বরূপ বস্তুর ওপর আমাদের মনের প্রক্ষেপ মাত্র। এটা আজ অনুমান নয়, স্বীকৃত ঘটনা। আর, মনের বাইরের জগতের মূলসত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এইসব বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-প্রত্যক্ষ-বাদীরা প্রতীক ও অতিসূক্ষ্ম চিন্তাসূত্রের মাধ্যমে মাত্র তা প্রকাশ করতে পারেন। আধুনিক আবিষ্কার সহায়ে বিজ্ঞান এভাবে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্যের অ-জড় প্রকৃতির সম্বন্ধে ধারণা করতে আমাদের সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনেরও অধিক মাত্রাবিশিষ্ট প্রতীক বা গণিতের সূত্রাকার সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সে অ-জড় অন্তঃসত্তাকে, মূল সত্যকে কোনদিন আমাদের বোধের সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে বলে নিশ্চয়ই আশা করা যায় না।

কাজেই এরূপ মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ হবে না যে দার্শনিকদের 'জল্পনা-কল্পনা' অথবা বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্ব ও প্রকল্প, কোন কিছুই বুদ্ধিকে তার নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে এনে তার নিজ কারণের পরিমাপ করাবার মতো সামর্থ্য রাখে না। তবু "অদৃশ্য সত্তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য মানুষের অন্তরে একটা চিরন্তন দাবি রয়েছেই।" তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, "মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে, সৃষ্টির রহস্য ও সে-বিষয়ে তার দায়িত্ব নিয়ে যতদিন সে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা করবে", যতদিন পর্যন্ত পূর্ণতালাভের অন্তহীন স্বপ্ন তাকে প্রণোদিত করে চলবে, ততদিন মূল সত্যকে আরো জোর করে আঁকড়ে ধরতে সে চেষ্টা করবেই। তার প্রকৃতির গড়নই এমনি যে, জ্ঞানের পথের সে-সব বাধার বেড়া ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে চরম সত্তার মধ্যে ও মাধ্যমে পূর্ণত্বের স্বপ্নের

চরিতার্থতা প্রত্যক্ষ করার আগে থেমে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: জীবনের সব বিভাগেই মানুষের যুগ্মবিকাশ দেখা যায়—দৃশ্যমান ঘটনাবলীর সীমামধ্যে সে অবস্থান করে আর বিচরণ করে সে সীমার অতীতে গভীরতর অর্থবহ লোকে; এই সংস্কার চিরদিনই তাকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে সীমারেখা লঙ্ঘন করে যেতে; এই সংস্কার মনে বদ্ধমূল রয়েছে বলেই আপাত-প্রতীয়মানতাকে সে কোনদিনই শেষ মীমাংসা বলে মেনে নিতে পারে নি; সীমাব এই আববণ ভেদ করে বেরিয়ে আসাব জন্যই অবিশ্রাম সংগ্রাম করে চলে সে। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি মানুষের এই উচ্চাশাকে কখনো পূর্ণ করতে পারবে বলে আশা করা যায় না।

জগতের সত্যদ্রষ্টা, মুনি ও আচার্যগণ সকলেই অবশ্য পবিত্রহৃদয়সঞ্জাত আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাকেই অতীন্দ্রিয় সত্যলাভেব একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ কবে গেছেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সহায়ে এসকল বাণীর যাথার্থ্যও প্রমাণিত করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরম সত্তাকে বিভিন্ন মূর্তিতে সাকার ঈশ্বররূপে দর্শন আধুনিক মনে সন্দেহ জাগাতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরে মনুষ্যভাবারোপ বলে মনেও হতে পারে, মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত দৃষ্টিবিভ্রমের সঙ্গে এগুলিকে সম-পর্যায়ে ফেলতেও হয়ত দ্বিধা করবেন না অনেকেই। কিন্তু এই সমস্ত ঈশ্বর-দর্শনই, তার সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিগুলি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে আরো বহু সত্যদ্রষ্টা উপলব্ধি করে গেছেন, এবং একথাও ঘোষণা করে গেছেন যে, এসব দর্শনলাভের জন্য যে কেউ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে তার কাছেই এ দর্শনের দ্বার চির-উন্মুক্ত রয়েছে; সেজন্য এসব আধ্যাত্মিক দর্শনগুলিকে ব্যক্তিবিশেষের বিকৃতমস্তিষ্কজাত কল্পনার পর্যায়ে ফেলা চলে না। তাছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন মাতালের বেলা বা বিকারের রোগীর বেলা যেমন হয়, মনে সেরূপ অবসাদজনিত প্রতিক্রিয়ার কোন

তরঙ্গ তোলা তো বহু দূরের কথা, এসব দর্শনগুলি বরং বাহ্যজগতের ঘটনার চেয়ে অনেক বেশী সুফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তাছাড়া তিনি দেখেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাসম্ভূত অনুভূতিব ভেতর রহস্যময়তা বা অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই। এই স্বজ্ঞাকে শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধ বুদ্ধি বলতেন; তিনি দেখেছিলেন, জ্ঞানেব বাহকরূপে এই স্বজ্ঞা বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের মতোই মানুষের মনেব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি বৃত্তি; দেখেছিলেন, এই স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানের চেয়ে কোন অংশেই কম বিশ্বাসযোগ্য নয়, পরীক্ষায় তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঠিকমতো কার্যক্ষম কবার জন্য বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণকে যেমন প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অভ্যাসসহায়ে সংস্কৃত করে তুলতে হয়, ঠিক সেইরূপ স্বজ্ঞারূপ এই আধ্যাত্মিক বৃত্তিটিকেও ক্রমোন্নত করে তুলতে হয় যোগ-বিজ্ঞানেব নির্দেশানুসারে পবিত্রতা ও একাগ্রতাব ভেতর দিয়ে; খোঁজ কবলে প্রত্যেক ধর্মেরই বহিবঙ্গ আবরণের ভেতর এ নির্দেশেব সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বাবা শুদ্ধ বুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কবে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, আন্তরিকভাবে অনুষ্ঠিত হলে ব্যাবহারিক ধর্মের যে-কোন পদ্ধতিই প্রত্যেক মানুষেব অন্তর্নিহিত এই বৃত্তির বিকাশসাধন করবেই, এবং এই বৃত্তিসহায়ে সে বিবিধ মূর্তিতে সাকার ঈশ্বরেব দর্শনলাভের অধিকারী নিশ্চিতই হবে। এটা সম্পূর্ণ মানবপ্রকৃতিগত ও সর্বজনীন ঘটনা; মানবপ্রকৃতির একটি বিশেষ দিকের বিকাশ ও পরিণতি বিষয়ে নিয়মই বলা চলে একে; অনুন্নত মন নিয়ে মানুষ জ্ঞানের যে সাধারণ সীমায় বিচরণ করে, এ দিকটিব বিকাশ ঘটাতে পারলে সে-সীমা বিস্তৃততর হবার সমূহ সম্ভাবনা বয়েছে। যীশুখৃষ্ট এ সত্যটিই বিবৃত কবেছেন তাঁর বাণীতে, "যাদের হৃদয় পবিত্র তারাই ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করবে।"

নির্গুণ চরম সত্তার সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ঈশ্বরের এসব সাকার রূপদর্শনগুলি অলীক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে স্থূলজগতের চেয়ে বেশী অলীক বলে কখনো ভাবা চলে না এগুলিকে। মনই যে পদার্থবিদ্‌দের মহাশূন্য ও শক্তিবিন্দু দিয়ে গড়া প্রতীকপ্রকাশ্য জগতের ওপর আমাদের অনুভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎরূপ বিপুল বিচিত্র কল্পনাজাল বুনে তুলেছে, এবং ভাবসৌন্দর্যবিষয়ক নৈতিক মূল্য দিয়ে তাকে মণ্ডিত করেছে, এ কথার অবিসংবাদিত্ব আজ বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলির ফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমাহারের ওপর আমাদের মন যে দৃশ্য প্রক্ষিপ্ত করে, বাস্তবিক পক্ষে সেই-ই আমাদের ঘৃণা-ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার জন্ম দেয়, ইলেকট্রন-প্রোটনের সমাহার নয়। ইথারের* রাশি রাশি তরঙ্গের ভেতর থেকে বের করে এনে রামধনুকে ফুটিয়ে তোলে মন-ই, তারপর সে তন্ময় হয়ে যায় নিজেরই সৃষ্টির সৌন্দর্য-উপভোগে। সাধারণ অবস্থায় মন যেমন বস্তুজগতের অদৃশ্য সত্তার ওপর সচরাচরদৃষ্ট সাধারণ বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তোলে, তেমনি আর এক অবস্থায়—পবিত্রতর ও মহত্তর অবস্থায়—সে সেখানে ফুটিয়ে তোলে আর এক ধরণের রূপ, যেগুলিকে সংহত করে আমরা রহস্যময় অনুভূতি বলে অভিহিত করে থাকি।

জড়জগতে যেমন দেখা যায়, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি নিয়মানুগত্য ও কার্য-কারণ-পারম্পর্য দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; অন্যান্য অনুভূতি-মান পুরুষরাও তা দেখেছেন। এই দুই জগতের সংযোগকারী কারণসূত্রও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তিনি দেখেছিলেন, যেসব কারণের জন্য

---

* বর্তমান সময়ে 'ইথার তরঙ্গের' পরিবর্তে 'বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ' বা 'শক্তি-তরঙ্গ' বলা যায়। বিজ্ঞানীরা ইথারের কল্পনা ছাড়াই এখন এ তরঙ্গের উদ্ভব ও বিচ্ছুরণে বিশ্বাসী।—অনুবাদক

মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত অলীক দর্শন ঘটে থাকে, আধ্যাত্মিক ভাবাবস্থায় দর্শন সেসব কারণের জন্য ঘটে না, জাগতিক কোন পবিস্থিতিই এ দর্শন ঘটাতে পারে না। বরং তিনি সেখানে তাব বিপবীত কার্য-কারণ-সম্পর্কই লক্ষ্য করেছিলেন। ভাবাবস্থায় দর্শনকালে জগন্মাতা তাঁকে যা-সব দেখাতেন, মায়ের ইচ্ছানুসারে পরে কিভাবে সেগুলি বাস্তব জগতে ঘটনার রূপ নিত, নিখুঁত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সহকারে তিনি তা লক্ষ্য কবেছিলেন।

এসব দর্শনের যাথার্থ্য জানার ইচ্ছা আন্তবিক হলে আমাদেব আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণ কবতে হবে এবং সেই উচ্চ স্তব থেকে নিজে দেখে-শুনে বিবরণ সংগ্রহ কবতে হবে। বর্তমান যুগে পদার্থবিদ্‌রা পর্যন্ত বলে থাকেন যে, বিশ্বেব একটি বিশেষ স্থান হতে গৃহীত বস্তুজগতেব কোন ঘটনা-বিশেষের বিবৃতিব কোন চবম মূল্য থাকতে পাবে না। 'রিলেটিভিটি'র (আপেক্ষিকবাদেব) এসব প্রবক্তাদের মতে একই বস্তু দেশ ও কালের বিভিন্ন পরিবেশে অবস্থিত দর্শকদের কারো কাছে লাল, কাবো কাছে নীল, কারো কাছে বা হলুদ বলে মনে হতে পারে। আবার পরিবেশের এ বিভিন্নতার জন্য একই ঘটনা কোথাও বর্তমান, কোথাও অতীত, কোথাও বা ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা বলে ধারণা হয়। কাজেই কেউ-ই নিজের কোন পর্যবেক্ষণকে একমাত্র নির্ভুল পর্যবেক্ষণ বলে দাবি করতে পারে না; জড়জগতের বিষয়-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণকেও না। এরূপ দাবি আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে না। জড়জগৎ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের বিবৃতির পক্ষে একথা যদি সত্য হয়, আর আধ্যাত্মিক জগতের যদি কোন বাস্তবতা থাকে, তাহলে বাহ্যজগতের এলাকার কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্গত কোন-কিছুর মূল্য নিধারণ করার জন্য কেউ চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই তার ভেতর ভুলের সম্ভাবনা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে। কাজেই স্থূলবস্তু দেখার উপযোগী কাঠামোর ভেতর থেকে দেখে যথার্থ আধ্যাত্মিক দর্শনকে মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত দর্শন বলে মনে হলে আশ্চর্য

হবার কিছুই নেই। কিন্তু এভাবে দেখে সেই পর্যবেক্ষণের বিবরণকে চরম মূল্য দেবার দাবি যদি কেউ করে, তাহলে আশ্চর্য লাগে বই কি! পার্থিব ভূমি থেকে যেটাকে মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত দর্শনের মতো দেখায়, আধ্যাত্মিক ভূমি থেকে সেটাকেই আবার বাহ্য জগতের যে কোন ঘটনার চেয়ে—সেখানকার সত্যবস্তুর চেয়ে—অদৃশ্য সত্তার আরো স্পষ্ট, আরো নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিতরূপে দেখা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক তা-ই দেখেছিলেন।

অধ্যাত্মজগতের প্রকাশসমূহ তাঁকে চরম সত্যের দিকে নিকট হতে নিকটতর প্রদেশে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নিজে পর্যবেক্ষণ করে এসব অধ্যাত্মদর্শনগুলির মূল্যনির্ণয় করেছিলেন তিনি; আর তার ভেতর দেখতে পেয়েছিলেন বিশ্বের মূল কারণের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি, যে অভিব্যক্তি মানুষের ভেতর চির আনন্দ, অসীম শক্তি ও বিমল পবিত্রতা সঞ্চার করতে, এমন কি তাকে চরম সত্তার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির একেবারে নিকটে নিয়ে যেতেও সমর্থ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তর্ভেদ করে পদার্থবিদ্‌দের দৃষ্টি যখন চতুর্মাত্রা-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের সামনে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, অধ্যাত্ম-জগতের চেতনার রাজপথ তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিচেতন অবস্থারও অতীত প্রদেশের অতীন্দ্রিয় দর্শনের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলেছিল ;এসময় চরম সত্তাকে নিজেরই স্বরূপ বলে তিনি অনুভব করেছিলেন। এজন্য তিনি মনে করতেন, জাগতিক বস্তুর চেয়ে অধ্যাত্মদর্শনগুলি সত্যের বেশী সন্নিকট। আর এইসব দর্শন হতে অধিকতর আনন্দ ও পবিত্রতা, শক্তি ও জ্ঞানালোক পাওয়া যায় বলে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির চেয়ে তিনি এগুলিকে মূল্য দিতেন বেশী।

পবিত্রহৃদয়োদ্ভূত আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার ভেতর আবার মানের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টারা বিভিন্ন রকমের দর্শন লাভ করেছেন। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি যে সত্যের চরমজ্ঞানের বাহক, তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, পবিত্রহৃদয়স্থিত রহস্য-

দ্বারোদ্ঘাটনকারী স্বজ্ঞাও মানুষকে জ্ঞানের চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারে না। চরম সত্য বাক্য-মনের অতীত, স্বজ্ঞা তার আভাস মাত্র দিতে পারে। তিনি দেখেছিলেন, এই স্বজ্ঞা চরমজ্ঞানলাভের সোপান মাত্র। বিচারবুদ্ধি ও স্বজ্ঞা উভয়কেই ছাড়িয়ে যাবার পর (মনে প্রতিভাত জগন্মাতার জীবন্ত মূর্তিকে জ্ঞান-অসি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা-রূপ রূপকের মাধ্যমে তিনি যার বর্ণনা দিয়েছিলেন) মানুষের চেতনা সমস্ত সীমার রাজ্য ছাড়িয়ে যায় এবং বিশ্বের অন্তর্নিহিত চিরবিদ্যমান, অপরিবর্তনীয়, নাম-রূপহীন চরম সত্যের সঙ্গে নিজের পূর্ণ একত্ব অনুভব করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "একটা কাঁটা দিয়ে আর একটা কাঁটা তুলতে হয়, তারপর দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" বিদ্যামায়ার বা আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার রচিত দর্শন দিয়ে ইন্দ্রিয়জ-অনুভূতি-সঞ্জাত দুঃখের পীড়নের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার পর স্বজ্ঞাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যদর্শনের রাজ্য ছাড়িয়ে উঠে যেতে হবে, তবেই জীবাত্মা (পৃথক পৃথক মন-বুদ্ধ্যাদিতে সীমিত 'আমি'-বোধ) পরমাত্মার (নিত্য সত্তার) সঙ্গে নিজের অভেদত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

সাকার-ঈশ্বর-দর্শন-রূপ মহান্ সিঁড়ি বেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সসীম ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের সহিত একত্বের অনুভূতির ভূমিতে উঠেছিলেন। জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞানের বিষয় এক অবিভাজ্য অস্তিত্বে মিশে গিয়েছিল, চরম সত্তার সঙ্গে নিজের একত্বানুভূতিতে দ্বৈতবোধ আনার মতো কোন কিছুর অস্তিত্ব আর ছিল না সেখানে। কিন্তু দেশ কাল ও কার্য-কারণ-সম্পর্কের অতীত পরম সত্তাকে মানুষের যুক্তি স্বজ্ঞা বা কল্পনার বিষয়বস্তু করা যায় না কখনো। সেজন্য এদিক দিয়ে ভাবলে তাঁকে জানা কখনো যায় না। তবু পরম সত্তা তাঁর কাছে জ্ঞাত হওয়ার চেয়ে বেশী কিছু হয়েছিল, কারণ তাঁর নিজের চেতনা সেই সত্তার সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানাতীত সত্তা তাঁর

কাছে দার্শনিকের বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্ত বা গাণিতিক সিদ্ধান্ত বা কবির কল্পনা মাত্র ছিল না,—মুহুর্মুহুঃ সেই নামহীন রূপহীন সত্যের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে তাঁর কাছে সে-সত্য বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই অনুভূতিতে অসংখ্য সত্যদ্রষ্টাকর্তৃক উপলব্ধ অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তিস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমর্থিত হয়েছে। পরম সত্তাকে মানুষের উপলব্ধিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনার নিশ্চিত ইঙ্গিতও রয়েছে এতে। রবীন্দ্রনাথ 'রিলিজন অব ম্যান' বিষয়ে তাঁর ১৯৩০ সালের হিবার্ট বক্তৃতায় একথা সমর্থন করেছেন, "যোগসাধনার মাধ্যমে মানুষ-ভাবের সর্বশেষ সীমাও অতিক্রম করে মানুষ যে পরব্রহ্মের সঙ্গে অখণ্ড একত্বানুভূতিরূপ শুদ্ধচেতনায় নিজেকে লীন করে দিতে পারে, তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের দেশে। এ বিশ্বাসকে প্রতিবাদ করার অধিকার কারো নেই; কারণ বিচারের কথা নয় এ, এ হল প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। স্বল্পকালের জন্য সমাধিলাভ করার—অনন্ত সত্তায় নিজেকে পরিপূর্ণরূপে মিশিয়ে দেবার— এক বর্ণনাতীত অবস্থা লাভ করার মতো ক্ষমতার অধিকারী পুরুষ যে বহু রয়েছেন, ভারতে একথা বহুজন-বিদিত।" অখণ্ড দ্বৈতাভাসবিবর্জিত চরম সত্তার সঙ্গে একীভূত হওয়ার এই অনুভূতিই যে জ্ঞানের চরম অবস্থা, তাতে সন্দেহের আর আছে কি? শ্রীরামকৃষ্ণের মতো যখন কেউ স্থূল জগতের ও চিন্তাজগতের আবরণ ভেদ করে 'পেঁয়াজের খোসার' মতো একটার পর একটা ছাড়াতে ছাড়াতে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের মর্মস্থলে পৌঁছয় এবং চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, তখন আপেক্ষিক অস্তিত্বের ভূমিতে ফিরে আসার পর উপনিষদের ঋষিদের এই অবিসংবাদিত বাণীর সমর্থন সে করবেই, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (সত্য এক, মুনিগণ নানা নামে তাঁকে অভিহিত করে থাকেন)।

তাছাড়া বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার ধরাছোঁয়ার সীমার অতীত এ অনুভূতিলাভ করেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে তাঁর ভাবাবস্থাকালীন দর্শনগুলির যথাযথ

মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। নিষ্কলঙ্ক মন রূপ স্বচ্ছ ত্রিকোণাকার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা সেই একই পরব্রহ্মের আভাস বলে তিনি সাকার ঈশ্বরের রূপদর্শনগুলির মূল্য দিতেন। বিভিন্ন ধর্মপথ ধবে ভগবদন্বেষণকালে অতি স্পষ্টভাবে তিনি ঈশ্বরের অসংখ্য রূপ দর্শন কবেছিলেন; এগুলির ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখেছিলেন যে এসব দর্শনগুলির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে শুধু বর্ণে ও আকারে, নামে ও রূপে, কিন্তু সত্তাব দিক থেকে দেখলে সবই এক, এতটুকুও তফাত নেই। এসব দর্শনেব সবগুলিব মধ্যেই জ্ঞানাতীত চরম সত্তার অভ্রান্ত অনুভূতি তিনি লাভ করতেন। নিরাকার পবব্রহ্মই তাঁর পবিত্র মানসে ঈশ্বরীয় রূপ পবিগ্রহ কবে প্রকাশিত হতেন। স্পষ্ট দেখতেন তিনি, জল ও বরফের মধ্যে যা প্রভেদ, নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ঈশ্বরের মধ্যে প্রভেদ তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। আর সাকার ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপদর্শনকালে দেখতেন, যেন একই ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এজন্য জোর করে তিনি বলতে পারতেন যে, স্বজ্ঞাসহায়ে সাকার ঈশ্বরকে বিভিন্ন মূর্তিতে দর্শনের সময় ভক্তেরা একই শাশ্বত সত্যের জীবন্ত স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে যান। গাছতলায় সব সময় বসে থেকে বহুরূপীর বিভিন্ন রূপের সবগুলিই যে লক্ষ্য করেছে, নিজের গল্পের সেই লোকটির মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ সমর্থন করে গেছেন—বহুরূপীকে মাত্র একটা অবস্থায় যারা দেখেছে সেসব পর্যবেক্ষণকারীদের বিভিন্ন একদেশদর্শী ধারণাগুলিকে। কাজেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ—এগুলির যে-কোনটির ওপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা অন্য যে-কোন সম্প্রদায়ের ধর্মমতই—সব ধর্মমতই—একই লক্ষ্যাভিমুখী বিভিন্ন পথগুলিব মধ্যে অন্যতম পথ। তিনি বলে গেছেন, বিশ্বের যিনি মূল কারণ, যিনি শাশ্বত মূলাধার, অসংখ্যরূপে প্রত্যক্ষগোচর হওয়া সত্ত্বেও যিনি এক এবং অভিন্ন, সেই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ-দর্শনরূপ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে এই পথগুলির প্রত্যেকটিই সমভাবে সমর্থ।

তাছাড়া তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি যুক্তির বিরোধী তো হয়ই নি, বরং তার পরিপূরকই হয়েছে। তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি ইন্দ্রিয়ের অগম্য প্রদেশ থেকে তথ্য আহরণ করে এনে বুদ্ধির কাছে তা ন্যস্ত করে দিত, বুদ্ধি সেগুলি ভালভাবে যাচাই করে নিয়ে তার ভেতর থেকে সর্ববিধ প্রকাশের পশ্চাতে অবস্থিত মূলগত একত্বকে আবিষ্কার করে নিত। এভাবে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ববিধ বৈচিত্র্যই (যাকে আমরা প্রকৃতি বলে থাকি) সেই একই চরম সত্তার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, যে অভিব্যক্তির শীর্ষদেশ হচ্ছে সাকার ঈশ্বরের বিবিধ রূপদর্শনের রাজ্য, আর নিম্নভাগ হচ্ছে আমাদের এই স্থূলজগৎ। প্রকৃতির অন্তর্গত চেতন-অচেতন সব-কিছুই তাঁর কাছে চিনির পুতুলের মতো দেখাত; আকারগত প্রভূত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলির বস্তুগত সত্তা এক। তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সম্মুখে আবরণ উন্মোচিত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন একটি মহিমময় বৈভবময় একত্ব প্রকাশিত হয়েছিল, যে একত্বে মিলিত হবার জন্য সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত দর্শন ধীর নিশ্চিত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই চৈতন্যময় একত্বের অনুভূতিই শুধু জগৎকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির নির্দেশ দিতে পারে, এবং জগৎকে এমন একটা ভিত্তির সন্ধান দিতে পারে যাকে আশ্রয় করে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অতি প্রয়োজনীয় ইমারতটি গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব।

নিজ দৃঢ়বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে যথাশক্তি দৃঢ়কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করে গেছেন যে, যে-কেউ ইচ্ছা করলেই আন্তরিকভাবে যে-কোন ধর্মসাধনার পথ অনুসরণ করে জগতের ধর্মাচার্যগণের কথার সত্যতা নিজ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে পারে। যখন দেখাই যাচ্ছে যে, অদৃশ্য সত্তার জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটনে বুদ্ধি অপারগ, তখন এ বিষয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে এবং ধর্মের প্রত্যক্ষজনিত প্রণালী অবলম্বন করে চলে তার ফল কি হয় না হয় তা একবার দেখে

নিলে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হবে না। এ সত্ত্বেও অবশ্য যদি কেউ ধর্মকে 'ছেলেমানুষি' ভেবে তাচ্ছিল্য করেন এবং জ্ঞানলাভের উপায়রূপে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও বুদ্ধিজ অনুমানের ওপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে থাকতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের এইসব অসমর্থ উপায়গুলির প্রতি তাঁর প্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও বুদ্ধিজ অনুমান সহায়ে জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছানো যায় না; এ উপায়গুলি মানবাত্মার গভীরতর অটল উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করে পূর্ণত্বলাভের জন্য তার অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটাবার কোন আশার বাণীই শোনাতে পারে না।

বাস্তবিকই, অবিশ্বাসের ঘনায়মান মেঘরাশি অপসারণ করে চিরন্তন সত্যের প্রতি আস্থার আলোকে মানবজাতির অন্তর আবার উদ্ভাসিত করে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এরূপ সদ্য-আহৃত, ভাস্বর, নিখুঁত ও বিপুলপ্রসারী আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী একজন সত্যদ্রষ্টার একান্ত অভাব জগৎ অনুভব করে এসেছে। মানবজাতির ইতিহাসের ঠিক সন্ধিক্ষণেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। মানবসভ্যতা এখন একটা যুগ-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলেছে, যখন প্রাচীন ধারাগুলি সব অতি দ্রুত পালটে যাচ্ছে। স্বাধীন চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াগুলি আজ সত্যদ্রষ্টা আচার্য ও শাস্ত্রের চিরাচরিত প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যুগ-যুগান্তের আদর্শ ও ভাবধারা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে; যুক্তিনির্ভর জিজ্ঞাসার নব মূল্যায়নের ও নব সংস্কারের একটা ধারা সবদিকেই বয়ে চলেছে।

প্রায় কুসংস্কার-পর্যায়েরই একটা বিশ্বাসের হাওয়া বয়ে চলেছে যে, বিশ্বের যাবতীয় রহস্যের দ্বারই বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করবে; আর যুক্তিবাদী দর্শন বিজ্ঞানকর্তৃক আবিষ্কৃত তথ্যগুলির ব্যাখ্যা করে সৃষ্টির পশ্চাতে যে পরিকল্পনা উদ্দেশ্য ও সত্তা বিদ্যমান, তার যাথার্থ্য নির্ধারণ করবে। কাজেই অনেকে মনে করেন, ধর্ম বলে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, সেটা মানবজাতির অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন যুগে উদ্ভূত একটা প্রয়োজনহীন বিষয় ছাড়া

আর কিছুই নয়; আর এরকম ধর্মের ভেতর কতকগুলো যুক্তিহীন শাস্ত্রীয় উপদেশ ও অর্থহীন ক্রিয়াকলাপের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না বলে তাঁদের ধারণা যে, ধর্ম কল্পিত জগৎ নিয়েই ব্যস্ত, চোখের সামনে যে জীবন্ত কঠিন বাস্তব পড়ে আছে তার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই আধুনিক জগতের কোন কিছুর সঙ্গে ধর্মকে খাপ খাওয়াতে তাঁরা রাজী নন। তাঁদের মতে ধর্মের স্থান হতে পারে একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে, বর্বর অতীতের নিদর্শনরূপে। প্রাচীন প্রতীক ও আদর্শবাদ এখানে একেবারে অচল; আধুনিকদের যদি বা কোন ধর্মের প্রয়োজন হয়, তবে তা হবে বিজ্ঞানের ও দর্শনের (বুদ্ধিজ) চিন্তাধারা-উদ্ভূত, রহস্যের অতিপ্রাকৃতিকতার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না তার।

মূলতত্ত্ববাদী (ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট) নামে সম্প্রদায়গত ধর্মে বিশ্বাসী আর একদল লোক আছেন অবশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, তাঁদের অধিকাংশই ধর্মের বাহ্যিক দিকটা ছাড়া তার আর কোন দিকে নজর দিতে চান না। নিগূঢ় মূলগত আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সন্ধান পাবার মতো অন্তর্দৃষ্টিও তাঁদের নেই বললেই চলে। আধ্যাত্মিক সত্যোপলব্ধি হতে বঞ্চিত থাকার জন্য তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অনুশাসনগুলি একগুঁয়েমি করে আঁকড়ে পড়ে থাকেন, তার বাইরে আর কোন কিছুর দিকে চোখ ফেরাতে চান না। তাঁদের ধর্মমতকে সমালোচনামূলক জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করাতে বা যুক্তিসম্মত করে তুলতে অপারগ হয়ে প্রায়ই তাঁরা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জোরে যুক্তি ও সাধারণ-জ্ঞানের ওপর তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করে থাকেন। একথা তাঁদের ধারণাতেই আসে না যে, "ধর্মের ভেতর থেকে সমালোচনার ভাব বিসর্জন দেওয়া মানেই হচ্ছে পরাজয় বরণ করা।" তাছাড়া প্রত্যেক দলই নিজ ধর্মমতকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকেন, আর ভাবেন যে তাঁর নিজের ধর্মমতের ভেতরেই দুনিয়ার সব আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে, আর কোথাও কিছু নেই। এই অযৌক্তিক সঙ্কীর্ণ ও গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গীর

ফলেই বিবিধ সম্প্রদায়গত মতবাদগুলি মানবজাতিকে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করেছে। এভাবে ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে মানব-জাতির ভেতর দুটো ভাগ হয়ে গেছে—একটা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচারীর দল, আর একটা ধর্মোন্মাদের দল। একদিকে রয়েছে অপ্রতিহত যুক্তি, আর একদিকে আছে জ্ঞানালোকহীন চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস।

শুধু ধর্মের বেলাই নয়, অতীতের সমগ্র জ্ঞানরাশির ওপর স্বাধীন চিন্তার প্রচণ্ড ও বেপরোয়া মুহুর্মুহুঃ আঘাতের ফলে সমাজসৌধের সব ঘর-গুলিই আজ ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছে। চিরাচরিত নীতিজ্ঞানের রং ও সীমারেখা দুই-ই দ্রুতগতিতে অস্পষ্ট হয়ে আসছে, একেবারে লোপ পেয়ে যাবার আশু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা ; 'পুরানো ও মরচে-ধরা' 'সতীত্ব' কথাটাকেই উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন কেউ, কেউ বা চাচ্ছেন মানব জীবন-ধারার বাধাবন্ধহীন যৌন-মিলনের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। আবার কেউ বা একান্তভাবে চেষ্টা করছেন মানুষের পোশাক পরার ঝামেলাটা একেবারে বাদ দিয়ে চলা যায় কিনা তা দেখতে। মানুষের ভেতর সর্বত্রই নতুন কিছু করার একটা উন্মাদনা এসে গেছে—নতুন দুঃসাহসিক একটা কিছু করতে হবে—যত বীভৎস, যত উচ্ছৃঙ্খল, যত উদ্ভটই তা হোক না কেন।

অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা চোখে পড়ে। ভগবান, ধর্ম, নীতিজ্ঞান, পরোপকারপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয়ের সর্ববিধ চিন্তাকেই জোর করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এসব ক্ষেত্র থেকে। সমস্ত মহৎ আদর্শকে সরিয়ে দিয়ে কৌশল ও উপযোগিতার নামে স্বচ্ছন্দে তার জায়গায় এসে বসেছে দম্ভ, হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা ও কপটতা। জাতীয় স্বার্থরূপ রক্তলোলুপ দেবতাকে তুষ্ট করতে হবে, তার তৃপ্তির জন্য মানব-জাতির শরীর থেকে সবটুকু রক্ত বের করে নেওয়া চাই। বিভিন্নমুখী পরস্পরবিরোধী জাতীয় স্বার্থগুলির সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গোটা

পৃথিবীটাকেই একটা চিরস্থায়ী রণভূমিতে পরিণত করে তুলতে চলেছে। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর উক্তিই সত্য—"গোটা মনুষ্যজাতিই ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে উঠেছে এবং দেশ জাতি ও সম্প্রদায়গুলির পরস্পরের ভেতর যুদ্ধের আগুন হয় লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠছে, আর না হয় ধূমায়িত হচ্ছে ছাইচাপা পড়ে।"

অতীতের সব কিছু অভিজ্ঞতাকে এভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে আমাদের সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবকিছু পারিপার্শ্বিককে আমরা দোলায়মান, বিশৃঙ্খল ও জটিল করে তুলছি। কে জানে, বিবর্তনের চক্রের আবর্তনে এখন নীচের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছি কি না? মানব জাতির একটা অংশে আদিম যুগে ফিরে যাবার অভ্রান্ত লক্ষণ দ্রুতগতিতে ফুটে উঠছে, এরূপ আশঙ্কা করার কারণ অবশ্য যথেষ্টই আছে।

যে জগতে আমরা বাস করছি, এই হল তার মোটামুটি রূপ, আর এমনি একটা জাগতিক পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন চারিদিকের জগতে যা ঘটতে দেখছি, তার বিপরীত ভাবের মূর্ত প্রতীক হয়ে। আধুনিকেরা যেসব জিনিসকে অবহেলা করে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেগুলিকেই মূল্যবান মনে করতেন; তাঁর জীবনধারার এ বৈশিষ্ট্যটি অতি প্রকট। ধর্ম ছিল তাঁর জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, নীতিজ্ঞান ছিল তাঁর মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাঁর দৃষ্টিতে ভগবানলাভই জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য; ভক্তি, পবিত্রতা, আন্তরিকতা, নিঃস্বার্থপরতা, ভালবাসা ও নম্রতাই হচ্ছে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর মতে বহির্জগতের আর সব কিছুর চেয়ে এগুলির মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেশী। আর এ গুণগুলি তিনি তাঁর জীবনে অনন্যসাধারণ পরিপূর্ণতায় বিকশিত করেছিলেন। ভগবদ্ভাবোন্মত্ততার, বিমল পবিত্রতার ও মানুষের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রেমের অনতিক্রম্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় তাঁর জীবনে। আকাশের মতো উদার, বজ্রের মতো দৃঢ় ও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মন নিয়ে তিনি আধ্যাত্মিকতার

অতল গভীরে সঞ্চরণ করে তার পরিমাপ করেছেন, অতীতের সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডারের রত্নরাজি আহরণ করেছেন, আর যাচাই করে সেগুলির প্রত্যেকটিকে খাঁটি বলে সত্য প্রামাণ্য সমর্থন দিয়ে গেছেন। প্রাচীন আচার্যদের বাণীই রূপ নিয়েছে তাঁর জীবনে, তাঁর শ্রীমুখ হতে জগৎ আবার সে বাণী শুনেছে। শাস্ত্রের অর্থ জগৎ আবিষ্কার করছে তাঁর জীবনে। তাঁর জীবন ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষাকে নতুন করে শেখার একটা সুযোগ জগৎ পেয়ে গেছে।

উপনিষদে উক্ত সব সত্যের গভীর ও ব্যাপক আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে হিন্দুধর্মের নবজাগরণের নবযুগের সূচনা করে গেছেন। মনে হয় এর ফলে একটা জগৎজোড়া সর্বজনীন আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের প্লাবন বয়ে যাবে। হিন্দুধর্মের রুদ্ধদ্বার হৃদয়পুরে তিনি এক অপূর্ব উদারতার ভাব আবিষ্কার করেছিলেন, এবং নিজ অনুভূতির মাধ্যমে সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক ও দলগত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতার চিরঅবসান ঘটাবার জন্য নিজ অনুভূতির মাধ্যমে সে ভাবকে মুক্ত করে সারা জগতে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর আবির্ভাব ধর্মের ক্রমবিবর্তনের পথে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছে; এযুগে সব ধর্মমত ও সব সম্প্রদায়ই নিজ নিজ বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও সংকীর্ণ এবং দলগত দৃষ্টিভঙ্গীর ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথ সুগম করে তুলবে।

অধ্যাত্ম-অনুভূতিরূপ বীণার সব পর্দাগুলিতে ঝঙ্কার তুলে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের একটি অপূর্ব ও বিস্ময়কর ঐকতান সৃজন করেছেন; তার ফলে তাঁর জীবন ও উপদেশের প্রতি পৃথিবীর সর্বত্র হাজার হাজার নর-নারীর দৃষ্টি ইতোমধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বাণী সব দেশের সব মানুষেরই হৃদয় স্পর্শ করে। ব্যাবহারিক ধর্মের উচ্চতম প্রাণস্পর্শী সর্বজনীন ভাব ও আদর্শগুলি তাঁর জীবনেই, আচরণের মাধ্যমেই পরিস্ফুট, যা জাতি-বর্ণের বৈষম্যগত মনোভাবের প্রস্তর-কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে

সকল মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে প্রবেশ করে। ফরাসী মনীষী ডঃ সিলভাঁ লেভী এজন্য যথার্থই বলেছিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-মন ছিল সবদেশের লোকের জন্য, কাজেই তাঁর নামও মানব-সাধারণের সম্পত্তি।"

অতএব অবতারবাদে বিশ্বাসী না হলেও মনীষী রোমাঁ রোলাঁ যে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের সমপর্যায়ভুক্ত দেব-মানব বলে মনে করেছেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড-এর মতো অনেকে আবার তাঁকে শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয়বাদী বলে ভাবেন, মানবজাতির আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের অগ্রনায়কদের অন্যতম বলে ভাবেন। তাঁর দৃষ্টি, স্পর্শ বা ইচ্ছামাত্রসহায়ে অপরের ভেতর আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করার অতি-মানবিক ক্ষমতার মাধ্যমে, তাঁর ভক্তি ও জ্ঞান, ত্যাগ ও কর্ম, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতি জীবনের পরস্পরবিরোধী ভাব ও চিন্তার অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে, তাঁর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পবিত্রতার প্রায় অদৃষ্টপূর্ব গভীরতার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) মধ্যে মানুষের স্তরে দেবত্বের সর্বোচ্চ বিকাশ—একাধারে শঙ্করের জ্ঞান এবং বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রকাশ দেখেছিলেন। আর গৌরীকান্ত, পদ্মলোচন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ও ঈশ্বরানুরাগীরা কিভাবে তাঁর মধ্যে অবতারপুরুষের শাস্ত্রীয় লক্ষণগুলির প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করে এসেছি।

বলা শক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইসব ব্যাখ্যাগুলির ভেতর কোন্‌টা সত্যের সবচেয়ে বেশী কাছাকাছি। ব্যাধিনিরূপণ-বিস্তার গবেষণার উপযুক্ত বিষয় হওয়া তো বহুদূরের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বরং নিজ জীবনের মাধ্যমে মানব-জাতির আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য অতি মূল্যবান অবদান কিছু রেখে গেছেন; এবিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও বিশ্বাস জন্মাবার মতো যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসম্মত কারণ যথেষ্টই রয়েছে। আধুনিক ও প্রাচীনপন্থী সাধু-সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণীর যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর সম্বন্ধে যে-সব বিভিন্ন

মত প্রকাশ করে গেছেন, তাতে একটা জিনিস খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, মানবজাতি যখন আদর্শবাদের ঘূর্ণাবর্তে ও বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মকে প্রায় পবিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন জগতের আধ্যাত্মিকতার গগনে অতি ভাস্বব একটি নতুন জ্যোতিষ্কেব মতো সহসা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতিসমুজ্জল জীবনেব আবির্ভাব ঘটে।

এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটির সঠিক অবস্থান ও আয়তন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অতীতের মহাপুরুষগণ যে মণিবত্নময় জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের হাতে ন্যস্ত কবে গেছেন, এব আলোকে তার মূল্য ও তাৎপর্য নির্ণয়ে লেগে পডলে মানবজাতির বোধ হয় বেশী কল্যাণ হবে। এই ভাস্বব জীবনের উজ্জ্বল প্রভায় সব ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল যুক্তি এবং সব ধর্মের অমূল্য সত্যগুলি উদ্ভাসিত হয়ে চোখে পড়ছে, এবং মনে হয় এই আলোকোদ্ভাসেব ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ওপর নির্ভবশীল আধুনিক মতাবলম্বীদের এবং সব সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদীদের ধর্মের যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে স্থির-বিশ্বাসী করতে পারবে।

একটা জিনিস লক্ষ্য কবে মন উৎসাহে ভবে ওঠে—আধুনিক যুগের প্রখ্যাত চিন্তাশীল কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের একটি দল আধ্যাত্মিকতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঋষি- ও আচার্যপরম্পরাগত জ্ঞান-রাশিকে যুক্তিসম্মত বলে বোঝাবার প্রয়াসে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন ; যদিও, সন্দেহ নেই, তাঁদের কণ্ঠ এখন অতি মৃদু। চূড়ান্ত জড়বাদের অভিমুখে মানব-জাতির উন্মত্ত অভিযানের হট্টগোলে তাঁদের কণ্ঠস্বব এখন শোনা যাচ্ছে না বলেই মনে হয়। কিন্তু যুক্তির এ বাণীকে বেশী দিন তাচ্ছিল্য করে চলতে পারবে না কেউ। যত দিন যাবে, এর গভীরতা ও প্রসার ততই বেড়ে চলবে এবং ক্রমেই আধিকসংখ্যক লোক কান দেবে সে-কথায়। এ কণ্ঠস্বর যত বেশী শ্রুতিগোচর হবে,মানবজাতি ততই এগিয়ে যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য ঠিকমতো ধারণা করার দিকে ; ততই সে বুঝবে যে, বর্তমান যুগে সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার পঙ্কিল অংশ থেকে উঠে আসতে

মানবজাতিকে সাহায্য করবার জন্য এবং জগৎজোড়া একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণের পথে তাকে চালিত করবার জন্য মানবজাতির ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আলোকস্তম্ভের মতো আবির্ভূত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এ জীবন মানবসভ্যতার ঊর্ধ্বগামী পথকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই তাৎপর্য যথাযথভাবে ধারণা করে জগতের কাছে সেই গৌরবময় ভবিষ্যতের আনন্দ-সংবাদ উদাত্তকণ্ঠে পরিবেশন করার ভার ন্যস্ত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুবকভক্তগণের মহান্ নেতা স্বামী বিবেকানন্দের স্কন্ধে।

৩

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি

বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণেরই কর্মবেগময় প্রতিরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নরেন্দ্রনাথের ভেতর প্রসুপ্ত লোকনায়ককে দেখতে পেয়ে গুরুভাইদের তত্ত্বাবধানের গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন, মানবসেবায় পরিপূর্ণরূপে নিজজীবন উৎসর্গ করার জন্য কিভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সবশেষে কিভাবে নিজের সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁর ভেতর সঞ্চারিত করে নিজে তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, তা আমরা লক্ষ্য করে এসেছি। আরো দেখেছি, এই বিবেকানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের গভীর তাৎপর্যগুলি ধরতে পেরেছিলেন, এবং তা প্রচার করে গেছেন প্রায় সারা জগৎ জুড়ে।

নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীগুলি যাচাই করে নিয়েছিলেন তিনি; তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসে লব্ধ সেই সব অমূল্য বাণীগুলি তিনি নিজ অনুভূতিসঞ্জাত সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে, সহজ সরল প্রকাশে তুলে ধরেছেন জগতের সমক্ষে। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অবলম্বনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনকে উন্নত করার উপযোগী কতকগুলি মূল্যবান ও কার্যকর সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহধারণ করেছিলেন নিজ অনুভূতিসহায়ে শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত যুগযুগ-প্রচলিত সাধনপ্রণালীগুলিকে নতুন করে সমর্থন করার এবং সেগুলিকে ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে নির্দিষ্ট করার জন্য; আর বিবেকানন্দ এসেছিলেন জগতের কাছে সে বাণীর ভাষ্য করে দিতে।

ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের জন্য আন্তরিক ধারাবদ্ধ প্রচেষ্টাই মানবসভ্যতার মূল গাঁথুনি হওয়া কিজন্য প্রয়োজন, তা বুঝিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। আর, কিভাবে তা করতে হবে, তা দেখিয়ে দিতেও। মনুষ্যহৃদয়ের গভীরতর প্রদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পন্দনগুলি বিশ্লেষণ করে, তার সমস্ত সংশয় ও দ্বিধা তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করে তিনি মানুষের অকৃতকার্যতা ও অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কারণ কি তা খুঁজে বের করেছিলেন। তাছাড়া মানবজাতির উন্নতির বহুশতাব্দী-বিস্তৃত চলার পথ সবটাই তিনি নিবিষ্টমনে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, তার ক্রমান্বয় উত্থান-পতনের কারণ অন্বেষণ করেছেন, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণগুলি তুলনা করে দেখেছেন এবং বিশুদ্ধ যুক্তির নিক্তিতে মানবসভ্যতার বিভিন্ন আদর্শগুলি ওজন করেছেন। আর, কোন্ পথে চললে মানবজাতি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যে উপনীত হতে পারবে, এই সব তথ্যসহায়ে তা আবিষ্কার করে মানুষকে সে পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন।

শিষ্যের কথার ভেতর দিয়ে জগৎ তাঁর গুরুর কথাই শুনেছে; মানবজাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সম্পর্ক কোথায়, তা ক্রমে সে বুঝতেও পারছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বিবেকানন্দের জীবন মিলে কার্যতঃ একটি পরিপূর্ণ জীবন গড়ে উঠেছে। শিষ্য যেন গুরুরই কর্মবেগময় প্রতিরূপ। গুরুর জীবন যেন বেদ, আর তাঁর যোগ্য শিষ্যের জীবন সে বেদের যথোপযুক্ত ভাষ্য এবং ব্যাবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ-গ্রন্থ।

বাস্তবিক, হিন্দুপুরাণের ভগীরথের মতো বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার স্বচ্ছ সঞ্জীবনী ধারা নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের গগনোপম উচ্চতা ও নিভৃততা থেকে; আর, অসুস্থতার আকর যা কিছু ক্লেদ, দূষিত চিন্তার যা কিছু খানা-খন্দ, তা সবই ভাসিয়ে দিয়ে নতুন, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা আধ্যাত্মিক জীবন-সিঞ্চনে ধরণীকে উর্বরা করে দেবার

জন্য সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাষাণ-কারা ভেঙে সে স্রোতস্বতীকে মুক্ত করে ক্রমবিস্তৃত ধারায় প্রবাহিতা করে দিয়েছেন নিম্নের পাহাড ও উপত্যকার ওপর দিয়ে।

দুর্ভেদ্য পাষাণ

নরেন্দ্রনাথ দত্তের সন্ন্যাস নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় এক অভিজাত ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন তেজস্বিনী, অশেষগুণান্বিতা এবং আচরণে মহীয়সী। পিতা ছিলেন শিক্ষিত, স্বাধীনচিন্তাশীল দয়ার্দ্রহৃদয় ও উদারপ্রকৃতি মানুষ; আডম্বরবহুল জীবন-যাত্রার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল, ররং বলা চলে, একটু অমিতব্যয়ী ছিলেন তিনি। এসব দিক দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গুরুর পার্থক্য অনেক-খানি; কারণ আমরা দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন পল্লীর সারল্যময় পরিবেশে, তাঁর জীবনে পল্লীবাসীর এই সরলতা একটি বৈশিষ্ট্য।

দৈহিক গঠন, মানসিক প্রকৃতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকেও দুজনের মধ্যে ব্যবধান অনেক। শ্রীরামকৃষ্ণ কোমলকায় ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিতে ছিল নারীসুলভ কমনীয়তার প্রলেপ; আর সুদৃঢ়-পেশীময় দেহ, 'প্রমেথিয়াস'-এর মতো দুর্দান্ত শক্তিমান এবং পূর্ণ পুরুষোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। নিয়মিত ব্যায়াম-অভ্যাসের ফলে নরেন্দ্রনাথ কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, দৌড়, অশ্বচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি সর্ববিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। নির্ভয় যথেচ্ছ গতিবিধির জন্য, প্রেমময় হৃদয় ও সহজ সরল আচরণের জন্য সঙ্গীদের ভেতর তিনি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকতেন। যদি বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে খাঁটি ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের বিকাশ ছিল, তাহলে বলতে হবে তাঁর শিষ্যের ভেতর ছিল

যথার্থ ক্ষত্রিয়ের রাজোগুণের লক্ষণ। নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু একটু পার্থক্য ছিল—ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন দেশপ্রচলিত সুরে পর্যটক বাউল প্রভৃতির কাছ থেকে শোনা ভজনগান, আর উৎসাহী বাস্তববাদী নরেন্দ্রনাথ যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ কবে কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপডা শিখতেও শ্রীবামকৃষ্ণদেব রাজী হন নি। এদিকে নবেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় পাস কবেছিলেন। অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভাবলে নবেন্দ্রনাথ কলেজের শিক্ষক ও সহপাঠীদের মুগ্ধ করেছিলেন, একজন দুর্দান্ত তার্কিক বলেও সকলেব কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই কিন্তু ধর্মে তাঁর মতি ছিল। এবিষযে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁব সাদৃশ্য নিশ্চিতই রয়েছে। অপরিণত বয়সে, যখন ছেলেরা খেলার চেয়ে আর কিছুতে বেশী আনন্দ পায় না, তখন নবেন্দ্রনাথ খুবই ভালবাসতেন ভগবানের কোন মৃন্ময়-মূর্তির সামনে ধ্যান করার ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল বসে থাকতে।

কিন্তু যৌবনেব প্রারম্ভে তিনি হাড়ে-হাড়ে যুক্তিপরায়ণ হয়ে উঠলেন। আধুনিক চিন্তাধারায় যুক্তিব প্রাধান্যের সুর তাঁব মনে গভীর রেখাপাত করল। কিছুদিন ধবে তিনি ইংবেজী সাহিত্যের গভীরচিন্তাপূর্ণ বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করলেন। অন্তবে তিনি সত্যান্বেষী ছিলেন, কিন্তু শুধু বিশ্বাস করে কোন কিছু গ্রহণ করাব চিন্তামাত্রেই তাঁর প্রকৃতি বিদ্রোহী হয়ে উঠত। আধ্যাত্মিক বা সাধারণ বিদ্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিবৃতির সত্যতা স্বীকার করে নেবার আগে বিশ্বাসযোগ্য ও সন্দেহাতীত প্রমাণ সহায়ে নিজের যুক্তিকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলে তিনি তৃপ্ত হতেন না। গভীর অভিনিবেশ নিয়ে তিনি রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করতেন, পণ্ডিত ও ধর্মাচার্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন,

শৌখিন ও পেশাদার ধর্মবক্তাদের কাছে অতি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলতেন, কিন্তু জীবন ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনের অকপট সন্দেহের অন্ধকার দূর করার মতো যথেষ্ট আলোর সন্ধান কোথাও পেতেন না। তিনি দেখলেন, তাঁর প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার তৃষ্ণা মেটাবার পক্ষে অজ্ঞেয়বাদ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদ যথেষ্ট নয়; আদর্শবাদও তাই। সেজন্য, তৎকালে স্বমহিমায় সমাজের শীর্ষারূঢ় কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয় মার্জিত ও যথেষ্টপরিমাণে খৃষ্টান-ভাবাপন্ন মতবাদের কাছে তিনি কিছুদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সত্যান্বেষী মনের তীব্র আকুলতা এই জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত মতবাদের সব-কিছুর সঙ্গে আপস করতে পারল না; সত্যসত্যই তিনি কিছুকাল হতাশার যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েছিলেন। অস্থির হয়ে তিনি মহানগরীর সুযোগ্য ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেড়াতে লাগলেন; কিন্তু কারো কাছ থেকে এমন কিছু পেলেন না যাতে ভগবানের অস্তিত্বে ও মানুষের পূর্ণতালাভের সম্ভাবনায় তাঁর মন নিঃসংশয় হতে পাবে।

এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে যখন বয়সের তুলনায় অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান, যুক্তিপরায়ণ এই সত্যান্বেষী যুবক সন্দেহবাদের প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন হঠাৎ একদিন এক ব্রাহ্মভক্তের গৃহে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ঘটনা এটি; নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সবে আঠারো পার হয়েছে এবং প্রায় বছর দুই হবে তিনি কলেজে পড়তে শুরু করেছেন। নরেন্দ্রনাথের ভজন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং নিজ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহায়ে তাঁর মধুনিস্যন্দী সঙ্গীতলহরীর অন্তরালে এমন একটা কিছুর সন্ধান পেলেন যাতে তাঁর নিশ্চিত ধারণা জন্মাল যে, উল্কার মতো দুর্বারগতি এই যুবকটির অন্তরে বিপুল শক্তি বিকাশের সম্ভাবনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিমন্ত্রণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই তাঁকে নিজের

গণ্ডির ভেতর টেনে নিলেন। নরেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের সব কিছুর সম্ভাবনাই নিহিত ছিল এই দৈবঘটিত সাক্ষাৎকারটির মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার পরে তাঁদের আধ্যাত্মিক মিলনে পরিণত হয়। এই মিলনকে যেন প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বীর্যদৃপ্ত যুক্তির এবং রহস্যবাদের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদের মিলনের প্রতীক বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েরই দেহ ভারতীয় হলেও সে-দুটি দেহের অভ্যন্তরে ছিল বিভিন্ন ধাঁচের সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্বরূপ দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। একজন সহজ বিশ্বাসে আঁকড়ে ছিলেন প্রাচীনকালের শাস্ত্রোক্ত আদর্শবাদকে, আর একজন উঠে পড়ে লেগেছিলেন সর্ববিধ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। পরস্পরের সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রাচ্যভাবের মূর্ত প্রতীক, আর নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্যভাবে অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত। এ-দুটি আত্মার পরবর্তীকালীন মিলনের কথা ভাবলে 'কিপলিং'-এর রূঢ় অযৌক্তিক ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথাই মনে জাগে, যদিও তা ভাবের দিক থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। শাস্ত্রসমূহের ও আচার্যগণের উক্তি যে সবই সত্য, তা তিনি পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে প্রমাণিত করেছেন। ইন্দ্রিয়- ও বুদ্ধি-সঞ্জাত জ্ঞানের চেয়ে স্বজ্ঞা-সঞ্জাত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতেন তিনি বেশী। এই তিনটি বৃত্তিই নিজ নিজ যোগ্য অধিকারের সীমায় সক্রিয় থেকে সমপরিমাণ সাবলীলতা ও ত্রুটিহীনতা নিয়েই তাঁকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করেছিল। এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছিল রহস্যময় বিশ্বের একটি বৃহত্তর, সুসমঞ্জস, অখণ্ড, দিব্য আলেখ্য। এই দর্শনের ফলে তাঁর হৃদয়ে প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর অফুরন্ত নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। গভীর ও বিপুলপ্রসারী জ্ঞানের আকর তাঁর শান্ত, প্রসন্ন, প্রেমময় চিত্ত বাস্তবিকই পূর্ণতালাভের পরাকাষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁর প্রত্যয়ের কথা চিন্তা করলে উপনিষদের সেই দিব্যভাবাবিষ্ট ঋষির কথাই মনে পড়ে, যিনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন সমস্ত প্রাণীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ এবং যত দিব্যধামবাসিগণ, তোমরা সকলেই শোন: মহা অজ্ঞানান্ধকারের পারে যে জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষ রয়েছেন, আমি তাঁকে জেনেছি; একমাত্র তাঁকে জানলে তবে মৃত্যুকে জয় করা যায়, অমৃতত্বলাভের দ্বিতীয় আর কোন উপায় নেই।" সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজজীবনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর জীবন ভারতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার আদর্শেরই প্রতিমূর্তি।

অপর দিকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনকালে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্যের অনুসন্ধিৎসা-সচেতন, বিশ্লেষণপরায়ণ, বিচারপ্রবণ, সত্যান্বেষী ও তেজস্বী ভাবের মূর্ত প্রতীক। যুক্তির পূজারী ছিলেন তিনি; সম্প্রদায়গত ধর্মানুশাসন, ভাবাতিশয্য ও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না তাঁর। ভাবাবেশে ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শনকে বিকারগ্রস্ত লোকের ভুল দেখার চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারতেন না তিনি। তিনি যে সত্যের সন্ধানী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই; তবে আধ্যাত্মিকতালিপ্সু মুমুক্ষু কোন ভারতীয় সাধকের চেয়ে বরং কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ও কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর ভাব ও অনুসন্ধিৎসার সাদৃশ্য ছিল বেশী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একনিষ্ঠ চিন্তাধারা-প্রদর্শিত বুদ্ধিবৃত্তির পথে অশেষ প্রয়াসে অক্লান্তভাবে তিনি বহুদূর পর্যন্ত বিচরণ করেছিলেন পাশ্চাত্যদর্শনের বিভিন্নশাখার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন; এবিষয়ে সমালোচনাসম্ভূত একটা স্পষ্ট ধারণাও তাঁর হয়েছিল। এমন কি যুক্তিমূলক চিন্তাধারার বিখ্যাত প্রবর্তক হার্বার্ট স্পেনসারের নিকট তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিজের মৌলিক সমালোচনা পাঠাবার মতো অতি-সাহসিকতাও তাঁর ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা পড়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অশুভ দিকটা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠেছিল—যার

ফলে ব্রাহ্ম আস্তিক্যবাদের চাকচিক্যময় বাহ্যপ্রলেপটি তাঁর মন থেকে উঠে গিয়েছিল, আর সেজন্য অন্তরে আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড। একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারে এমন কোন ভাব বা অনুপ্রেরণা লাভের আশায় পাশ্চাত্য-চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থগুলির ভেতর থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখতে লাগলেন তিনি ; শেলীর ভাবোচ্ছল সর্বেশ্বরবাদ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের আধ্যাত্মিক আনন্দোচ্ছ্বাস থেকেও কিছু পাবার চেষ্টা করেছিলেন। বেদান্তের শুদ্ধ অদ্বৈত ভাবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, হেগেলের বিষয়তান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীরূপ ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শ নিয়েও কিছুকাল ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন তিনি। কিন্তু এসব ভাবের কোনটাতেই তিনি স্থায়ী তৃপ্তি পেলেন না ; বরং জীবনের সত্যতা সম্বন্ধে সান্ত্বনাপ্রদ একটা চিন্তাধারার জন্য তাঁর অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে তাঁর বিশুদ্ধ বিচারশক্তি তাঁকে টেনে এনেছিল চিরনাস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রায় সমপর্যায়ে। ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ এসেছিল তাঁর এবং প্রসিদ্ধ ঋষিমুনিদের দিব্যদর্শনাদির কথায় সহজে বিশ্বাস করার মতো মনোভাবও তাঁর ছিল না। এই তরুণ উৎসাহীটির হৃদয় যে প্রবল বাত্যায় উত্তালতরঙ্গান্দোলিত হচ্ছিল, তা কোন হিন্দু সাধকের ঈশ্বরলাভার্থে আকুল আগ্রহের ঝড় নয়, তা হচ্ছে অসীম শান্তি ও অগাধ জ্ঞানলাভের উন্মত্ত ব্যাকুলতার ঝড়। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুর তৎকালীন প্রতিভূস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের গণ্ডির ভেতর নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ যখন এসে পড়লেন, তখন তিনি ছিলেন সর্ববিধ আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তাধারার সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কৃষ্টিসম্পন্ন একজন খাঁটি আধুনিক বলতে যা বোঝায়, তাই।

এর অল্প কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ এই ঋষির আবাসস্থলের পবিত্র পরিবেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং আধুনিক চিন্তার শাণে ঘ'সে

ঘ'সে তিনি অতি যত্নে যে বিচারের ছুরিকাখানি শাণিত করে রেখেছিলেন, তা দিয়ে তাঁকে চিরে চিরে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। সমালোচনার সব বৃত্তিগুলিকে সজাগ রেখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে চললেন তিনি, তাঁর কথা ও চিন্তা অতি সাবধানে ওজন করে দেখতে লাগলেন, এবং যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করে খতিয়ে নিতে লাগলেন তাঁর প্রতিটি আচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে সোজাসুজি তিনি তাঁর আন্তরিক ও চরম প্রশ্নটি সংক্ষেপে খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করলেন— "ভগবানকে আপনি দেখেছেন কি?" এতদিন ধরে সত্যদ্রষ্টা বলে পরিচিত লোকদের কাছে এই প্রশ্ন করে তিনি যে নেতিসূচক, সংশয়যুক্ত বা বাঁকা উত্তর পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেরূপ উত্তরই আশা করেছিলেন এখানেও। এবার কিন্তু এই যুক্তিবাদীকে স্তম্ভিত হতে হল অপ্রত্যাশিত, অতি স্পষ্ট, নিশ্চয়াত্মক, ক্ষিপ্র-প্রদত্ত উত্তর শুনে — "হ্যাঁ, দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি তেমনি ভাবে, আরো অনেক বেশী স্পষ্টভাবে দেখি তাঁকে।" অবাক হয়ে নরেন্দ্রনাথ শুনে চললেন, "ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়; তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়— যেমন তোকে দেখছি, তোর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা করতে চায় বল? লোকে স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পদের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবানলাভের জন্য ক'জন সেভাবে কাঁদে? ভগবানের জন্য আন্তরিক-ভাবে যদি কেউ কাঁদে, নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখা দেবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-নিঃসৃত এই সহজ স্পষ্ট স্বতস্ফূর্ত উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথের বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে, অকপট দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ এসব কথা বলছেন। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সব কথা মেনে নিতে তখনো তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময় তাঁর যে ধারণা জন্মেছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "এই সর্ব-প্রথম একজন মানুষকে দেখলাম যিনি বুক ফুলিয়ে বললেন যে, তিনি ভগবানকে দেখেছেন; বললেন যে, জগৎকে যেভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তার চেয়ে আরো অনন্তগুণ বেশী নিবিড় করে ধর্মের সত্যতা প্রত্যক্ষ

করা যায়, অনুভব করা যায়। তাঁর মুখে একথা শুনে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে তিনি সাধারণ ধর্মপ্রচারকের মতো কথা বলছেন না, নিজ অনুভূতির গভীরতা থেকেই বলছেন।"

এই ঋষির আধ্যাত্মিক দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত গভীর শ্রদ্ধার ভাব উদিত হওয়া সত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন তাঁকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বিপুল ভালবাসায় প্লাবিত করলেন, বহুদিনের পরিচিত একান্ত প্রিয়জনের মতো অতি পরিচিতকণ্ঠে আপ্যায়িত করলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের বর্তমান পার্থিব জীবনের সঙ্গে পূর্ব-সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করে কতকগুলো দুর্বোধ্য, অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় কথা সারাক্ষণ ধরে বলে চললেন, সেদিন নরেন্দ্রনাথের বাস্তববাদের ছাঁচে গড়া মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগেছিল। সেসব কথাগুলো তাঁর কাছে অর্ধোন্মাদের প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল। অবশ্য এই ঋষিকে একজন অতি পবিত্র, অটলবিশ্বাসী, প্রেমার্দ্রচিত্ত খাঁটি মানুষ বলে ধারণা করতে তাঁর বিলম্ব হয় নি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ ধারণাও হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় কোথাও একটা 'স্ক্রু' ঢিলে আছে। এই শুদ্ধসত্ত্ব যোগীর অতুলনীয় পবিত্রতার জন্য তৎপ্রতি অসীম শ্রদ্ধার ভাব এসেছিল তাঁর মনে, আবার সেইসঙ্গে তাঁর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের ভাবেরও উদয় হয়েছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই দুই ভাবের মিশ্রণ-সম্ভূত একটা ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে নরেন্দ্রনাথ সেদিন বাড়ি ফিরলেন। এই সাধুটির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাতের সময় যে অভিনব ও পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তাতে স্বভাবতই তাঁর পর্যবেক্ষণ-পরায়ণ মনে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল, এবং সত্যান্বেষণের পথে তাঁকে সাহায্য করার মতো যোগ্যতা ও সামর্থ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কতখানি আছে, সে বিষয়ে চিন্তা করে কোন স্থির নিশ্চয়তায় তিনি আসতে পারেন নি।

তবু একটা অকারণ দুর্বার ইচ্ছার প্রেরণায় মাসখানেকের মধ্যেই আবার

তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করার একটা সুযোগ এল তাঁর; ভয়ে অতিমাত্রায় বিহ্বল হয়ে দেখলেন, এই স্পর্শের ফলে চারিদিকের সব কিছুই তাঁর চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে, ঘুরতে ঘুরতে এক মহাশূন্যের গর্ভে লীন হতে চলেছে। তাঁর মনে হল মৃত্যু সম্মুখে, তাই ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "তুমি আমার একি করলে! বাড়িতে আমার মা-বাপ আছেন যে!" দক্ষিণেশ্বরের ঋষিপ্রতিম যাদুকর একথা শুনে মৃদু হেসে নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এখন তবে থাক।" সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ চারিদিকের সব কিছু আবার পূর্বের মতোই দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, আশ্চর্যও হলেন অতিমাত্রায়। এ ঘটনাটি ছাড়া সেদিন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে আর কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। নরেন্দ্রনাথের যুক্তিপ্রবণ মন এই অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন সম্মোহন-শক্তির প্রভাবসঞ্জাত সাময়িক সম্মোহনজাতীয় একটা কিছু বলেই সিদ্ধান্ত করল। নিজের সুদৃঢ় দেহ ও দুর্দমনীয় মনের কথা চিন্তা করে নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তির বিপুলতার কথা ভেবে; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান নি।

এ ঘটনার অতি অল্পদিন পরেই আবার তিনি এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিময় স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হয়ে যান। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনের গভীর প্রদেশ হতে অনেক তথ্য আহরণ করে নিলেন—তিনি আগে কোথায় ছিলেন, কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শরীরধারণ করে এসেছেন, কতদিনই বা স্থূলদেহে অবস্থান করবেন, ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ আগে এবিষয়ে যা জানতেন, আর এখন এভাবে যা জানলেন, তা সবই মিলে গেল। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে নিজ শিষ্যদের বলেছিলেন, "এ অবস্থায় আমি তাকে কয়েকটি

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আত্মসমাহিত হয়ে সে এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। এতে তার সম্বন্ধে পূর্বে যা দেখেছিলাম ও অনুমান করেছিলাম, সে সবই মিলে গিয়েছিল। সেসব কথা এখন গোপন থাকবে। আমি জানতে পেরেছি যে, সে একজন সিদ্ধ ঋষি, পূর্ব হতেই ধ্যানসিদ্ধ; যখনই সে নিজে তা টের পাবে, তখনই দৃঢ়সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে দেহত্যাগ করবে।" বাহ্যজ্ঞান ফিবে আসতে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীবে ধীরে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন; বাহ্যসংজ্ঞাহীন হয়ে থাকাকালীন যা সব ঘটে গেল, তার কিছুই টেব পেলেন না তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্ত্য বিস্ময়কব শক্তি নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে গভীব রেখাপাত কবল। এই ঋষির প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করলেন তিনি। কিন্তু হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হলেও তাঁর বুদ্ধি দৃঢ়ভাবে নিজ স্বাধীনতা রক্ষা কবে চলল, সম্ভাব্য কোন আজগুবি ঘটনায় বোকা বনে যাবার অনুমতি তাকে দিল না। নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, নিজ বিচারপরায়ণ অনুসন্ধানের চালুনিতে খুব ভালভাবে ছেঁকে না নিয়ে শ্রীবামকৃষ্ণের কোন কথাই তিনি মেনে নেবেন না। মা-কালী ও অন্যান্য দেব-দেবী, এমন কি বেদান্তেব নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণখুলে অনেক কথাই বলেন; নরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, এঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজ যুক্তিকে তৃপ্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে এসব বিষয় নিয়েও তিনি মাথা ঘামাবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব বিশ্বস্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁর প্রতিটি কথা বিনাদ্বিধায় বেদ-বাক্যের মতো সত্য বলে মেনে নিতেন, তাঁদের যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাস ও ভাবেব উচ্ছ্বাসকে বিষম ঘৃণার চোখে দেখতেন নরেন্দ্রনাথ। হিন্দুদের বহু আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শকে স্থূল কুসংস্কার ও বর্বর গোঁড়ামি বলে নির্মমভাবে নিন্দা করতেন তিনি, এমন কি হিন্দুশাস্ত্রকে পর্যন্ত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করতে কোন সঙ্কোচ হত না তাঁর। ভাবাবস্থায় দর্শনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মাথা ঠিক থাকে কি না, সে বিষয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন করার

দুঃসাহস তাঁর হত— প্রকাশ্যে খোঁচা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি করে আপনি বুঝলেন যে আপনার অনুভূতিগুলো দুর্বলমস্তিষ্ক-কল্পিত নয়?" তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ প্রশ্নের বাণে শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মন বিদ্ধ করে যন্ত্রণা দিতে মোটেই দ্বিধা হত না তাঁর—"আমাকে এত ভালবাসেন কেন আপনি? দেখে তো মনে হয় মায়ায় আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন; এতে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে আপনার পতনও তো ঘটতে পারে?" শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করার পূর্বে তাঁর গর্বোদ্ধত বুদ্ধি একাধারে 'ভলটেয়ার' ও 'সুইফট'-এর মতো তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ঋষির দিকে দুর্দান্ত অচিন্তনীয় শক্তিতে হৃদয় তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছিল; হৃদয়ের এই গতিবেগ থামাবার জন্যই বোধ হয় বিপুল, অসীমসাহস উৎসাহ নিয়ে তাঁর বুদ্ধি সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। এইকালে প্রবল বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ হৃদয়ের অবিরাম অপ্রশাম্য সংঘর্ষের ফলে নরেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন বিক্ষোভের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। এই হৃদয়ই একদিন মেনে নিতে না পারার জন্য অতৃপ্তিভরে আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার ভাবধারার দিকে তাঁর বুদ্ধির অবাধ গতিপথে বাধা দিয়েছিল; এখন আবার তাঁর বুদ্ধিই বাধা হয়ে দাঁড়াল ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নেবার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-প্রকাশের পথরোধ করে।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদের প্রতি নরেন্দ্রনাথের পূর্বসঞ্জাত অনুরাগ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি। যথাকালে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় যে যথার্থ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, সেকথা জগদম্বার কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ বহু পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন বলে পূর্বের মতোই তিনি তাঁর সঙ্গে সাদর ও সস্নেহ আচরণ করে যেতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভালভাবেই জানতেন যে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পান বলেই নরেন্দ্রনাথকে তিনি এত ভালবাসেন। জানতেন, নরেন্দ্রনাথের এই

সব সূচীমুখ তর্কের মূল উৎস হচ্ছে তাঁর বুদ্ধির অকপটতা ; আর জানতেন বলেই সেগুলিকে যোগ্য মর্যাদাদান ও উপভোগ করতে পারতেন। বরং, নিজের অন্যান্য শিষ্যদের কাছে যে-কথা তিনি বলতেন, এক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলে এই যুক্তিপরায়ণ তরুণটির খুঁটিয়ে যাচাই করে তবে কোন কিছু মেনে নেবার প্রবৃত্তিকে আরো সজীব করে তুলতেন—"আমি বলছি বলেই কোন কিছু মেনে নিস না। প্রত্যেকটি বিষয় নিজে যাচাই করে নিবি।" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আরো যেসব ভক্তেরা আসতেন, তাঁদের চোখে নরেন্দ্রনাথের এরূপ আচরণ যতই উদ্ধত, নিন্দাত্মক ও 'কালাপাহাড়ী' ভাবের প্রতীক বলেই মনে হোক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অসীম স্নেহ ও ধৈর্য নিয়ে এভাবে নরেন্দ্রনাথকে অকপট স্বাধীন চিন্তার অভিব্যক্তির পথে বহুদূর পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে যেতেন।

পাষাণ খনন

নরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট নিজের সর্ববিধ অভিজ্ঞতাকেই ফরাসী দার্শনিক ডাকার্টের মতো সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেও বারবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার ফলে ক্রমে স্থিরনিশ্চয় হলেন যে, তিনি নিজেই ভুল বুঝছেন। প্রথম দর্শনকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ একজন অর্ধোন্মাদ বলেই ধারণা করেছিলেন ; কিন্তু ক্রমে বুদ্ধিজগতেও তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে দেখতে পেয়ে অসীম শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হল। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি বুঝতে পারলেন, ধর্মাচার্য হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে যুক্তির প্রতি তাঁর নিজের অতি-অনুরাগ ব্যাহত হতে পারে। আধ্যাত্মিকতালিপ্সু শিষ্যকে শিক্ষাপ্রদানকালে ও তার কাছে নিজের উপলব্ধির কথা বলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণভাবেই তা করে

থাকেন। তাঁর অনাড়ম্বর, উদার, নিরহঙ্কার ভাব লক্ষ্য করলে তাঁকে একজন গতানুগতিক আদেশকারিভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা বলে মনে হত না, বরং শিষ্যকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদানকারী একজন বাস্তবতানিষ্ঠ আধুনিক সত্যান্বেষী বলেই ধারণা হত। শিক্ষানবীশরা তাঁর অনেক কথা ধারণা করতে পারত না; কিন্তু তিনি কখনো একথা বলতেন না যে, তিনি বলছেন বলেই তা মেনে নিতে হবে। বরং শিষ্যদের কাছে নিজের উপলব্ধিলব্ধ সত্যগুলি উত্থাপিত করে নিজ নিজ অভিজ্ঞতাসহায়ে তা যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে বলতেন। ধর্ম-নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষা-প্রণালীগুলি জানিয়ে দিতেন তিনি, এমনকি বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন ধাতের ও বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারীদের জন্য বিভিন্ন পথও নির্দিষ্ট করে দিতেন। মানব-মনস্তত্ত্বের ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর শিক্ষাপ্রণালী এবং তা কখনো যুক্তিবিরোধী হত না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সব আচরণের ভেতর, তাঁর ক্ষিপ্রপ্রদত্ত সরস প্রত্যুত্তরের অন্তরস্থ অন্তর্ভেদী যুক্তির ভেতর, এবং তাঁর জ্ঞানালোকবর্ষী উপমায় বিচার- ও সংগঠন-শীল কল্পনার বিস্ময়কর সামঞ্জস্যের ভেতর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটা দিকের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবণ দিকটিই নজরে আসত; তাঁর এই বুদ্ধিপ্রদীপ্ত দিকটিরও সন্ধান পেয়ে, তাঁর মধ্যে হৃদয় ও বুদ্ধির এই অনন্যসাধারণ সমন্বয় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এর সঙ্গে নিজের ধাতের তুলনা করে পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত সুললিত ভাষায় বলেছিলেন, "বাইরে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভক্ত কিন্তু অন্তরে ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী।...আমি হচ্ছি এর ঠিক বিপরীত।" এত সব দেখাশোনার ফলে তাঁর পূর্বের উপহাস ক্রমে প্রার্থনার রূপ নিল; কঠিন দুর্ভেদ্য পাষাণ কোমল হয়ে খনকের কাছে আত্মসমর্পণ করল, পাষাণ ভেদ করার কাজও শুরু হল।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মূল্য নিজ উপলব্ধিসহায়ে যাচাই করে বুঝে নেবার জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁর ওজস্বী মনের সব আগ্রহ, সব উৎসাহ কেন্দ্রীভূত করে

অধ্যাত্মসাধনা শুরু করে দিলেন। গুরুর নির্দেশমতো বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করে চললেন তিনি। এ সাধনাকে সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত পরীক্ষা-প্রণালী বলে গভীব শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কবে তিনি এতে মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন।

এ সময় নবেন্দ্রনাথের ভেতর যে পবিবর্তন এসেছিল তাকে অদ্ভুত পরিবর্তন, তর্ক- ও সিদ্ধান্ত-ধারাব একেবাবে অচিন্তনীয় আমূল পরিবর্তনই বলতে হবে। আধুনিক ভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ যুক্তিবাদী দার্শনিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল একসময তরুণ নবেন্দ্রনাথেব বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন; তিনি নবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসেব এই দিক-পবিবর্তন লক্ষ্য করে সে সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত দিযে গেছেন—"আমাব চোখের সামনে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছিল, খুব মনোযোগ দিয়ে আমি তা লক্ষ্য কবে যাচ্ছিলাম। ধর্মভাব-বিহ্বলতা ও কালীপূজারূপ ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতিকে আমাব মতো একজন বেদান্তবাদ, হেগেলের মতবাদ ও বিপ্লববাদের উদগ্র তরুণ পূজাবী যে কি চোখে দেখত, তা সহজেই অনুমেয়। যখন দেখলাম, আমার কাছে যা অজ্ঞেয় অতি-প্রাকৃতিক রহস্যবাদ বলে মনে হত, তারই ফাঁদে ধরা পড়েছেন বিবেকানন্দের মতো স্বাধীনচিন্তাশীল, আজন্ম কালাপাহাড়ী-ভাবাপন্ন, নবভাবস্রষ্টা, প্রবলপ্রভাব বুদ্ধির অধিকাবী এবং অপরকে নিজের ভাবে টেনে আনার মতো শক্তিমান একজন পুরুষ, তখন আমার বিশুদ্ধ যুক্তি-দর্শনের কাছে সেটা একটা হেঁযালীর মতোই ঠেকল; এর কোন রহস্যই তখন ভেদ করতে পারি নি।"

একদিন বেদান্তোক্ত চৈতন্যসত্তার সর্বব্যাপিত্ব নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁব আরো কয়েকজন গুরুভাই মিলে খুব হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। বিষয়টিকে মাত্রাহীনভাবে অতিরঞ্জিত ও হাস্যকব বলে মনে হচ্ছিল তাঁদের। ঠাট্টা করে তাঁরা বলছিলেন, "এই ঘটিটাও ঈশ্বর!…এই মাছিগুলোও ঈশ্বর!" আর হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। এমন সময় ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে

এসে নরেন্দ্রনাথের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলজগৎ চৈতন্যময় জগতে রূপায়িত হল—সকলের ভেতর, চেতন-অচেতন সবকিছুর ভেতর তিনি সর্বব্যাপী আনন্দময় এক শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। বাড়ি ফিরে যাবার পরও তাঁর এই সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন চলতে থাকল; যা দেখেন, স্পর্শ করেন, তারই ভেতর ঈশ্বরকে দেখতে লাগলেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ কয়েকদিন যাবৎ রয়ে গিয়েছিল।

ঋণ ও দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে সংসারটিকে ডুবিয়ে দিয়ে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতা দেহত্যাগ করলেন; নরেন্দ্রনাথই ভাইদের মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন; কাজেই সাহস নিয়ে এই দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য তাঁকে উঠে-পড়ে লাগতে হল। কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন ও করুণ সংগ্রাম শুরু হল, যার ফলে জীবনের কঠোর বাস্তবতার স্পর্শ লাগল এই তরুণ সত্যান্বেষীর মনে। চারপাশের জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মোহ কেটে যাওয়ায় হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগল, সে আঘাতে আরাম-কেদারায় বসে চিন্তা করা কৈশোরের দার্শনিক তত্ত্বগুলি শতধা চূর্ণ হয়ে গেল; দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যাত্মা ঋষির প্রেরণায় মনে সম্প্রতি যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, যৌবনের সে বিশ্বাসও ভেঙ্গেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেল। বাহ্য-প্রলেপ ও চাকচিক্য টুটে যাওয়ায় সমাজকে এখন পূতিগন্ধময় একটা মৃতদেহ বলে মনে হল—যা দেখলেই বমি আসে। সমাজের নির্দয় অন্তর্জীবনের সঙ্গে দুঃখকর সংযোগের ফলে তিনি হতাশা-ক্ষুব্ধ হলেন; মনে মানুষের প্রতি ঘৃণা জাগল। তাঁর বিক্ষুব্ধ চিত্ত জগৎ ও জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। সর্ববিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন সারল্য নিয়ে নিজের শোচনীয় অভিজ্ঞতার যে মর্মন্তুদ কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, সহানুভূতির অভাবে তাঁর গর্বিত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, মাথা ঘুরে গিয়েছিল: "অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হাতে নিয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে

অফিস থেকে অফিসে ঘুরে বেড়াতাম, সব জায়গা থেকেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হত। সংসারের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের দরিদ্রের স্থান এখানে নেই। দেখতাম, দুদিন আগেও যারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করেছে, সময় বুঝে তারাই এখন আমাকে দেখে মুখ বাঁকাচ্ছে এবং ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে চাইছে না। দেখে শুনে কখনো কখনো সংসারটা দানবের রচনা বলে মনে হত। মনে হয়, এইসময় একদিন রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের তলায় ফোস্‌কা হয়েছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসে পড়েছিলাম। দু-একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গেয়েছিল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে···।' শুনে মনে হল, মাথায় যেন কে লাঠি মারছে। মা ও ভাইদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ায় ক্ষোভে, অভিমানে, নিরাশায় বলে উঠেছিলাম, 'নে, নে, চুপ কর, খিদের জ্বালায় যাদের আত্মীয়গণকে কষ্ট পেতে হয় না, খাওয়া-পরার অভাব যাদের কখনো সইতে হয় নি, টানাপাখার হাওয়া খেতে খেতে তাদের কাছে এরূপ কল্পনা মধুর লাগতে পারে, আমারও একদিন লাগত; কঠোর সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে এখন একে বিষম ব্যঙ্গ বলে মনে হচ্ছে।' আমার কথায় বন্ধুটি বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—দারিদ্র্যের কী কঠোর পেষণে মুখ থেকে ঐ কথাগুলো বেরিয়েছিল, তা সে জানবে কি করে? সকালে উঠে গোপনে খবর নিয়ে যেদিন জানতে পারতাম ঘরে সকলের মতো খাবার নেই, হাতে পয়সাও নেই, সেদিন মাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলে বেরিয়ে যেতাম; কোনদিন সামান্য কিছু খেয়ে, কোনদিন উপোস করেই কাটিয়ে দিতাম। ধনী বন্ধুরা কখনো কখনো তাদের বাড়িতে গিয়ে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানাত, কিন্তু আমার আর্থিক দুরবস্থার বিষয় খবর

নেবার কৌতূহল তাদের ভেতর প্রায় কারুরই হত না। আমি নিজের মনের ভেতরই তা চেপে রাখতাম।"

যে জগতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়, সে জগতের স্রষ্টা করুণাময় ঈশ্বর! নরেন্দ্রনাথের মনে এরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তাঁর মানসরাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক বিজয়-অভিযানের পূর্ব্বে যে সন্দিগ্ধতা মনের গভীরতর প্রদেশে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল, তা এখন সদর্পে বেরিয়ে এসে তাঁর মনের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে বসল এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে লাগল—দেখে শুনে জগৎটাকে পিশাচের সৃষ্টি বলেই মনে হয়, এর মূলে কোন করুণাময় মঙ্গলময় ঈশ্বর নেই। ইতঃপূর্বে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বই পড়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে অমঙ্গলের পূর্বাভাস তিনি একটু পেয়েছিলেন, যার বাস্তব স্পর্শ লাভ করে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন, এখন তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো তাঁর ওপর ফেটে পড়ল। তাঁর হৃদয়রূপ পাষাণ ভেদ করে যে খননকার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করেছিলেন, ভয়াবহ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ও আত্মীয়স্বজনের ঔদাসীন্য সে-কাজে সত্যই বিস্ফোরক-প্রয়োগের কাজ করল। সে বিস্ফোরণে তাঁর সুখলালিত বুদ্ধিবৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনরূপ বহিস্তরটি ভেঙ্গে গিয়ে ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল অবিশ্বাসরূপ গন্ধকজাত জমাট আবর্জনাগুলো বের হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে তিনি বিকট ধূম এবং গলিত উত্তপ্ত গিরিস্রাব উদ্গীরণ করে চললেন। সর্ববিধ আস্তিক্যভাবের ওপর তাঁর কথাগুলো বোমার মতো ফেটে পড়তে লাগল। তাঁর গর্বোন্নত বিদ্রোহী মন ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদের মতো মাথা তুলে দাঁড়াল।

বন্ধু ও আত্মীয়েরা ভুল বুঝলেন তাঁকে। তাঁর অন্তরে দিব্য আনন্দের চিরন্তন ধারার উৎস-মুখ আবৃত করে যে বিস্ফোরক পদার্থগুলি জমে ছিল, সেগুলিকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনেই যে তাঁর এই নাস্তিকতার বজ্রনাদ, সেকথা তখন তাঁদের ধারণাতেই এল না! কাজেই তাঁকে নিন্দা করার

লোকের অভাব হল না; তাঁরা বলে বেড়াতে লাগলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হয়ে গেছেন, বোধ হয় লম্পটও হয়েছেন, সংশোধনের কোন আশাও আর নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন, উদ্গীরণের ফলে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সঞ্চিত ঈশ্বরে-অবিশ্বাসরূপ বাহ্য আবর্জনা কখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, ধৈর্য নিয়ে সেই শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। গুরুর এই সীমাহীন ভালবাসা- ও ধৈর্য-প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছেন, "একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই আমার ওপর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন; আমার মা ও ভাইরা পর্যন্ত তা রাখতে পারেন নি। আমার প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাসই তাঁর সঙ্গে আমার চিরমিলন ঘটিয়েছিল। ভালবাসা কাকে বলে, তা একমাত্র তিনিই জানতেন।"

বেশ দীর্ঘদিন একটানা যন্ত্রণাভোগের পর নরেন্দ্রনাথ যখন শারীরিক ও মানসিক অবসাদের শেষসীমায় এসে পৌঁছেছেন, তখন হঠাৎ একদিন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, প্রায় অলৌকিকভাবে তাঁর ভেতর থেকে আধ্যাত্মিকতার ধারা হু-হু করে বেরিয়ে আসছে; এ-ধরনের অনুভূতি তাঁর জীবনে এই প্রথম। উৎস-মুখের আবরণ ক্রমে পাতলা হয়ে আসছিল, সেই মুহূর্তে একটা ছোট ছিদ্রপথ হয়েছিল তাতে, আর তার ভেতর দিয়েই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তরল ধারা বেরিয়ে এসে তাঁর মনের ভেতর যেটুকু সন্দেহ ও বিভ্রান্তি তখনো অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকুই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। সহসা-প্রদীপ্ত স্বজ্ঞা-সঞ্জাত জ্ঞানালোকে হৃদয় ভরে উঠল। সে আলোকে তিনি দেখতে পেলেন ঈশ্বরের করুণার সঙ্গে জগতের দুঃখকষ্টের সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে সম্ভব হয়। এই অনুভূতিলাভের পূর্বে অসীম হতাশা ও শারীরিক অবসাদে তিনি পথের পাশে একটা রোয়াকের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন; এখন অনির্বচনীয় আনন্দধারায় স্নাত হয়ে মৃগশিশুর মতো হালকা শরীর নিয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লেন। স্বজ্ঞাসহায়ে জানতে পারলেন যে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন নি।

গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হলেন তিনি; যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন বলে সংকল্প করলেন, কলকাতায় এক ভক্তগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছায় নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রাত্রিবাস করতে হল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনের কথা সব জানতে পেরেছিলেন; কোন বই খুললে তার পাতায় কি লেখা আছে তা যেমন আমরা পড়ে দেখতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক তেমনি ভাবেই অপরের মনের কথা জানতে পারতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন, 'আমি যতদিন আছি, তুমি সংসারে থাক।' গুরুর কথায় নরেন্দ্রনাথের চোখে জল এসে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছামতো পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে চাকরির জন্য আবার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকটি অস্থায়ী কাজ তাঁর জুটেছিল, কিন্তু পরিবারবর্গ নির্ভর করে থাকতে পারে, এমন কোন স্থায়ী কাজ তিনি জোগাড় করতে পারলেন না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশমতো একদিন বাড়ির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পর পর তিনবার মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করতে গেলেন। কিন্তু প্রতিবারেই মন্দিরে মার সম্মুখে যাওয়ামাত্র মায়ের জীবন্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে বাড়ির দুঃখকষ্ট জানাবার কথা ভুলে গিয়ে ভাবে ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে মার কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্যই প্রার্থনা করলেন; পরে শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁকে আশ্বাস দেন যে, ভগবৎকৃপায় তাঁর মা ও ভাইদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কখনো হবে না।

এই দিন থেকে নরেন্দ্রনাথ একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন, কার্যতঃ নতুন পথে চলতে শুরু করলেন তিনি। নাস্তিক্যভাবের প্রতিক্রিয়াগুলির চিহ্নমাত্র আর রইল না, মনের অতি গভীর প্রদেশে সঞ্জাত বিশ্বাসের রঙে ও প্রভাবে তাঁর সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজ রঞ্জিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে উঠল। যেদিন তিনি মন্দিরে জগদম্বার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে দিব্যভাবাবেশ, জ্ঞান ও আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিলেন, সেই দিন থেকে

শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল— "হৃদয়ই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে···পবিত্র হৃদয়ই বুদ্ধির ওপারের খবর জানতে পারে··· ; হৃদয়ই দিব্যভাবে আবিষ্ট হয় ; যুক্তি কখনো যার নাগাল পায় না, হৃদয় তারও খবর নিয়ে আসে···সত্যের প্রতিফলনের পক্ষে হৃদয়ই সর্বোৎকৃষ্ট দর্পণ···হৃদয় পবিত্র হয়ে যাওয়ামাত্র সেখানে সর্ববিধ সত্য প্রকাশিত হয়। আসলে আমাদেব প্রয়োজন হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমন্বয়।" বিশুদ্ধ যুক্তির পরম অনুগত পূজারী এরূপে পবিত্র-হৃদয়-সম্ভূত আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার সঠিক মূল্য ও তাৎপর্য নির্ণয় করে ফেললেন ; একমাত্র এই স্বজ্ঞাই অদেখা সত্যের দ্বার খুলে দিতে পারে। বিশ্বাসের কাছে তাঁর যুক্তি আত্মসমর্পণ করল। তাঁর অমিতপ্রভাব বুদ্ধিবৃত্তি তাঁর শুদ্ধ হৃদয়ের একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্র হয়ে দাঁড়াল। হৃদয ও বুদ্ধির এই মিত্রতাই বিবেকানন্দকে বিবেকানন্দরূপে গড়ে তোলে।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ কবতে সর্বতোভাবে সহায়তা কবে। তিনি যা চান, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞা সহায়ে তা নিশ্চিত লাভ করা যায় বুঝে, আর এই স্বজ্ঞা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ করায়ত্ত জেনে, যে-দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি গর্বোন্নত বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধবেছিলেন, তা শিথিল করে দিতে লাগলেন ; প্রেমাস্পদ শ্রীবামকৃষ্ণের সস্নেহ নির্দেশাধীন থেকে অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্প সহকাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার পরিপূর্ণরূপে উন্মুক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পরীক্ষা করে গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে গেল ; শুদ্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উদ্ভাসিত ভাবপ্রকাশের মুখে এখন আর 'চেক-ভালব' বসিয়ে রাখাটা অনাবশ্যক ও হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হল তাঁর। তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে আধ্যাত্মিকতারূপ পয়োধারার বহিরাগমনের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের খননকার্য চালিয়ে যাবার কাজে সানন্দে সোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। ইতোমধ্যেই অনেকখানি গভীরতায় তা পৌঁছেছিল, এবং নিম্নের বারিধারার কিঞ্চিৎ পূর্বাস্বাদও

তিনি লাভ করেছিলেন। মর্মন্তুদ দারিদ্র্য ও স্বজনপ্রতিবেশীদের হৃদয়হীনতা তাঁকে চিরদিনের জন্য পিষ্ট করে ফেলতে পারল না, পরিশেষে নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাঁকে নিয়ে এসে হাজির করল আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে। তাঁর হৃদয় ভরে উঠল; দারিদ্র্যের এবং প্রতিবেশীদের হৃদয়হীনতার বেদনা প্রশমিত হল; তাঁর বিষোদ্গীরণ রূপায়িত হল জগতের দরিদ্র নির্যাতিত জনগণের প্রতি আকুল-উচ্ছ্বসিত করুণা ও সহানুভূতিরূপ অমৃতক্ষরণে। নিদারুণ দুঃখকষ্টের আঘাতের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর হৃদয়ে মানব-সেবাব্রতরূপ স্রোতস্বিনীর খাত আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শিবজ্ঞানে দুর্গতজনগণের সেবা করার মর্মস্পর্শী বাণী শোনামাত্রই সেখানে দিব্যপ্রেমের খরপ্রবাহ বইতে শুরু করল আর দুঃখজর্জরিত কৃপাপাত্র মানুষ থেকে শুরু করে দেবভাবারূঢ় মানুষ পর্যন্ত সকলকেই অভিসিঞ্চিত করে দিব্যধামাভিমুখে ছুটে চলল। দারিদ্র্যের সংস্পর্শের ফলে ক্রমবিস্তৃত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় আধ্যাত্মিকতায় স্নাত হৃদয়ের আবেগেই মানুষকে ঈশ্বর-জ্ঞানকরা-রূপ তাঁর যুগান্তকারী বিশ্বাসের কথা তিনি জগতে ঘোষণা করেছিলেন—"নিখিল আত্মার সমষ্টিস্বরূপ যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন, একমাত্র সে ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী। সর্বোপরি আমি বিশ্বাস করি আমার দুষ্টরূপী ভগবানকে, আমার দুঃখিরূপী ভগবানকে, আমার সর্বজাতির দরিদ্ররূপী ভগবানকে।"

আমরা আগেই দেখেছি, দেহত্যাগের পূর্বে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইরা কিভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এই কালের কোন সময় এক দিব্যদর্শনের বিদ্যুচ্চমকের ফলে তাঁর মানবপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে আসে, কিছুদিনের জন্ত মানুষের মাঝে ঈশ্বর-দর্শনের প্রভাও স্তিমিত হয়ে যায়, এবং নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে চরম সত্যের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে সে-অবস্থায় চিরদিন নিমগ্ন থাকার

জন্য তাঁর হৃদয়ে এক দুর্দমনীয় স্পৃহার উদয় হয়। এরূপ অবস্থালাভের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানান; তারপর কিভাবে হঠাৎ একদিন তাঁর চেতনা সর্ববিধ সীমার পারে গিয়ে পরব্রহ্মের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সে অবস্থা থেকে ব্যুত্থানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নিজ জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপনের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে তুলে দিয়েছিলেন, তা আমরা দেখেছি। তিনি নরেন্দ্রনাথকে সজাগ করে দেন যে, নিজে সমাধিভূমিতে উঠে সর্বক্ষণ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য নরেন্দ্রনাথ আসেন নি, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে টেনে তোলার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে মানুষের সেবা করাই তাঁর জীবনধারণের উদ্দেশ্য। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, "গুরুদেব, সমাধিতে আমি আনন্দে ছিলাম। অসীম আনন্দের মাঝে জগৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমার আকুল প্রার্থনা,—সেই পরমানন্দে আমায় থাকতে দিন।" একথা শুনে ব্যক্তিগত আনন্দ-উপভোগ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিকে এক-কথায় ফিরিয়ে আনলেন পৃথিবীর সকল মানুষের দিকে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা থেকে বিশ্বজনীতার দিকে; তিনি বললেন, "লজ্জা করে না তোর একথা বলতে! ভেবেছিলাম, কোথায় বহু লোকের জীবনের একটা বিশাল আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবি, আর তা নয় তুই কিনা সাধারণ লোকের মতো নিজে আনন্দ-সাগরে ডুবে থাকতে চাইছিস! মায়ের কৃপায় তোর জীবনে এ অনুভূতি এত সহজ হয়ে যাবে যে, সাধারণ অবস্থাতেই তুই সব কিছুর ভেতর সেই অদ্বিতীয় পরম সত্তাকে দেখতে পাবি; জগতে অনেক বড় কাজ করতে হবে তোকে—মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক চেতনা বয়ে এনে দিতে হবে, দরিদ্র ও দীনহীনের চোখের জল মোছাতে হবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনুধাবন করে নরেন্দ্রনাথ মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সেবা করার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করলেন, এবং জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে পরমাত্মার সঙ্গে নিজের একত্ববোধের অতি বিপুল আনন্দ-উপভোগকেও বলি প্রদান করতে

কৃতসঙ্কল্প হলেন এই মানবসেবাযজ্ঞের বেদীমূলে। কিন্তু অদ্বৈতানুভূতির আনন্দের আকর্ষণ এত প্রবল যে, নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে থাকার জন্য তাঁর মনে সব সময় একটা অন্তর্মুখী গতির প্রবণতা রয়েই গেল; গুরুর আদেশপালনার্থ মনের সে গতিকে বহির্মুখী করার জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হল তাঁকে। প্রথম দিকে ভীষণ দোদুল্যমান অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর বাকী জীবন তাঁর মন এ-দুটি প্রচণ্ড আকর্ষণের মিলিত এক অদ্ভুত গতিপথ ধরে চলেছিল—তাঁর নিজের ভাষায় সে-পথ হচ্ছে 'চির প্রশান্তির মাঝে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা'। আপেক্ষিক জগতের মাঝখানে থেকে সাক্ষাৎ-ঈশ্বর-রূপ জনগণের জন্য তাঁর হৃদয় সর্বক্ষণ প্রেমে উদ্বেলিত হত, আবার থেকে থেকে নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতো স্থির হয়ে যেত; তখন জগৎ ও তদন্তর্গত সব কিছুই মুছে গিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞানাতীত মহিমা প্রতিবিম্বিত হত সেখানে। একদিকে মানুষের অন্তরস্থ ঈশ্বরের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম, অপর দিকে ভগবানের নির্গুণ সত্তার সঙ্গে একত্বানুভূতি—অধ্যাত্মিকতার এদুটি ভাবের সীমার মধ্যে তাঁর চেতনা সঞ্চরণ করে বেড়াত। গুরু তাঁকে যা আদেশ করেছিলেন, তার আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে নিজ অনুভূতি সহায়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছিলেন বলে পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের মূলমন্ত্র-রচনাকালে তিনি নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনরূপ দুটি আদর্শকে ('আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ') একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এভাবে প্রায় ছয় বৎসরকাল অধ্যবসায় সহকারে ধীর অদৃশ্য হস্তে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়রূপ কঠিন পাষাণ ভেদ করে খননের কাজ চালাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অটল ভালবাসা ও সস্নেহ প্রসন্নতা সহায়ে সম্পূর্ণরূপে তা ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর গুরুর হৃদয়রূপ গগনস্পর্শী উচ্চতায় যে স্রোত এতদিন বয়ে চলেছিল, অনন্তের বুক ফুঁড়ে আধ্যাত্মিকতার সেই স্বচ্ছ, বেগবান, চিরন্তন ধারা হু হু করে বেরিয়ে এল, আর নরেন্দ্রনাথ তা

ধারণ করে নিজ হৃদয়-জুড়ে তা সঞ্চিত করে রেখে দিলেন। শরীরত্যাগের প্রাক্কালে আধ্যাত্মিক শক্তির যে-প্রবাহ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন, বোধ হয় তা পূর্বোক্ত ধারার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই আধ্যাত্মিকতাই উদ্বেল হয়ে উঠে শিষ্যের হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বাইরে এসে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়েছিল সঞ্জীবনী ধারায় নীরস ধরণীকে অভিসিঞ্চিত করে তার সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতার, বিরোধের উন্মত্ততার এবং অবিশ্বাসের মারাত্মক ব্যাধিগুলির কবল থেকে তাকে মুক্ত করে দিতে।

প্রবাহকে লোককল্যাণাভিমুখী করা

অদ্বৈত অনুভূতির ফলে মনের সব সংশয় চিরতরে মুছে যাবার পর এবং মূল অজ্ঞানের পিঞ্জর টুটে বীরদর্পে প্রকৃতির নাগালের বাইরে চলে আসার পর তেইশ বছর বয়স্ক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ধারণা করবার, তার মর্ম গ্রহণ করবার, অপরকে তা স্পষ্ট করে বোঝাবার ও তদনুসারে জীবন-যাপন করার কাজে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হলেন। পূর্বের এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিবিধানের ভার নরেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যাশায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করার সময় নরেন্দ্রনাথের যোগ্য সস্নেহ তত্ত্বাবধানে যুবক ভক্তগণ একপ্রাণে একত্র মিলিত হয়ে ভাবী সন্ন্যাসিসঙ্ঘের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে এই যুবকভক্তগণের মনের ওপর দিয়ে বৈরাগ্য এবং ভগবানলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার ঝড় বয়ে যায়, আর সে ঝড়ের বেগ সংসারের নোঙর ছিঁড়ে একে একে তাঁদের সকলকে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। তারক, লাটু ও বুড়োগোপাল পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন ; ভাড়ার মেয়াদ

যতদিন ছিল ততদিন তাঁরা কাশীপুর উদ্যানবাটীতেই রয়ে যান। দলের নেতা নরেন্দ্রনাথ এবং বাকী আর সবাই প্রতিদিন সেখানে এসে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় ও তাঁদের গুরুর জীবন ও বাণীর অনুধ্যানে বেশ কিছুক্ষণ করে কাটিয়ে যেতেন। ভাড়ার মেয়াদ মাস শেষ হওয়ার সঙ্গেই ফুরিয়ে গেল; শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে মধুর, তাঁর পরশে পবিত্র, তাঁর বিচ্ছেদের ব্যথায় ভরা সে বাড়িখানি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

তখনই কাশীপুর ও দক্ষিণেশ্বরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বরাহনগরে একটা পুরোনো বাড়ি ভাড়া করা হল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে কাশীপুর উদ্যানবাটী ছেড়ে তাঁরা সেখানে এসে উঠলেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মঠ গড়ে ওঠে। সুরেশচন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তগণ এই মঠের খরচ যোগাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানে তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শের অভাবে এইসব গৃহস্থ-ভক্ত তখন এরূপ একটি শান্ত পবিত্র পরিবেশের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন—যেখানে যুবকভক্ত-গণের অচলা ভক্তি, ত্যাগ ও আরাধনাসম্ভূত অবিমিশ্র আধ্যাত্মিকতার অতি শুদ্ধ পরিমণ্ডলে অবসর সময়ে এসে তাঁরা একটু জুড়োবার অবকাশ পেতে পারেন। কাজেই তাঁরা যে যুবকসঙ্ঘের এই কঠোরতাময় অনাড়ম্বর বাসস্থানের খরচ যোগাবার কাজে খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

দুঃসহ শোকাবহ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা, বিশেষ ভক্তিমতী বাবুরামের মায়ের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) দেশের বাড়িতে দিনকয়েক কাটিয়ে আসতে গেলেন। গ্রামের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে নরেন্দ্রনাথের প্রেরণা-উদ্দীপক আলোচনা শুনতে শুনতে আধ্যাত্মিকতালিপ্সু

এই যুবকদলটির হৃদয়ে সর্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের আগুন জ্বলে উঠল এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনে তাঁদের চির-আবদ্ধ করল। একদিন গভীর নিশীথে প্রজ্বালিত অগ্নির সম্মুখে বসে বহুক্ষণ ধ্যান করার পর সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়-নিঃসৃত ভাবগম্ভীর বাণী শুনছিলেন। তাঁদের সর্বসম্মত নেতা নরেন্দ্রনাথ তাঁদের মানসপটে যীশুখৃষ্টের পবিত্র জীবনের উজ্জ্বল চিত্র এঁকে চলছিলেন সে সময়; আর নাজারাথের ঈশদূতের মতোই ত্যাগ ও সেবার আদর্শে জীবনকে উন্নত করার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁদের হৃদয়ে এই কথাটা দৃঢ়মুদ্রিত করে দিলেন—তাঁদের প্রাণপ্রিয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন যে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত করার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁদের অশেষ প্রয়াসে ব্রতী হতে হবে এবং মানবজাতির পরিত্রাণকল্পে নিজেদের জীবন পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে। তিনি বোঝালেন, প্রায় দু'হাজার বছর আগে যীশুখৃষ্ট যা করেছিলেন তাঁদেরও তাই করতে হবে, কালবিলম্ব না করে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে বাইরে এসে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে হবে। একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তগণের হৃদয়ে ঈশ্বর ও মানুষের পায়ে সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রেরণা প্রবল হয়ে দেখা দিল; সন্ন্যাসরূপ চরম ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন।

নতুন করে ত্যাগের প্রবলতর উদ্দীপনা নিয়ে সেখান থেকে আসার পর তাঁরা গৃহপরিজনের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন; বছর দুয়েকের মধ্যে সকলেই এসে বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে থাকার পর দক্ষিণেশ্বরের ঠিক দক্ষিণ দিকে আলমবাজারের একটি বাড়িতে মঠ স্থানান্তরিত হয়। বরাহনগর মঠে এক শুভলগ্নে তাঁরা বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের যুগযুগ-প্রচলিত বিরজাহোম অনুষ্ঠানের ফলে বরাহনগর মঠ সেদিন পবিত্র হয়। সেদিন মঠবাসীরা সকলে

শঙ্করপন্থী হিন্দুসন্ন্যাসীদের পূত প্রথানুযায়ী সর্ববিধ কঠোর বিধি অনুসরণ করে এই যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে তাঁরা যে অন্তঃসন্ন্যাস পেয়েছিলেন, সন্ন্যাসের যে ভাবটিকে এতদিন তাঁরা পরম শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ে পোষণ করে আসছিলেন, এখন সেই ভাবেরই পরিপূরক প্রয়োজনীয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সমাধা করে তাঁরা গৈরিক বসন, কৌপীন ও সন্ন্যাসের নতুন নামে ভূষিত হলেন; তাঁদের নবজীবনের সুপ্রভাত হল।

অধ্যাত্মভাবোন্মত্ত এই নবীন সন্ন্যাসীর দল কঠোর নিয়মগুলি আকুল আগ্রহে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে তৎকালে আধ্যাত্মিক সত্যলাভকেই জীবনের একমাত্র কাম্য জেনে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। শরীরধারণের জন্য অপরিহার্য সামান্য আহার মাত্র তাঁরা গ্রহণ করতেন; বিশ্রাম করতেন স্বল্পকাল আর বাকী সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করতেন আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবে থাকতে। ধ্যান, নিদিধ্যাসন, স্তবপাঠ, প্রার্থনা, ভজন ও শাস্ত্রালাপ—শুধু এই সব নিয়েই তাঁরা সময় কাটাতেন। ভগবদারাধনার ঝড় বয়ে যেত মঠে; দিনরাত্রিগুলি সে ঝড়ের বেগে কিভাবে কোথায় উড়ে যেত, টেরই পেতেন না কেউ।

স্বামীজীর একজন গুরুভাই, রামকৃষ্ণানন্দ, সঙ্ঘের হৃদয়াধিপতি গুরু-মহারাজের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে মঠে তাঁর স্মৃতির যাগপ্রদীপ জ্বেলে রাখতেন। একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ ও ব্যবহৃত দ্রব্য রেখে, বেদীর ওপর তাঁর প্রতিকৃতি বসিয়ে তিনি ঠাকুরঘর করেছিলেন; অন্তরের ভক্তি নিঃশেষে উজাড় করে তিনি সেখানে সেবায় ব্রতী হলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে যেভাবে তাঁর সেবা করতেন, ঠিক সেইভাবেই তাঁর সেবা করতে লাগলেন। যেভাবে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে সেবার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ তিনি যথাসময়ে করে যেতেন তাতে সকলেই অনুভব করতেন, ঠাকুর সশরীরে মঠে বিরাজ করছেন। আদর্শ ভক্তের মতো জীবনের প্রায় শেষদিন

পর্যন্ত তিনি অবতারজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে গুরুমহারাজের সেবা করে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অধ্যবসায়, আগ্রহ ও জ্বলন্ত ভক্তি ঠাকুরসেবার একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক দশকের মধ্যেই সঙ্ঘ যেসব মঠ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে সর্বত্র এই ঐতিহ্য আজও সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

রামকৃষ্ণানন্দ-কর্তৃক প্রবর্তিত মঠের এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি সেখানে বাস্তবিকই একটা আনন্দময় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল; প্রাণপ্রিয় গুরুর বিচ্ছেদবেদনার আগুনে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়বিধ ভক্তেরই হৃদয় পুড়ে যাচ্ছিল; এই সেবার মাধ্যমে সেই তাপিত চিত্তে সান্ত্বনার একটু স্পর্শ লাগাবার মতো একটা অবলম্বন তাঁরা পেয়ে গেলেন। কিন্তু এতে বিপদের সম্ভাবনাও ছিল; সে বিপদ থেকে রক্ষা করার সুব্যবস্থা না করতে পারলে তার ফলে একটা নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠে সঙ্ঘকে চিরদিন তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলতে পারত। সঙ্ঘের কেন্দ্রস্বরূপ বিবেকানন্দ এ বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, এবং সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে সঙ্ঘকে পরিচালিত করার মতো শক্তিও তাঁর ছিল। গভীর ভালবাসা, সস্নেহ তত্ত্বাবধান ও অদ্ভুত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বিবেকানন্দ সমগ্র সঙ্ঘের সশ্রদ্ধ আনুগত্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড আকর্ষণে সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের কত প্রশংসা করতেন, তা সকলেরই মনে পড়ে যেত; তাঁর কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মর্মার্থ জানবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে যে-সব উচ্চ ভাব ও আদর্শ বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ গড়ে তোলার জন্য যেগুলিকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বলেই মনে হত, সে-সব কথা তিনি গুরুভাইদের শোনাতেন। তাঁদের কল্পনায় তিনি ফুটিয়ে তুলতেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সন্ন্যাস-জীবন যা গভীর আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী উদার, বিশ্বজনীন ও মানুষের জন্য ভালবাসায় ভরা। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তাঁদের গুরুর জীবনে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না, বস্তুতঃ তাঁদের গুরু ছিলেন সর্ববিধ ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত বিগ্রহ। স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ করেছিলেন সারা জগৎকে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য ; তাঁর বিভিন্ন অনুভূতির দীপ্ত শিখার স্পর্শে পৃথিবীর সর্ববিধ ধর্মমত ও ধর্ম-বিশ্বাস পুনরুদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি গুরুভাইদের মনে গেঁথে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করার ফলে তাঁদের হৃদয়ে সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব জেগে ওঠা উচিত, কারণ এই ভাবেরই জলন্ত প্রতীক ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। গুরুভাইদের তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, ধর্মের নামে মঠে যেন কেবল হালকা ভাবোচ্ছ্বাসের ঘটা না চলে। বিশুদ্ধ যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান ও নিখুঁত চরিত্র সহায়ে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের সামঞ্জস্যবিধান করার জন্য তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞানালোকবর্ষী আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের জন্য তিনি সচেষ্ট হতেন। তাছাড়া তিনি সকলকে সজাগ করে দিতেন যে, আত্মকেন্দ্রিকতার সীমা ছাড়িয়ে এসে নিজ নিজ মুক্তিসাধনের সঙ্গেসঙ্গেই মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টাতেও তাঁদের ব্রতী হতে হবে ; আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই-ই চাইতেন। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর যে তাঁদের স্কন্ধে এক গুরুদায়িত্বের ভার তুলে দিয়ে গেছেন, সেকথা সর্বদা স্মরণ রাখার জন্য তিনি এই নবীন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সকলকেই উৎসাহিত করতেন। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরূপ উত্তুঙ্গ শিখর হতে আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের যে পূত মন্দাকিনী-ধারা বিবেকানন্দের হৃদয়ে নেমে এসেছিল, বিবেকানন্দের হৃদয় হতে নিঃসৃত হয়ে এখন ধীরপ্রবাহে সে-ধারা বইতে শুরু করল সঙ্ঘের সকলেরই হৃদয় জুড়ে।

মঠবাসী সন্ন্যাসীদের অন্তরে ত্যাগের যে অগ্নিশিখা নিরন্তর জলে চলেছিল,

সময় সময় তা এত বেশী প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল যে, মঠের সীমানার মধ্যে বাস করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। একমাত্র রামকৃষ্ণানন্দ মঠ ছেড়ে কখনো বাইরে যেতে চান নি, গুরুমহারাজের সেবাকার্য আঁকড়ে মঠেই রয়ে গিয়েছিলেন। গুরুভাইদের সঙ্গরূপ সোনার শিকলের বন্ধনও ছিঁড়ে ফেলে বেবিয়ে আসার জন্য, মঠ থেকে দূরে চলে গিয়ে পরিব্রাজক সাধু বা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর মতো কঠোর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার জন্য সঙ্ঘের অন্যান্য সকলের হৃদয়ে মাঝে মাঝে প্রেরণা জাগত। ফলে, যাযাবব পাখীর মতো এই সন্ন্যাসিগণ বরাহনগর মঠের ক্ষুদ্র নীড় পরিত্যাগ করে কিছুকাল দেশের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন, উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোলে কোন নির্জন প্রদেশে অথবা নর্মদাতীরে, কখনো বা কোন তীর্থস্থানের সান্নিধ্যে বাস করে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা বরাহনগর মঠে ফিরে আসতেন ক্লান্ত পক্ষপুটের বিশ্রামের জন্য, আবার মুক্ত আকাশে পাড়ি দেবার মতো শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অভেদানন্দ, যোগানন্দ, অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভ্রাতা পরিব্রাজক-জীবন শুরু করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই সঙ্ঘগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাই তীর্থপর্যটনে বের হন একটু দেরিতে। দু'চার দিন দেওঘর বা কাশী ঘুরে এসেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন, তাঁর মন সর্বদা পড়ে থাকত সঙ্ঘকে সুসম্বদ্ধ করার দিকে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরও মনে তরঙ্গায়িত প্রবাহের মতো স্বচ্ছন্দগতিতে বয়ে যাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, মঠের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। সন্ন্যাসজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পর্যটনের জন্য অগণিত মুনি-ঋষির আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্মৃতিবিজড়িত পর্বত ও অরণ্যানী, নদীতীর ও উপত্যকা, মন্দির ও শাস্ত্রচর্চার স্থানগুলি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সে দুর্বার আহ্বান তাঁকে অস্থির করে তুলল, সঙ্ঘপ্রেমের পসরা কিছুদিনের জন্য বাড়

থেকে নামিয়ে রেখে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে· শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দু'বছর পরে, তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

বারাণসী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন এবং হিমালয় পর্যটন করলেন তিনি। ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট থাকলেও তাঁর হৃদয় স্থাপত্য ও চারুকলার বিরাট কীর্তিগুলির সৌন্দর্যগ্রহণের জন্যও উন্মুক্ত ছিল; ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে যতটা আগ্রহ নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ততটা আগ্রহ নিয়েই তিনি দেখতে গিয়েছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি। এই সময় পর্যটনকালে তাঁর দেদীপ্যমান ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক উৎসাহী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এক-কথায় গৃহত্যাগ করে তাঁর সঙ্গ নেন, এবং তাঁর পর্যটনের অবশিষ্ট কাল ছায়ার মতো তাঁকে অনুসরণ করে চলেন। পরে তিনি বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। অবশ্য পর্যটনের পথে কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুজনকে একসঙ্গেই বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

বসন্তরোগাক্রান্ত গুরুভাই যোগানন্দকে সেবা করার জন্য ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ এলাহাবাদে আসেন। এখানে তিনি অল্পদিন ছিলেন, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর শুদ্ধ পবিত্র চরিত্র ও গভীর সুদূরপ্রসারী জ্ঞান সেখানকার বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এখানেই তিনি গাজীপুরের মহাযোগী পওহারী বাবার কথা শুনতে পান এবং পরবৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

পওহারী বাবাকে দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও, সব সময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার জন্য একদা প্রলুব্ধও হন। বিবেকানন্দের অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের রহস্যোদ্ঘাটক মজ্জা কিন্তু এই ইচ্ছায় সায় দেয় নি। পওহারী বাবার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন তিনি সঙ্কল্প করতেন, আর প্রতিদিনই

রাত্রে দেখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, নীরব-অনুরোধ-মাখা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত স্বজ্ঞাই জয়ী হল, মনের ওপর ইচ্ছার যে পাতলা মেঘাবরণ জমেছিল, স্বজ্ঞার উল্লাসে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থানের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের এই রহস্যময় পুনরাবির্ভাবের প্রত্যক্ষ বিবেকানন্দের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁকে চির-অধিষ্ঠিত করে দিল এবং মহিমময় ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুরক্ত চিরদাস হয়ে থাকার জন্য তিনি মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হলেন। জনৈক বন্ধুর কাছে তিনি তাঁর এই মনোভাব পত্রে লিখে জানিয়েছিলেন: "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না। ···এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অহেতুকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।···বিপদে, প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাহাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সে সকল অপহৃত করিয়াছেন।" যোগমার্গে সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকার তীব্র ইচ্ছা দমন করে মানব-জাতির আধ্যাত্মিক-উন্নতিসাধনরূপ ভগবদিচ্ছা কার্যে রূপায়িত করাব জন্য বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশমতো চলতে লাগলেন।

অসুস্থ গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের সেবার জন্য গাজীপুর থেকে তাড়াতাড়ি তিনি কাশী চলে এলেন। অভেদানন্দ নিরাময় হয়ে ওঠার পরও কিছুকাল তিনি প্রমদাদাস মিত্রের বাগানবাড়িতে থেকে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। এখানে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহস্থভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরে যান। প্রমদাবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপেক্ষিক জগতের অনিত্যতা যাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অতি স্পষ্ট, সেই বিবেকানন্দের মতো একজন ঘোর বেদান্তী আবার শোকে এত কাতর হন কি করে? এর উত্তরে বিবেকানন্দ তাঁর

সন্ন্যাসজীবনের নিজস্ব নীতি শুনিয়ে প্রমদাবাবুকে নিরস্ত করেছিলেন: "আমরা শুকনো সাধু নই। বলেন কি মশাই। আপনি কি বলতে চান, সন্ন্যাসী হলে তার আর হৃদয় বলে কিছু থাকবে না?" হয় সে-হৃদয় নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে যাবে, আর না হয় ভগবান ও মানুষরূপী ভগবানের জন্য প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে; সব ব্যথিতের ব্যথা এসে সে-হৃদয়ে সহানুভূতির স্পন্দন তো তুলবেই! বলরামবাবুর শোকার্ত পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বারাণসীর এই শান্তিপূর্ণ নির্জন বাগানবাড়িটি ছেড়ে অবিলম্বে তিনি কলকাতায় ফিরলেন।

প্রায় দুমাস তিনি বরাহনগর মঠে ছিলেন। সন্ন্যাসীভাইদের সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তগণের সঙ্গে এবং যাঁরা মঠে যাতায়াত করতেন তাঁদের সঙ্গে নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে তাঁর দিন কাটতে লাগল। তাঁর ভেতরকার বিরাগী সত্তাটি কিন্তু তাঁকে অস্থির করে তুলল মানুষের সংস্রব থেকে বহু দূরে একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুবার জন্য, যেখানে অবিচ্ছেদে দীর্ঘদিন তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে পারবেন। আধ্যাত্মিকতার অভাবে লোকে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, সম্প্রতি দেশভ্রমণকালে নিজের চোখে তিনি তা দেখে এসেছেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, জীবনে এদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে কোন বিপুলশক্তি আধ্যাত্মিক-তড়িতাধারের সংস্পর্শে এনে সেই তড়িৎ-স্পর্শে এদের শক্তিমান করে তোলা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায় নেই। তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর নিজেরই অভ্যন্তরে সে তড়িতা-ধার রয়েছে; সেখান থেকে শক্তি বের করে এনে তাকে কার্যকর করে তোলার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগল তাঁর মনে। এই ভাব তাঁকে পেয়ে বসল; তিনি স্থির করলেন তখনই মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন এবং স্পর্শমাত্রে মানুষের ভেতর পরিবর্তন এনে দেবার মতো আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত মঠে আর ফিরবেনই না। এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পবান

হয়ে, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি দীর্ঘ যাত্রাপথে পা বাড়ালেন।

ইতোমধ্যে অখণ্ডানন্দ উত্তর ভারতের বিস্তৃত অংশ, কাশ্মীর, হিমালয়, এমন কি তিব্বতও পর্যটন করে ফিরে এসেছেন। বিবেকানন্দ তাঁকে পথপ্রদর্শক ও সাথী হিসাবে সঙ্গে নিলেন এবং দেওঘর, ভাগলপুর, কাশী, অযোধ্যা ও নৈনিতাল হয়ে হিমালয়ের কোলে আলমোড়ায় গিয়ে পৌঁছুলেন। এই আলমোড়ায় একটি বটবৃক্ষতলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে অবস্থানকালে তিনি একটি গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করেন। সেদিনকার তারিখ দিয়ে দিনপঞ্জীতে তিনি তার কিয়দংশ লিখে রেখেছিলেন: "বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আর বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, উভয়ই একই পরিকল্পনায় রচিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন প্রাণীর দেহাবরণের ভেতর রয়েছেন, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতন প্রকৃতির—দৃশ্যমান বিশ্বের—অন্তরে রয়েছেন। শিবা (কালী) শিবকে আলিঙ্গন করে রয়েছেন; ইহা কল্পনা নয়। এই একের (আত্মার) অপরের (প্রকৃতির) দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে থাকার উপমা দেওয়া চলে ভাব ও ভাবের প্রকাশক ভাষার মধ্যে যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে। ভাব ও ভাষা অভিন্ন, আমরা শুধু কল্পনাতেই এদের মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে পারি। শব্দ ছাড়া চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্যই 'প্রথমে শব্দের উৎপত্তি' ইত্যাদি (শাস্ত্রবাক্য রয়েছে)। বিশ্বাত্মার এই দ্বিত্বভাব চিরন্তন, কাজেই আমরা যা কিছু ধারণা করি বা অনুভব করি, তা সবই হচ্ছে এই নিত্য-সাকার ও নিত্য-নিরাকারের সম্মিলন।" দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে তো শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপই ছিল! মানুষের সঙ্গে তাঁর সর্ববিধ আচরণও তো অনুরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত! আলমোড়ায় এই সত্য উপলব্ধি করে বিবেকানন্দ বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, দেহত্যাগের কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভেতর নিজের যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, সে শক্তির বিকাশ এখন ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শোনা জীব ও

শিবের একত্ব এতদিন তাঁর বুদ্ধি-অনুমোদিত বিষয়মাত্র ছিল; এখন নিজের সত্তার তীব্র আলোকসম্পাতে সে-সত্য জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। আজ ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিন্নস্বরূপ মহাসত্যটি তাঁর উপলব্ধিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে; তাঁর অন্তর্মুখ মনের সঙ্গে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট মানবসেবা-ব্রতের সামঞ্জস্যবিধানের কাজে এই উপলব্ধি সহায়ক হতে পারবে। এই জন্যই বোধ হয় ধ্যানান্তে আসন ছেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহচারী অখণ্ডানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "এখানে, এই বটবৃক্ষতলে, আমার জীবনের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।"

আলমোড়ায় বাসকালে বিবেকানন্দের কাছে তাঁর ভগ্নীর আত্মহত্যার মর্মন্তুদ সংবাদ পৌঁছায়। তখনই তিনি হিমালয়ের গভীরতর অরণ্য-অঞ্চলে একটা নির্জন নিস্তব্ধ স্থান খুঁজে বের করার জন্য রওনা হলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি এবং অখণ্ডানন্দ উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ নির্জনতার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে গাড়োয়াল প্রদেশের শ্রীনগরের দিকে তাঁদের অগ্রসর হতে হল। শেষে তাঁরা দেরাদুনে গিয়ে উঠলেন। সেখানে অখণ্ডানন্দকে দৈবাৎ-পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সহৃদয় তত্ত্বাবধানে রেখে বিবেকানন্দ হৃষীকেশের পথে রওনা হলেন; সঙ্গে নিলেন সারদানন্দ এবং তুরীয়ানন্দকে—তাঁরা ইতোমধ্যে সেখানে এসে জুটেছিলেন। হৃষীকেশের অনুকূল পরিবেশে আবার তাঁর মনে তীব্র তপস্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মরণাপন্ন হন। জ্বর সেরে গেল, কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে থাকা আর সম্ভব হল না; একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে সমতল ভূমিতে নেমে আসতে হল। সুদীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকার উপযোগী একটা স্থান হিমালয়ের বুকে খুঁজে বের করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা এভাবে আকস্মিক ঘটনার সমাবেশে সহসা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর নিঃসঙ্গতায় ডুবে যাবার প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে একটা শক্তি তাঁকে টেনে নিয়ে আসছিল মানুষের সমাজের

দিকে। অখণ্ডানন্দ তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছেন, "নীরবতা ও তপস্যার মধ্যে যখনই আমি ডুবে থাকতে চাই, তখনই ঘটনার চাপে তা ছেড়ে দিতে আমাকে বাধ্য হতে হয়।"

যাই হোক, হরিদ্বারে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা সাহারাণপুরে গমন করেন। সেখান থেকে মীরাট যান। মীরাটে প্রায় পাঁচমাস ছিলেন; এখানে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এখানকার স্থানীয় গ্রন্থাগারের রক্ষক বিবেকানন্দের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মাত্র একদিনের মধ্যেই স্যর জন লাবাকের রচনাবলী সব পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন; এই অবিশ্বাস্য ঘটনা সত্য কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য গ্রন্থাগারিক ঐ রচনাবলীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন এবং সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হন।

বিবেকানন্দের ভিতরের মানুষটি কিন্তু ক্রমাগত তাঁকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে থাকার জন্য, এমন কি গুরুভাইদেরও সুখ-সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য। তাঁর বুকের ভেতর কয়েকটি প্রচণ্ড শক্তি তোলপাড় করছিল, যার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, কার্যারম্ভের সঠিক একটি পন্থা খুঁজে বের করতে হবে; এজন্য তাঁর সমগ্র সত্তা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। প্রায় দুবছর আগে তাঁর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য তাঁর মানসিক উদ্বেগের কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বাবা, একটা মহান্ উদ্দেশ্য আমাকে সিদ্ধ করতে হবে; কিন্তু সেজন্য নিজের শক্তির স্বল্পতার কথা ভেবে আমার মনে হতাশা জাগছে। কাজটি সমাধা করার জন্য আমি গুরুকর্তৃক আদিষ্ট; কাজটি হল গোটা ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা তার একটুও কম না। দেশে আধ্যাত্মিকতার মান কত নীচে নেমে গেছে। দেশজুড়ে চলছে অনাহারের তাণ্ডবলীলা! ভারতকে আবার শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, নিজ আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সারা জগৎ জয় করতে হবে।"

গুরু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন মানবসেবাকে জীবনের উদ্দেশ্য করতে ; সে কথা তাঁর মনে সব সময় ভাসছিল। আলমোড়ায় ঈশ্বর ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য উপলব্ধি করার পর থেকে তাঁর আধ্যাত্মিকতালিপ্সা এবং ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা, এদুটি ভাবকে আলাদা করার মতো কোন কিছুরই অস্তিত্ব বোধ হয় তাঁর মনে আর ছিল না, পূর্বের মতো এদুটির মাঝখানে থেকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দোলা খাবার ভাব চলে গিয়েছিল। আত্মমগ্নতা ও সেবা এদুটির প্রান্তরেখা পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে মিলে গিয়ে একই নিরবচ্ছিন্ন গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের দুটি সঞ্চরণক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। তখনো তাঁর মন শান্ত হয় নি। তখনো তিনি তাঁর সঠিক কর্মপন্থার সন্ধান পান নি। দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে তাঁর গুরুর হৃদয় যেমন বিগলিত হয়েছিল এবং তার প্রতিকারকল্পে তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল, চারিদিকের লোকের একটানা দুঃখদৈন্য দেখে বিবেকানন্দের হৃদয়েও তেমনি প্রচণ্ড আঘাত লাগল এবং অবিলম্বে সে দুঃখকষ্টের স্থায়ী প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করতে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন; এ দৃশ্য অসহ্য, অবিলম্বে কাজে লেগে পড়ার জন্য নিজেকে তৈরী না করলে আর চলে না। এর জন্য তাঁর প্রয়োজন চিন্তার একাগ্রতা, দেশের লোকের অবস্থার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং হিন্দুশাস্ত্র ও আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে আরো গভীর, আরো বিস্তৃত জ্ঞান। ইতঃপূর্বে ভ্রমণ উপলক্ষে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, এখন ঠিক করলেন দক্ষিণ ভারতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে কন্যাকুমারীর পবিত্র মন্দিরে মাকে দর্শন করবেন ; তাহলেই হিমালয় থেকে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। আর এই পরিকল্পিত পথে সম্পূর্ণ একাকী চলে তিনি এসব দেখতে চাইলেন, যাতে যে-সমস্যাটির আশু সমাধানের জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছে, পুরো মনটাই সেই সমস্যার

ওপর দিতে পারেন। কিছুদিনের মতো তাঁকে গুরুভাইদের কথা ভুলে থাকতে হবে, তাঁর ভালবাসা ও উৎকণ্ঠার ওপর গুরুভাইদের যে দাবি তা উপেক্ষা করতে হবে ; জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এবং তাঁর প্রিয়তম গুরুর আদেশ পালন করার জন্য তিনি তা করতে পারবেন। এই ভেবে গুরুভ্রাতাদের প্রতি স্নেহের বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সরে পড়লেন।

বিবেকানন্দ মীরাট থেকে দিল্লী গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ রাস্তা পায়ে হেঁটে রাজপুতানা, কাঠিয়াওয়ার, বোম্বাই, মহীশূর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর এবং মাদ্রাজ হয়ে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে রামেশ্বরে ও কন্যাকুমারীর পবিত্র মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন। সঙ্ঘরূপ সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে মুক্ত সিংহের মতো তিনি স্বাধীনভাবে তেজোদৃপ্তপদে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করেছেন। পথে বহুবার তাঁকে অনাহারের ও সমূহ জীবন-সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর শান্ত, স্থির মানসসায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠে নি। মরুভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করেছেন, ধর্মোন্মাদ তান্ত্রিকদের কবলে পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কোথাও কখনো বা অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছেন, কত হৃদয়হীন অপরিচিতের বিদ্রূপ এবং নিন্দাবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু দুঃসাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসঙ্কুল পথের ওপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তিনি যখন অতিথিরূপে বাস করেছেন, তখন তাঁদের সহৃদয়তায় কখনো আনন্দ-উদ্বেল হয়ে ওঠেন নি, গুণমুগ্ধ অভ্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হন নি। দণ্ড-ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকবসন এই সন্ন্যাসী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তা যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন

ঠিক ততখানি তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে। আবার যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন সমপরিমাণ মানসিক স্থৈর্য নিয়েই। প্রায় তিন বছর পরে 'সন্ন্যাসীর গীতি'* নামক যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, তাতে এই মানসিক স্থৈর্যের আভাস কিছুটা পাওয়া যায়:

"ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ-প্রহারিবে;
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না কখন,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন;
কোথা অপযশ কোথা বা সুখ্যাতি?
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি;
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি,
জানি এ একত্ব-আনন্দ অন্তরে
গাও হে সন্ন্যাসী নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥"

তিনি ছিলেন দুর্বলতার ঠিক বিপরীত পর্যায়ের ধাতুতে গড়া। মুক্তাত্মা মহাশক্তিমান প্রকৃতিবিজয়ী পুরুষের ভূমিকায়, মানবজাতির আচার্যের ভূমিকায় তাঁর শির সর্বদা সমুন্নত থাকত। পৃথিবীর কারো কাছে কখনো তিনি নতশির হন নি। রাজা-মহারাজাদের সামনেও তিনি যথেচ্ছ আচরণ

* স্বামী শুদ্ধানন্দ-কৃত অনুবাদ; মূল কবিতাটি, 'The Song of the Sannyasin,' ইংরেজীতে লিখিত।

করতেন, নির্মম সমালোচনা করতেন তাঁদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর। কোন পূর্ব-সংস্কার, কোন প্রথা, জাতি বা সংস্কারগত বিভেদের কোন চিন্তাই এই মুক্ত সিংহের নিঃশঙ্ক বিহারে বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। কি ধর্মান্ধতা, কি উৎকট পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণনা—কোনটাই তাঁকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারত না; যে-কোন প্রচলিত রীতি বা উদ্ভট চিন্তার বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ও অন্তর্ভেদী যুক্তির আলোক-সম্পাতে নিজের পথ নিজেই খুঁজে বের করে নিয়েছিলেন। এমন কি শাস্ত্রের উক্তি সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল, এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের বক্তব্যের ওপরও তিনি পুরোপুরি নির্ভর করে থাকতে চাইতেন না। তবু অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে তিনি সমীপাগত সকলেরই কাছে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। তাঁর অকপট ভালবাসা ও সকলের প্রতি সহানুভূতি, তাঁর পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, তাঁর গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য এবং সর্বোপরি তাঁর তেজোদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইরে থেকে কখনো কখনো তাঁকে বজ্রের মতো কঠোর, ভয়ঙ্কর বলে মনে হলেও অন্তরে তিনি সব সময় নয়নাভিরাম কুসুমের মতোই মনোরম ও কোমল ছিলেন। আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাসঞ্জাত তাঁর দৃপ্ত নির্ভীক আচরণকে কখনো কখনো অযথা দাম্ভিকতা বলে মনে হলেও একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেই চোখে পড়ত তাঁর অন্তরে প্রবাহিত সর্বানুস্যূত প্রেম ও বিনয়ের চিরন্তন ফল্গুধারা। মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত। ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের এই সংযোগই বহু ভাগ্যবানের অন্তরে, এমন কি মহীশূর ও আলোয়ারের মহারাজার মতো ভারতের সর্বোচ্চশ্রেণীর লোকের অন্তরেও একটা আজীবন-স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল।

ঈশ্বর ও নররূপী ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সর্বাত্মক প্রেম ছাড়াও তাঁর হৃদয়ে ছিল জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কাছে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পার্থক্য চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানের

প্রত্যেকটি বিভাগই তো মানুষের সঙ্গে জড়িত, আর মানুষ তো স্বরূপতঃ ভগবান! মানুষ বলতে কয়েকটা আবরণের সমষ্টি বোঝায়—দৈহিক আবরণ, বৌদ্ধিক আবরণ ও আধ্যাত্মিক আবরণ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর মূলাগ্রভাগগুলি মানুষের অভ্যন্তরস্থ ভগবানের ওপর আরোপিত এই আবরণ-গুলির যে-কোন একটিকে স্পর্শ করে রয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নৃকুলবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব, ইতিহাস ও জীবনী, জড়-বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক দর্শন—এ সবের ভেতর দিয়ে লেখক মানুষের এক একটা আংশিক ধারণা, জ্ঞানের এক একটা বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলেন। বিবেকানন্দ কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিলেন এগুলির ভেতর একটা সামঞ্জস্য-বিধান করতে, মানুষের ঈশ্বরস্বরূপতারূপ বৈদান্তিক জ্ঞানের সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দিতে; আর এভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব নামে অভিহিত জটিল হেঁয়ালিটির একটা ব্যাপক নিখুঁত সর্বাঙ্গীন ছবি জগতের সামনে তুলে ধরতে। এজন্যই দেখা যেত হিন্দু দর্শনশাস্ত্র তিনি যতখানি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন ততখানি মনোযোগ দিয়েই পড়েছেন ফরাসী উপন্যাস। রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতের কাছে কিছুদিন তিনি ব্যাকরণ পড়েছিলেন, আবার আমেদাবাদে থাকার সময় মনোনিবেশ করেছিলেন জৈন- ও মুসলমান-সংস্কৃতিবিষয়ক পুস্তকপাঠে; কাঠিয়াওয়ারের পোরবান্দরে থাকার সময় প্রায় নয় মাস হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে ব্যাপৃত ছিলেন, আবার আলোয়ারে এসে উদ্বেগভরা চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক নির্ভুল নিশ্চয়তায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের একটা সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে।

তবে জ্ঞান আহরণের জন্য নিজেকে তিনি শুধু গ্রন্থের সীমাতেই আবদ্ধ রাখতেন না। গ্রন্থ থেকে জ্ঞান-আহরণে তাঁর যতটা ঔৎসুক্য ছিল, ততটা ঔৎসুক্য নিয়েই তিনি চারপাশের জীবন্ত মানুষের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করতেন। তাঁর জ্ঞান-গ্রহণেচ্ছু উন্মুক্ত হৃদয় দীনতম লোকের কাছ

থেকেও জ্ঞান আহরণ করতে দ্বিধা করত না। হিমালয়ের উচ্চদেশবাসী নিরক্ষর পার্বত্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদের এককালে বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে; একই পত্নীর ওপর অনেকের সাধারণ অধিকারের মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান স্বার্থশূন্যতার যুক্তি দেখিয়ে কিভাবে এই অসঙ্গত প্রথাকে সমর্থন করা যায় তা তিনি তাদের কাছে শিখেছিলেন। রাজপুতানার মরু-অঞ্চলে এক সামন্ত রাজার প্রাসাদে একজন সাধারণ নর্তকীর গাওয়া আবেগময় সঙ্গীতের মাধ্যমে সমদর্শিতা সম্বন্ধে সজাগকারী জ্ঞানালোক পেয়ে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে যা কিছু কঠিন ও কেলাসিত হয়ে সংস্কাররূপে ছিল, এভাবে নানাস্থানে নানাজনের কাছ থেকে বিভিন্ন শিক্ষালাভ করার ফলে তা সবই দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ায় এমন একটি অবস্থা তাঁর হয়েছিল যে, হীনতম পাপীর অন্তরেও তিনি সাধুবৃত্তির স্পন্দন অনুভব করতে পারতেন। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা তিনি গুরুর মুখে শুনেছিলেন, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞা সহায়ে ইতঃপূর্বে নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে তা উপলব্ধিও করেছিলেন। এখন সে-সত্য তাঁর দৃষ্টিপথে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল; এমন কি দুর্বৃত্ত দুরাচারদের ভেতরেও এই দেবত্বকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, তাদের বহিরাচরণ এই দৃষ্টিকে অবরোধ করতে পারত না।

তাছাড়া ভারতের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে নিজের প্রত্যক্ষলব্ধ মূল্যবান জ্ঞানও তাঁর কিছু কম হয় নি। বিভিন্ন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিন্তার ও জীবনযাত্রার বৈচিত্রে পূর্ণ ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। তাঁর দক্ষিণভারত-পর্যটন যখন শেষ হল, ততক্ষণে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি হিন্দু-ভারতের সাংস্কৃতিক কাঠামোর পুরোটাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে ফেলেছে। ততদিনে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, যে-সব অসংখ্য বহু-

বিচিত্র সমাজাদর্শ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার সবগুলিই হল কয়েকটি মূলনীতিরই বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত বিবিধ আকারমাত্র, আর সেই মূল নীতিগুলিও ভারতের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একই আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে এই সত্যটি তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠল যে, কোন কেন্দ্রগত একত্ব শত-সহস্র বৈচিত্র্যকেও বুকে ঠাঁই দিতে পারে। তিনি বুঝলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বরূপ সত্যটি শুধু যে বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (যা তাঁর গুরু প্রত্যক্ষ করে প্রমাণিত করে গেছেন) তা নয়, সমগ্র প্রকৃতিই এই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে; মানুষের সামাজিক প্রথাগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে এই একই নিয়ম।

সমাজবিজ্ঞানের একজন উদাসীন ছাত্র, শৌখিন তথ্যান্বেষী, বা সমাজ-তত্ত্বের কাল্পনিক আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত একজন অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক মাত্র ছিলেন না তিনি; নির্লিপ্ত ভ্রাম্যমান দর্শক তো নয়ই। তাঁর বুদ্ধি যখন তথ্যরাজি সংগ্রহ করে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত, তাঁর হৃদয় তখন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল পর্যটন-পথের চারপাশে দেখা দুঃখকষ্ট-জর্জরিত লোকগুলির প্রতি প্রবল সহানুভূতির বেদনায়। সামাজিক অন্যায়ের বীভৎস প্রথার পায়ে বলিপ্রদত্ত এই সব অসহায় পদদলিত জনগণের মর্মন্তুদ দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাঁর সারা দেহমনে আগুন জ্বলে উঠল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি দরিদ্র, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মাতৃভূমির দিকে দিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্রামের বা নিদ্রার অবসর প্রায়ই জোটে নি, আর সব সময় গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিভাবে এই দৈন্য-জর্জরিত পতিত জনগণের উন্নতিবিধান করা যায়। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মধ্যে এই দাবদাহ বহন করে তিনি ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে কুমারিকা অন্তরীপে দেবী কন্যাকুমারীর পায়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; তারপর সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলেন ভারতের মূল ভূভাগ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমীপবর্তী একটি

শিলাখণ্ডে। অতি নির্জন এই শিলাখণ্ডের ওপর চারিদিকের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে বেষ্টিত হয়ে বসে মাতৃভূমির দিকে ফিরে চাইলেন তিনি; তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল কোটি কোটি মানুষের হৃদয়েব বেদনায় ভরা গোটা ভারতের চিত্র। গভীর প্রেম, অসীম সহানুভূতি ও অনন্ত হতাশার তীব্র আবেগ একই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠল; তারপর সহসা সে হৃদয় নিস্পন্দ হয়ে গেল। সেই নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার আলোকোচ্ছ্বাসে ঝলমল করে উঠল তাঁর চিত্ত, আর সে-আলোকে স্পষ্টরূপে নির্ভুলভাবে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর চলার পথ। একটা যবনিকা সরে গেল, চোখের সামনে ভারতের সত্যস্বরূপ ফুটে উঠল; তার সুপ্রাচীন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি যে কতখানি, তার বর্তমান অবনতির কারণ যে কি, তা সবই পরিষ্কারভাবে তিনি দেখতে পেলেন। দেখলেন, গোটা জাতটা যেন একটা বিশালকায় দৈত্যের মতো নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে; নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য তার প্রয়োজন শুধু আধ্যাত্মিক জাগরণ। আর জাতির এই লজ্জাকর মোহনিদ্রা কাটিয়ে দিয়ে কিভাবে তাকে জাগাতে হবে, তাও তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। হৃদয় ভরে গেল। বছরের পর বছর নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর এতদিনে তিনি তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটি সাধন-পীঠ খুঁজে পেয়েছিলেন; তবু নিজ পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য কালবিলম্ব না করে তিনি সে-পীঠ ছেড়ে উঠে পড়লেন, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে রামনাদ ও পণ্ডিচেরী হয়ে নিকটতম প্রদেশের রাজধানী মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হলেন।

এখানে একদল নিঃস্বার্থহৃদয় উৎসাহী যুবক আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে সমবেত হলেন। স্বামীজী তাঁদের হৃদয়ে মাতৃভূমির সেবায় পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গরূপ আদর্শের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। এই উৎসাহী শিষ্যদল অসীম শ্রদ্ধাভরে সেই মহদুদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়ে স্বামীজীর নির্দেশাধীনে কাজ আরম্ভ করলেন; জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এঁরা স্বামীজীর অনুগত

ছিলেন। বহু শিক্ষিত উৎসাহী লোকের আবাসভূমি দাক্ষিণাত্যের এই মহানগরীতে স্বামীজী তাঁর প্রচারোদ্দেশ্যে আমেরিকা গমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন।

বিশ্বমেলা উপলক্ষে আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হবার কথা স্বামীজী মাস চারেক আগে শুনেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের বাছা বাছা প্রতিনিধিদের এই বিরাট সম্মেলনে তিনি অন্তরের ভাবরাশি উজাড় করে দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন। তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, হিন্দুরা আবার যদি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে চায়, তাহলে প্রাচীন ঋষিদের ধর্মবিশ্বাসকে গতিশীল করে তোলা একান্ত প্রয়োজন ; হিন্দুধর্মকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রচারশীল হতেই হবে। তাঁর মনে হল, বৌদ্ধ-ও হিন্দু-ধর্মপ্রচারের যুগ হতে হিন্দু ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ এতকাল ধরে গুহায় ও অরণ্যে, মন্দিরে ও চতুষ্পাঠীতে লুকানো রয়েছে, জগতের সকলকেই তার সন্ধান দেওয়া তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। হিন্দুদের অপ্রিয় বর্জনশীলতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' শব্দ, যা খৃষ্টানদের 'হিদেন' ও মুসলমানদের 'কাফের' শব্দের অনুরূপ ; এই ভাব মৌলিক হিন্দুশাস্ত্রগত উদার ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। পাছে বিদেশীর নিশ্বাস লেগে হিন্দুধর্ম কলুষিত হয়ে যায়, সেই ভয়ে তার চারিদিকে প্রাচীর তুলে দেবার এই উন্মত্ত আগ্রহ বা গোঁড়ামি তাঁর কাছে একটা মস্তবড় ভুল বলে মনে হল ; মনে হল, উপনিষদের ঋষিদের সর্বজনীন শিক্ষার নিদারুণ বিকৃতির ফলেই এ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুদের এই নিন্দনীয় অস্পৃশ্যতার ভাবই এতদিন দম্ভ- ও ঘৃণা-ভরে বিড়ম্বিত করে এসেছে অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়কে এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন স্তরকেও। তাঁর বিশ্বাস, আদি পাপের মতো এই অস্পৃশ্যতা জাতির মাথায় এক অবর্ণনীয় দুঃখের বোঝা তুলে দিয়েছে। এই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি চিরাচরিত নিষেধ না মেনে হিন্দুভারতের বাণী সমুদ্রপারে বহন করে নিয়ে যেতে মনস্থ

করলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে সসম্মানে ভাব- ও আদর্শ-বিনিময়ই যুগ-প্রয়োজন, এর ফলে উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে নিশ্চিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের প্রচারের ফলে ভারতের প্রতি বহির্জগতের সম্ভ্রমও বাড়বে, আর বিশ্বজুড়ে নবজীবন এবং নবভাবের উজ্জীবনও ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে। তাঁর গুরুর সর্বজনীন ধর্মের বাণী শোনবার ও অনুধাবন করবার সময় জগতের এসেছে; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মে অবিশ্বাস ও সম্প্রদায়গত কলহের জলাভূমি থেকে মানবজাতিকে টেনে তোলার কাজে এই বাণী প্রভূত সহায়তা করবে। তাছাড়া ভারতীয় জাতিরও কল্যাণ হবে এতে। হিন্দুরা তখন একদিকে অবশকারী গোঁড়ামি আর অপরদিকে পাশ্চাত্যের উন্মত্ত অনুকরণ—এ-দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান; পাশ্চাত্যে অনুকূল ভাবের সাড়া জাগলে হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। প্রাচীনপন্থী জনগণের গতিশক্তিহীনতারূপ মোহ কেটে যাবে তাতে, এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সম্মোহনও তিরোহিত হবে। তখন সকলেরই আগ্রহ আসবে দেশকে পরিপূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে। কাজেই সমগ্র মানবজাতিকে বর্তমান সাংস্কৃতিক আদর্শের পঙ্ক থেকে উঠে আসতে সহায়তা করার জন্য যে-পথে চলবেন বলে তিনি স্থির করেছিলেন, সে-পথের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করে হিন্দু-নবজাগরণের এক যুগান্তর নিয়ে আসার পথও। এই পথই তাঁকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় নিয়ে গিয়েছিল; হিন্দু ঋষিদের প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে জগতের পরিচয় ঘটাবার জন্য এই মহাসভাটিকেই তিনি দৈবনির্দিষ্ট যোগ্যতম ক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন।

বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিচিত্র জ্ঞানের বিপুল বিস্তৃতি, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের অধিকার, সরস প্রত্যুত্তরদানের অসাধারণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধি এবং সর্বোপরি তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম ও জলন্ত

আধ্যাত্মিকতা মাদ্রাজ-ও হায়দরাবাদ-বাসীদের মনে স্থায়িভাবে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপ শোনার জন্য দলে দলে সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর কাছে সমবেত হতে লাগলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর পাশ্চাত্য অভিযানের কাজে সহায়তা করতে ব্রতী হলেন। তরুণ উৎসাহী শিষ্যগণ শহরে শহরে ঘুরে স্বামীজীর বিদেশযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির ফলে স্বামীজী বুঝলেন, যেভাবে তিনি কাজ করতে মনস্থ করেছেন তা দৈবানুমোদিত : স্বজ্ঞার এই অনুকূল ইঙ্গিতে তিনি খুশী হলেন। আমেরিকা যাবার সিদ্ধান্ত পাকা করার আগে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে পত্র লিখেছিলেন, সে আশীর্বাদ পেয়েও গিয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করবেন, কিন্তু খেতড়ির মহারাজা বিশেষ প্রয়োজনে নিজ ভবনে তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা করায় পূর্বব্যবস্থা বাতিল করে তাঁকে রাজপুতানায় যেতে হয়। সেখান থেকে তিনি বোম্বাই অভিমুখে রওনা হলেন,—ওখান থেকেই আমেরিকাগামী জাহাজে উঠবেন।

বোম্বাই যাবার পথে বিবেকানন্দ আবু-রোড স্টেশনে নেমে সেখানে কয়েকদিন ছিলেন। সেখানে তাঁর দুজন গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর কথায় ও মনোভাবে তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁর হৃদয়-সাগর তুমুল তুফানে উচ্ছলিত হচ্ছে, যা অনতিবিলম্বে উদ্বেল হয়ে প্রবলপ্রবাহে বেরিয়ে এসে জগৎ ভাসিয়ে দেবে ; তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "হরি ভাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্ম যে কি, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! কিন্তু আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গিয়েছে, অপরের প্রতি দরদী হতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, আমি এটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করছি।" এগুলি ফাঁকা কথা নয়, তাঁর অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিল। কথাগুলি বলার সময় তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে বেদনা ও তীব্র আবেগ গভীরভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। আর্ত মানবের

জন্য তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়মূল সমবেদনার সামান্য অংশমাই এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে প্রকাশ করে কিছুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে বসে রইলেন, তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। এর বহু পরে কয়েকজন উৎসুক শ্রোতার কাছে তুরীয়ানন্দ এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "স্বামীজীর মুখে এই করুণামাখা কথা যখন শুনলাম, তাঁর এই মহিমান্বিত বিষাদের রূপ যখন চোখে পড়ল, তখন আমার মনের ভেতর যে কী হচ্ছিল, তা একবার কল্পনা কর দেখি! ভাবলাম, 'এ তো বুদ্ধদেবেরই ভাষা, এ তো বুদ্ধেরই হৃদয়!' মনে পড়ল, বহুদিন আগে তিনি যখন বোধগয়ায় গিয়েছিলেন, বোধিদ্রুমতলে বসে ধ্যান করছিলেন, সেই সময় বুদ্ধদেব তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছিলেন।...আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, মানবজাতির সমুদয় দুঃখকষ্ট এসে তাঁর স্পন্দিত হৃদয় বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল। অপরের জন্য সহানুভূতির ঝড় বয়ে যেত তাঁর হৃদয়ে; সে হৃদয়াবেগের অন্ততঃ আংশিক পরিচয় না পেলে বিবেকানন্দকে ঠিকমতো বোঝা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।... এই বুকফাটা সমবেদনাতেই তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত-অশ্রু ঝরে পড়ত। তোমরা কি মনে কর এই রক্তাশ্রুপাত বিফল হয়েছে? নিশ্চয়ই না! দেশের জন্য পাতিত তাঁর অশ্রুর প্রতিটি বিন্দু থেকে, তাঁর অমিতশক্তি হৃদয় হতে ধীরভাবে উত্থিত প্রতিটি অগ্নিময়ী বাণী থেকে দলে দলে মহাবীরেরা জন্মলাভ করবে, চিন্তায় ও কর্মে তারা সমগ্র জগৎটাকে কাঁপিয়ে দেবে।"

প্লাবনোচ্ছ্বাস

প্রিয় জন্মভূমির মর্মন্তুদ দুঃখদৈন্যের অসহ্য যন্ত্রণা হৃদয়ে নিয়ে এবং বহির্জগতের সঙ্গে একটা প্রাণবন্ত সসম্মান সাংস্কৃতিক সংযোগের মাধ্যমে সে দুর্দশার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য অন্তর্জাত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ

হয়ে একক, নির্বান্ধব বিবেকানন্দ ঈশ্বরেচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে ভারত ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিজেকে আলাদা করে রাখার তীব্র মনোবৃত্তির প্রাকারে বেষ্টিত হিন্দুজীবন বহু শতাব্দী ধরে সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত ছিল ; হিন্দুদের নিজেকে আলাদা করে রাখার এই প্রথার জন্ম হয়েছিল বোধ হয় মধ্যযুগে—মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। হিন্দুদের সমাজ-প্রথায় সেসময় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল ; এ-অপরাধে অপরাধীদের শাস্তি ছিল ধর্ম- বা সমাজ-চ্যুতি। সমাজের এই নিষেধটির প্রয়োজন বহুদিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ও সহজে ভাব- ও আদর্শ-বিনিময়ের এই যুগেও সে-নিষেধ বলবৎ থেকে উন্নতির পথে শুধু বাধাই সৃষ্টি করে চলেছিল। এই সমাজপ্রথা অমান্য করে বিবেকানন্দকে যে তাঁর নির্ধারিত কর্মপথে প্রথম পদক্ষেপ করতে হয়েছিল, তা তাৎপর্যহীন নয়। হিন্দুসন্ন্যাসীর সহজাত নির্জনবাস- ও তীর্থপর্যটন-রূপ প্রবৃত্তিকে দমন করে এপথে নামতে হয়েছিল তাঁকে। গোটা জগৎটাই কি ঈশ্বরের পবিত্র প্রকাশ নয়? গোটা জগৎটাই কি তীর্থ নয়? দেহবর্ণ বিভিন্ন হলেও প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন বলে সকলেই তো সমভাবে পবিত্র। এরূপ সর্বজনীন ও সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং হিন্দু-সমাজের যুগের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থহীন এই নিষেধটি অমান্য করে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে বিবেকানন্দ বোম্বাই-এর বেলাভূমি পরিত্যাগ করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের পথে আমেরিকার দিকে অগ্রসর হলেন তিনি। চীন ও জাপান দেখার যেটুকু সুযোগ হয়েছিল, তাতেই তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, ভারত হতে বহু বহু পূর্বে আগত আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রবাহ এখনও এ-দুটি দেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে যাচ্ছে ; এতে তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি। আবার আধুনিক জাপানের সমৃদ্ধি দেখে মাতৃভূমির বর্তমান দুরবস্থার কথাও তাঁর মনে পড়ে তাঁর অন্তরকে বেদনায় বিদীর্ণ করল। অতীত ভারতের জন্য অসীম শ্রদ্ধা,

বর্তমান ভারতের জন্য গভীর সমবেদনা ও ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য স্বপ্নালোক-দৃষ্ট অস্পষ্ট আশা হৃদয়ে পোষণ করে সমুদ্র পার হয়ে তিনি আমেরিকায় পৌঁছুলেন।

ভাঙ্কুভার বন্দরে অবতরণ করে* ট্রেনযোগে তিনি সোজা চিকাগোর দিকে চললেন। বিশ্বমেলা দেখে তাঁর চোখ ঝলসে গেল, মনে হল গোটা পাশ্চাত্য সভ্যতাটাকে যেন সংক্ষিপ্ত করে ঠেসে দেওয়া হয়েছে তার ভেতর। পরিচ্ছন্নতার অতি উচ্চ মান, কার্যনির্ভুলতা ও সংঘবদ্ধ দক্ষতা, যান্ত্রিক ইন্দ্রজাল, উপযোগিতা ও সৌন্দর্যবোধের বিস্ময়কর সমন্বয়, ঐশ্বর্য ও বিলাস-সামগ্রীর অপূর্ব জাঁকজমক—গৌরবের উচ্চশিখরে আরূঢ় নতুন জগতের এসব বিচিত্র দৃশ্যের সমাবেশ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন তিনি। প্রদর্শনীর চারিদিকে অপূর্বসুন্দর বসনভূষণে ভূষিত মার্জিতরুচি নরনারী। পাশ্চাত্য জীবনের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করে পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে তাঁর পূর্বের কল্পনা শূন্যলীন হল। পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল ঐশ্বর্য-দীপ্তি দেখে স্তম্ভিত হলেন তিনি, তার মহিমা অন্তরে অনুভব করলেন, প্রশংসা করলেন এবং পাশ্চাত্য জাতির যে বহুশতাব্দীব্যাপী অদম্য আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ফলে এর উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

এর সঙ্গে তাঁর দারিদ্র্য- ও মলিনতা-লিপ্ত মাতৃভূমির করুণ পার্থক্যের ছবি মনে জেগে তাঁর কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। হৃদয়ে একটা গোপন ক্ষত বহন করে মেলায় ঘুরে বেড়াতে এবং ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু এই বিশিষ্ট সভায় যথারীতি অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাউকে বক্তৃতা করতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না জেনে স্তম্ভিত হলেন। একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন—

---

* ২৫ জুলাই, সন্ধ্যায়।

যখন শুনলেন যে নতুন প্রতিনিধিরূপে তালিকাভুক্ত হওয়ার সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় সংবাদ পর্যন্ত সংগ্রহ না করে হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে তিনি ভারত ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। ভগবদিচ্ছা-মাত্রে নির্ভরশীল, আধ্যাত্মিক ভাবতের সরল শিশু বিবেকানন্দ সুসংগঠিত ধর্মমহাসভার প্রবেশদ্বারে এসে প্রতিহতগতি হয়ে দেখলেন যে, কোন সংঘবদ্ধ সমিতির সনদ না দেখাতে পারলে সে-দ্বার কারো জন্য খুলবে না। ভ্রমনির্মুক্ত সন্ন্যাসী হতাশার হিমশীতল স্পর্শে অবশ হয়ে এলেন। যাই হোক, শীঘ্রই সে ভাব কাটিয়ে উঠে, মহাসভায় কিছু বলার সংকল্প পরিত্যাগ করে সামর্থ্যমতো দেশটাকে একবার ঘুরে দেখে যেতে মনস্থ করলেন তিনি।

আসার সময় পথে পদে পদে অর্থলোভী হাঙ্গরদের পাল্লায় পড়ে তাঁর সম্বল প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তাছাড়া সামনে শীতকাল; সে দারুণ শীত নিবারণ করার মতো উপযুক্ত পরিচ্ছদও তিনি সঙ্গে আনেন নি। সাহায্যের জন্য তিনি মাদ্রাজে শিষ্যদের কাছে তার করলেন। একটি সংঘবদ্ধ সমিতির কাছে অর্থের জন্য আবেদনও জানালেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমিতির প্রধান পরিচালক সাহায্যে অনিচ্ছুক হয়ে ব্যঙ্গ করে উত্তর পাঠালেন, "শয়তানটা শীতে মরে যাক।" ভগবদ্‌বিধানের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে তিনি অবশ্য অবিচল হয়ে রইলেন; একজন শিষ্যের কাছে লিখেছিলেন, "মেরীপুত্রের সন্তানদের মধ্যে এখানে রয়েছি আমি, যীশুখৃষ্ট আমাকে সাহায্য করবেন। বোষ্টনের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য জেনে বোষ্টন শহরের দিকে তিনি তখনই রওনা হলেন। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনে আমেরিকা-বাসী একজন মহিলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়; মহিলাটি অসীম সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁকে বোষ্টনে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করে দেন। অধ্যাপকটি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এত মুগ্ধ হলেন যে, তাঁকে স্পষ্ট বলে বসলেন যে,

ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করার অধিকারের জন্য যদি তাঁর পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়, তাহলে সূর্যকেও আলো দেবার অধিকারের জন্য পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। অধ্যাপক রাইটের এক বন্ধু মহাসভার সদস্যনির্বাচনী-সভায় সভাপতি হয়েছিলেন; একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে স্বামীজীকে তিনি তখনই এই বন্ধুটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রের মর্ম একটি ছত্রেই বোঝা যাবে, "ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি আমাদের সমস্ত পণ্ডিত অধ্যাপকদের একত্র করলে যা হয়, তার চেয়েও বেশী শিক্ষিত।" এই পত্রের বর্মে সজ্জিত হয়ে নতুন আশায় সঞ্জীবিত স্বামীজী চিকাগোয় ফিরে গেলেন। স্টেশনে পৌঁছুতে দেরি হল, সমিতির ঠিকানাটিও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন; কাজেই কোথায় যেতে হবে ঠিক করতে না পারায় স্টেশন-প্রাঙ্গণে একটা খালি বাক্সের ভেতর ঢুকে সে রাত্রি কাটালেন। পরদিন সকালে উঠে গন্তব্যস্থানের সন্ধানে শহরে বেরুলেন। সন্ধানের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় রাস্তার ওপর বসে পড়তে হল এক জায়গায়। এমন সময় যেন দৈবপ্রেরিতা হয়ে রাস্তার বিপরীত দিকের বাড়ি থেকে একজন সহৃদয়া মহিলা বেরিয়ে এসে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হলেন। এই মহিলাটির সহায়তায় অবিলম্বে তিনি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেলেন এবং কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থামতো প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে লাগলেন।

এভাবে সারা পথে প্রতারকগণ কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়ে ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রাচুর্যে মগ্ন জনতার মাঝখানে অসহায়ভাবে ঘুরে ঘুরে এবং মহাসভার কড়া নিয়মকানুনের ধাক্কায় তার দ্বারদেশ থেকে প্রতিহত হয়ে যাবার পর অবশেষে অনুকূল প্রতিবেশের সমবায়ে স্বামীজী আবার যথাস্থানে ও যথাযোগ্য আসনে ফিরে এলেন—যার জন্য ভারতবর্ষ থেকে এতখানি পথ তিনি অতিক্রম করে এসেছেন। প্রথম দিকের এই প্রচণ্ড আঘাত এবং তারপরই সুসংবাদের ও বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ দেখে স্বামীজী প্রাণে প্রাণে বুঝলেন যে, ভগবানই

হাত ধরে তাঁকে ধীর ও নিশ্চিতভাবে এক মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের দিকেই পরিচালিত করে নিয়ে চলেছেন।

মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয় ১১ই সেপ্টেম্বর। নয়নাভিরাম বসনে ভূষিত, পৌরুষদৃপ্ত, তেজোপূর্ণকলেবর স্বামীজী প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিজ পরিচয়প্রদান উপলক্ষে সর্বশেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণদানের জন্য তিনি অপেক্ষা করে রইলেন অপরাহ্ণ পর্যন্ত। বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াবামাত্র সকলের সপ্রশংস উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হল রবিদ্রাভ উষ্ণীষ ও কমলাবর্ণের কটি-বন্ধনী-সংযুক্ত গৈরিক পরিচ্ছদের পটভূমে প্রকাশিত তাঁর উন্নত, দীপ্তিমান, রাজোচিত আকৃতির ওপর, তাঁর রুক্ষ কেশদাম, আয়ত উজ্জ্বল নয়ন ও রক্তাধরশোভিত উজ্জ্বলশ্যাম মুখমণ্ডলের ওপর। প্রথমেই "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ" বলে শ্রোতাদের সস্নেহ সম্ভাষণ করা মাত্র সভাগৃহের চতুর্দিক থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠে তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। সভা নিস্তব্ধ হলে বিবেকানন্দ তাঁর হৃদয় উজাড় করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। প্রাণহীন ভণিতা, দুর্বোধ্য শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, শূন্যগর্ভ বা হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্যাড়ম্বরের ভেতর না গিয়ে তিনি পরিপূর্ণ হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত অলঙ্কারহীন সহজ সরল ভাষায় একজন আধিকারিক পুরুষের মতো কথা বলে চললেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনরূপ তুহিনাবৃত উত্তুঙ্গ শিখরে একদা ঈশ্বর ও মানবরূপী ঈশ্বরের জন্য সীমাহীন প্রেমের এবং সর্বধর্মের অন্তর্গত বিশ্বজনীন বিশ্বাসের যে অধ্যাত্মধারা উৎসারিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সেখান থেকে ঝরে পড়ে তাঁর মনোনীত শিষ্যের পবিত্র হৃদয়ে সঞ্চিত হয়েছিল, সহসা তা সব বাঁধন টুটে দিব্য জ্ঞান ও প্রেমের প্রচণ্ড প্রবাহাকারে বেরিয়ে এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে সভাগৃহ প্লাবিত করে দিল। হিন্দু ঋষিদের সুপ্রাচীন অসীম উদারতার বাণী শুনে ভাবমুগ্ধ শ্রোতারা ধর্মবিভেদের এবং গির্জা- ও সম্প্রদায়-গত বিভেদের অতীত

নতুন একটা আলোর সন্ধান পেলেন। বহুলোকের দৃষ্টি খুলে গেল, বহু লোকের হৃদয় উদ্বেলিত হল, এবং যথাযোগ্য অতুলনীয় জয়ধ্বনিতে সকলে বক্তাকে অভিনন্দিত করলেন।

মহাসভার শেষ অধিবেশন পর্যন্ত, ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তিনি দশ কি বারোটি বক্তৃতা করেছিলেন; সেগুলির মাধ্যমে তিনি সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের পরিচিত করে দিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চভাব ও আদর্শগুলির সঙ্গে এবং বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বজনীন ধর্মের মূল ভাবগুলির সঙ্গে। শেষ অধিবেশনের দিন বক্তৃতার সময় যে ভাবোদ্দীপ্ত কথা তিনি বলেছিলেন, তার ভেতর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে; এই ভাবই পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের বাণীর মূলসূত্র। যথাসাধ্য জোর দিয়েই তিনি বলেছিলেন, কোন খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হয়ে যেতে হবে না। নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপরের ভাব গ্রহণপূর্বক জীবনে তা সহজ করে নিতে হবে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই বেড়ে উঠতে হবে সকলকে।...ধর্মমহাসভা জগৎকে যদি কিছু দেখিয়ে থাকে, তা হচ্ছে এই: জগতের কাছে এই সভা প্রমাণিত করেছে যে, ভাব-শুদ্ধতা, পবিত্রতা, ও বদান্যতা—এসব পৃথিবীর কোন ধর্মবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, এবং প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েই অতি উন্নতচরিত্রের নরনারীরা জন্মগ্রহণ করেছেন। এই প্রমাণ পেয়েও যদি কেউ স্বপ্ন দেখেন যে শুধু তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে, বাকী সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে, তাহলে সত্যিই আমি তাঁর জন্য গভীরভাবে দুঃখিত, এবং তাঁকে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বাধা দেওয়া সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হবে—"সংগ্রাম নয়, সহায়তা", "অপরের ভাব গ্রহণ করে নিজের করে নাও, তাকে ধ্বংস করতে যেও না", "সামঞ্জস্য ও শান্তি, বিবাদ নয়।"

মহাসভা-আহ্বানের উদ্দেশ্য যাই-ই থাকুক না কেন, উদ্যোক্তারা অবশ্য

কেউ আশা করতে পারেন নি যে এশিয়া মহাদেশের পৌত্তলিকতার অতলস্পর্শী গহ্বর থেকে উত্থিত হয়ে বিবেকানন্দের মতো একজন মনীষী আত্মপ্রকাশ করবেন, এবং সভায় উপস্থিত খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত প্রতিভূদের কল্পনারও অতীত উদার, সহনশীল ও যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গী সহায়ে দর্শকদের বিমোহিত করে ফেলবেন। বিবেকানন্দই ধর্মমহাসভায় বিশ্বজনীন ভাব জাগিয়ে তোলেন এবং জগতে বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে সহনশীলতা, শান্তি ও বন্ধুত্ব স্থাপনের মহতী প্রচেষ্টার নিদর্শনরূপে সে-সভাকে অমর করে দিয়ে যান। ধর্মবিষয়ে বহুবিচিত্র ও বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবন্ধ-সংগ্রহের সভামাত্র না হতে দিয়ে ধর্মমহাসভাকে তিনি উন্নীত করেছিলেন জগতে সর্বজনীন ধর্মের গৌরবময় ভাবের আলোকবর্ষী এক মহান্ সম্মেলনের মর্যাদায়। তাঁর নিজের অবদানই তাঁকে সহায়তা করেছিল ধর্মমহাসভাকে এভাবে সম্ভ্রম দেখাতে—"অশোকের সভা ছিল বৌদ্ধ বিশ্বাসের সভা। আকবরের সভা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেও হালকা আলোচনা-সভাতেই তা সীমায়িত ছিল। ভগবান সব ধর্মের মধ্যেই রয়েছেন, একথা জগৎ জুড়ে ঘোষণা করার কাজ আমেরিকার জন্যই গচ্ছিত ছিল।"

সকলের জন্য ভালবাসা ও আচার্য-সুলভ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মনোরম প্রকাশভঙ্গী মিলিত হয়ে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিকে একবাক্যে তাঁর প্রশংসায় ও সশ্রদ্ধ জয়গানে মুখর করে তুলেছিল। 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে খোলাখুলি লিখেছিল, "ধর্মমহাসভায় তিনিই যে মহত্তম ব্যক্তি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং তাঁর কথা শুনে আমাদের হুঁশ এসেছে যে, এই জ্ঞান-সমৃদ্ধ জাতির কাছে প্রচারক পাঠিয়ে কী বোকামিই না করেছি আমরা।" 'দি বোস্টন ইভনিং ট্রান্সপোর্ট' স্বামীজীর আকর্ষণী-শক্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছিল, "তাঁর ভাবসমৃদ্ধি ও চেহারার জন্য মহাসভায় তিনি অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। মঞ্চের ওপর দিয়ে তিনি

শুধু হেঁটে গেলেই শ্রোতৃমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করে ওঠে।...শেষ পর্যন্ত লোককে সভাগৃহে রেখে দেবার জন্য সভার অনুষ্ঠানসূচীতে বিবেকানন্দের নাম শেষের দিকে রাখা হয়।...শুধু মিনিট পনের বিবেকানন্দের কথা শোনার জন্য কলশ্বাস হলে চার হাজার অনুরাগী শ্রোতা হাসিমুখে প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকবে, অন্যদের বক্তৃতা শেষ হবার জন্য একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করবে।" এভাবে বহু পত্রিকার অজস্র স্তুতিগানে গোটা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

জনতার ঔৎসুক্যের সহজ লক্ষ্য, প্রায় কপর্দকহীন ও সহানুভূতির পাত্র, ধর্মমহাসভায় অননুমোদিত ও অপরিচিত অবস্থায় আগত, বিচিত্র পরিচ্ছদ-ভূষিত এই বিদেশীটি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো উদিত হয়ে আমেরিকার সমাজের আকাশ জুড়ে বসলেন। তাঁকে সর্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মার্কিন সমাজে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ধনী, শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের গৃহদ্বার অবারিত হল তাঁর কাছে: গুণমুগ্ধ নিমন্ত্রকদের সশ্রদ্ধ হৃদ্যতায় ও বিলাস-প্রচুর আতিথেয়তায় অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি। মাতৃভূমির জন্য ব্যথিতহৃদয় এই দরিদ্র সন্ন্যাসী সম্মান ও স্বীকৃতির উচ্ছ্বাসে নিজেকে অবশ্য হারিয়ে ফেললেন না। নিজ মহান্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি কঠোর কর্মে ব্রতী হলেন এবং এই বিরাট দেশের জনগণকে ভারতের সম্বন্ধে, তার প্রাচীন গৌরবময় সংস্কৃতি ও তার বর্তমান নিদারুণ দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। সাধারণ মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে, ঘরে বসে সদালাপ করে সমীপাগত শত শত লোকের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

একটি বক্তৃতা-সংসদে নাম লিখিয়ে কিছুদিন তিনি চিকাগো, সেন্ট লুই, ডেট্রয়েট, বোষ্টন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরগুলিতে সফর করে বেড়ান। বোষ্টন শহরে পাশ্চাত্য জীবনের কোন কোন দিকের তীব্র সমালোচনার ফলে তিনি শ্রোতাদের অপ্রীতিভাজন হয়ে ওঠেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাল মন্দ দুটো দিকেরই যথাযোগ্য মূল্যনির্ণয় করে যথেষ্ট স্পষ্টবাদিতা, সাহস ও উৎসাহ নিয়ে তিনি সর্বজনসমীপে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। ভারতীয় বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখার সময় তিনি আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রিয়তার, অর্থনীতি-পদ্ধতির, শিল্প-সংগঠনের, শিক্ষা-প্রণালীর, বিজ্ঞানের উন্নতিতে নিষ্ঠার, যাদুঘর ও চিত্রপ্রদর্শনশালাসমূহের এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসংবদ্ধ সমাজকল্যাণ-প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। আবার আমেরিকার জনসাধারণের কাছে কিছু বলার সময় জাতীয় দম্ভ ও স্বার্থপরতা, উন্মাদের মতো বিলাসের পশ্চাদ্ধাবন, পর-ধর্ম ও -সংস্কৃতিতে অসহিষ্ণুতা, অর্থনীতিক ভিত্তিতে দুর্বল-শোষণ এবং রাজনৈতিক জুলুম ও ষড়যন্ত্র—পাশ্চাত্য সভ্যতার এইসব মন্দ দিকগুলির তীব্র নিন্দা করতেন। মানবজাতির আচার্যরূপেই তাঁর স্থান সর্বাগ্রে; সেজন্য সত্য গোপন করে শ্রোতাদের মন-যোগানো কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মানবজাতির আধ্যাত্মিক গুরুগণ সহজলভ্য জনপ্রিয়তার জন্য লোকের খোশামোদ করতে পারেন না কখনো; বরং, উৎকট নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং পরকালের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ইহুদিদের তুল্য লোকদের চলার পথের ভ্রম সংশোধন করে দেবার জন্য প্রয়োজন হলে তাঁরা বরণ করে নেন তাদের বিরুদ্ধাচরণকে, আদালতের বিচারকে, এমন কি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আদেশকেও। অজ্ঞানজনিত বিকার ও মাত্রাতিরিক্ত অহংকার হল আধ্যাত্মিকতাবিহীন মানুষের মজ্জাগত স্বভাব, আর তার জন্য ধর্মাচার্যগণের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। বিবেকানন্দের এই স্পষ্টবাদিতাতেও একই ফল ফলল; বোস্টনের শ্রোতাদের চোখ তো খুললই না, বরং তাদের অহমিকায় আঘাত লাগল, সংবাদপত্রগুলি ক্ষেপে উঠল এবং ফলে একদল ঈর্ষাপরায়ণ লোক তাঁর অনিষ্টসাধন করার সুযোগ পেয়ে গেল। স্বামীজী অবশ্য অবিচলিতই রইলেন। প্রতিক্রিয়াশীল এই ক্রোধের তরঙ্গকে তিনি গ্রাহ্যই করলেন না, অনিষ্টকারীদের করুণার চোখে দেখতে লাগলেন।

ডেট্রয়েটে এসে বক্তৃতা-সংসদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে অনেকগুলি শহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন তিনি। শেষে নিউইয়র্কে এসে স্থির হয়ে বসলেন। একদল আন্তরিক আগ্রহশীল লোক এসে জুটল তাঁর কাছে; নিয়মিতভাবে তিনি তাদের জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ পড়াতে শুরু করলেন। যেসব শ্রদ্ধাবান আমেরিকাবাসী ভক্ত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিস গ্রীনসটাইডেল (পরে ভগিনী ক্রিস্টীন), মিস এস. ই. ওয়ালডো (পরে ভগিনী হরিদাসী), লেগেটদম্পতি ও মিসেস ওলি বুল-এর নাম উল্লেখযোগ্য। মিস যোসেফিন ম্যাকলাউডও এই দলের। আরো কয়েকটি উৎসাহী এসেছিলেন, কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতালাভের জন্য তাঁদের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা থাকায় স্বামীজী তাঁদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। যাই হোক, নিউইয়র্কে তাঁর ক্লাসের প্রথম শিক্ষাদান ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুআরি থেকে ঐ বছরের জুন মাস পর্যন্ত চলেছিল। এবই কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রাজযোগ রচনার কাজ শেষ হয়; তিনি বলে যেতেন আর তা শুনে লিখে রাখতেন এস. ই. ওয়ালডো। বইখানি আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়ম জেমস-এর মতো পণ্ডিতদের এবং রাশিয়ার টলস্টয়-এর মতো আধ্যাত্মিকতালিপ্সুদের কাছে সমভাবে মূল্যবান বলে সমাদৃত হয়েছিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে প্রায় বারজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে সেন্ট লরেন্স নদীতীরবর্তী 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক' নামক স্থানে তিনি বিশ্রাম করতে যান। এখানেই তিনি তাঁর দর্শনশাস্ত্র শিক্ষাদানের বিদ্যালয়টিকে পূর্ণাঙ্গ তপোবনে রূপায়িত করে তোলেন, এবং শিষ্যদের সাময়িক পরীক্ষামূলকভাবে আশ্রমজীবনযাপনে দীক্ষিত করেন। স্বামীজী এখানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন শুধু তাঁদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি নজর রাখায়, তাঁদের অধিকতর উন্নতির জন্য সহায়তা করায় এবং ধীরে ধীরে তাঁদের অন্তরে ধর্মের ভাব ও আদর্শ সঞ্চারিত করার কাজে। স্বামীজীর ভাবোদ্দীপ্ত বাণী

প্রতিদিনই চিন্তা-ও ভাব-রাজ্যের নতুন নতুন দরজা খুলে দিত, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রতিদিনই এই আধ্যাত্মিকতাপিপাসু দলটির জীবন পবিত্রতর ও উন্নততর করে তুলত। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও আবেগের প্রকাশদ্বার শিষ্যদের কাছে এখানেই তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে বায়ুপরিবর্তনের জন্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্যারিস হয়ে ইংলণ্ডে গমন করেন; কিন্তু বিশ্রামের পরিবর্তে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সেখানে। এই সময়েই একজন মাদ্রাজী শিষ্যের কাছে খুশী হয়ে তিনি লিখেছিলেন, "ইংলণ্ডে আমার কাজ সত্যিই অতি চমৎকার হয়েছে।" তিনি লক্ষ্য করলেন, ইংরেজরা কোন নতুন ভাব গ্রহণ করতে বড্ড দেরি করে, কিন্তু একবার কোন কিছু গ্রহণ করলে সারাজীবন তা আঁকড়ে পড়ে থাকার মতো দৃঢ়তা তাদের আছে। তাছাড়া তাঁর মনে হল, বিপুল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী বৃটিশ জাতি তাঁব প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র, এর মাধ্যমে সারা জগতে তিনি তাঁর ভাবরাশি ছড়াতে পারবেন। অল্পদিন তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন, কিন্তু তারি মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ বহুলোকের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে, শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করে। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি তাঁকে বুদ্ধ ও খৃষ্টের সমপর্যায়ভুক্ত আচার্য বলে সম্মান প্রদর্শন করতে দ্বিধা করে নি।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মাস তিনেকের জন্য তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন। নিউইয়র্কে নিয়মিত ক্লাশ নেওয়া ছাড়াও তিনি হার্টফোর্ডের 'মেটাফিজিক্যাল সোসাইটি', ব্রুকলিনের 'এথিক্যাল সোসাইটি', হার্ভার্ডের 'ফিলজফিক্যাল সেমিনার' প্রভৃতির শিক্ষিত শ্রোতাদের নিকট ঝড়ের মতো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এই কালেই জে. জে. গুডউইন নামক একজন ইংরেজ স্বামীজীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এই আদর্শবাদী সাংকেতিক-লিপিকারের সশ্রদ্ধ অধ্যবসায়ের ফলেই বিবেকানন্দের তৎপরবর্তী-

কালের বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে রক্ষিত হয়েছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে 'মাই মাষ্টার' (মদীয় আচার্যদেব) শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে নিউইয়র্কের জনসাধারণের কাছে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিচিত করেন। এইকালে স্বামীজীর সবচেয়ে বড় কাজ ছিল নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে ফ্রান্সিস লেগেটকে তার সভাপতি করে দিয়ে তাঁর আমেরিকার কাজ সংহত করে তোলা।

এভাবে তাঁর আমেরিকার প্রচারকার্যকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে, এবং তাঁর গুরুভাই সারদানন্দকে আমেরিকায় এসে নিউইয়র্কের কাজের ভার গ্রহণ করার জন্য চিঠি লিখে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন। সারদানন্দ আগেই লণ্ডনে এসেছিলেন; স্বামীজীর কাছে কর্মপরিচালনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিয়ে জুন মাসের শেষের দিকে তিনি নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। জনসভায় বক্তৃতা এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে নিয়মিত ক্লাসের মাধ্যমে ইংলণ্ডে কিছু পাকা কাজ করার জন্য স্বামীজী আবার ভীষণভাবে লেগে পড়লেন। এবারে অক্সফোর্ডের ভারত-তত্ত্ববিদ্ প্রবীণ শ্রদ্ধাস্পদ মনস্বী ম্যাকসমূলরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঘটে, এবং মিস মার্গারেট নোবল (পরে ভগিনী নিবেদিতা) সেভিয়ার দম্পতি ও মিস হেনরিয়েটা মূলর-এর মতো তাঁর কয়েকজন অবিচল অনুরাগী শিষ্যও জুটে যায়। সেভিয়ার দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে মাস দুয়েক তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে সুইটজারল্যাণ্ডের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কিছুদিন কাটিয়ে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপের বেদান্তদর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত পল ডয়সন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং সেখান থেকে হল্যাণ্ড হয়ে ফিরে আসেন ইংলণ্ডে। সুইটজারল্যাণ্ডে আলপস পর্বতের শান্ত স্নিগ্ধ শোভা দেখে হিমালয়ের উচ্চ-প্রদেশে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার কথা স্বামীজীর মনে জাগে* এরূপ

* এর পূর্বেও হিমালয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাঁর মনে জেগেছিল।

একটা আশ্রম তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণের উপযুক্ত মিলনক্ষেত্র হতে পারবে। সেভিয়ার দম্পতির মনে স্বামীজীর এই ভাবটি গেঁথে যায়, এবং সেটিকে বাস্তব করে তোলার কাজটি তাঁরা জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষের দিকে ইংলণ্ড থেকে রওনা হয়ে, পথে ইটালীতে অল্প কিছুদিন থেকে, স্বামীজী ভারতের দিকে রওনা হলেন। জীবনের বাকী দিনগুলি ভারতে থেকে শুধু অধ্যাত্ম-সাধনায় এবং স্বামীজীর ইচ্ছামতো হিমালয়ের ক্রোড়ে একটি আশ্রম গড়ে তোলার কাজে কাটিয়ে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে সেভিয়ার দম্পতিও স্বামীজীর সঙ্গ নিলেন।

ধর্মসমূহে নবপ্রাণ-সঞ্চার

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশের তিন বছরেরও বেশী সময় বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে কাটিয়েছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগতে প্রচার করার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে জগৎসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে পাশ্চাত্য যা কিছু দিতে পারে তা আহরণ করে নিয়ে আসার জন্য বিদেশে অশেষ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হিন্দুধর্মের মহার্ঘ অবদানের সঙ্গে তিনি হাজার হাজার পাশ্চাত্যবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন এবং এভাবে তাদের সসম্ভ্রম দৃষ্টিপথে ভারতকে তুলে ধরেছিলেন। তাছাড়া তিনি পাশ্চাত্যবাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আধুনিক যুগে সর্বজনীন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং সব ধর্মের মধ্যেই এই সর্বজনীন ভাব নিহিত আছে; ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাব। আমাদের সকলকেই ধর্মের এই মূল অংশের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হতে হবে। পাশ্চাত্যবাসীদের তিনি সজাগ করে দিয়েছিলেন যে, আজ সকলকে সাম্প্রদায়িকতার সীমারেখা অতিক্রম করে এসে ধর্মের সর্বজনীনতার এই মহান্ আদর্শ উপলব্ধি করতেই

হবে। জগতের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অন্তর্নিহিত হিন্দু-বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তাঁদের পরিচিত করে দেন। হিন্দু-ধর্মবিশ্বাসের নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষার কথা, তার সর্বজনীন বাণীর উদারতার কথা, একই ভগবানকে অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার কথা তিনি তাঁদের কাছে বিবৃত করেছিলেন। হিন্দুধর্মে মানুষের সর্ববিধ রুচি প্রকৃতি ও সামর্থ্যের উপযোগী বহুবিধ সাধনপ্রণালী আছে, যেগুলিকে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চারিটি মূলভাগে বিভক্ত করা যায়; সে-সব সাধনপ্রণালীর কথাও তিনি বিশদভাবে বলেছিলেন; কর্ম ও পুনর্জন্মবাদের কথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; আর বুঝিয়েছিলেন হিন্দুমতানুসারে কিভাবে পরব্রহ্মরূপ চরমসত্যের সঙ্গে নিজের অভেদত্ব উপলব্ধি করে মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারে। কি কারণে হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তির তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণও সহ্য করতে পারে এবং কেনই বা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে কখনো তার কোন সংঘর্ষই বাধে না, সেকথাও যুক্তিবিচারসহায়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, বেদান্তের উদার বিশাল বাণীর মধ্যে সব ধর্মেরই বিজ্ঞান যে নিহিত রয়েছে, একথা জোর দিয়ে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেদান্তকে অবলম্বন করে সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য জগৎ অনুভব করতে পারবে এবং ধর্মের এই সর্বজনীনতারূপ অনবদ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর সারা পৃথিবীর মানুষই মিলিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। এ সত্যটিও তিনি তাঁদের কাছে প্রকট করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের নিকট এমন একটি স্বর্ণময় সূত্র আছে যা দিয়ে কোনটিকে খর্ব বা অঙ্গহীন না করেও সে জগতের বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে দিতে পারে। তিনি বুঝিয়েছিলেন, জীবন ও অস্তিত্বের মূল সত্য সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিদের যে সিদ্ধান্ত, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। সমালোচনামূলক যুক্তির বিরোধিতা কাটিয়ে নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস আনার জন্য এবং অপর ধর্মমতগুলিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে

শেখার জন্য মানবজাতির সকল শ্রেণীর লোকই বেদান্তকে গ্রহণ করে আপনার করে নিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গভীর ও সুদূরপ্রসারী উপলব্ধিসহায়ে এ সত্যটি বহুপূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন; গুরুর সেই চরম আবিষ্কারের কথাই তাঁর যোগ্য লীলাসহচর জগৎকে সিংহগর্জনে শুনিয়ে গেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উপনিষদের সু-উচ্চ উদার বাণীর পুনরুজ্জীবনই হিন্দু-নবজাগরণ নিয়ে আসবে, আর সেই সঙ্গে জগতের সব ধর্মকেই একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে বন্ধুত্বসূত্রে একত্রবদ্ধ করবে। সেজন্য স্বামীজীর মতে হিন্দু-পুনর্জাগরণই হল বিশ্বজনীন ধর্মের শুভাগমন-বার্তাবাহী অগ্রদূত।

গুরুর ও নিজের উপলব্ধির আলোকসম্পাতে উদ্ভাসিত হিন্দুশাস্ত্র হতে স্বামীজী ধর্মসম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী আহরণ করে এনেছিলেন, যা আধুনিক যুগের বিদ্বৎসমাজের চাহিদার সর্বথা অনুকূল। তাঁর কথা শুনে পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মকে নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। "মানুষের অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম"—স্বামীজীর মুখে ধর্মের এই নতুন ব্যাখ্যা শুনে জনসাধারণের ধর্মবিরোধী মনোভাব নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছিল। স্বামীজীর মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তর হতে উদ্ভূত একটা উন্নতি, যা মানুষকে ক্রমোন্নত করতে করতে এগিয়ে নিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়, যেখানে পৌঁছে মানুষ পূর্ণত্ব সম্বন্ধে সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ মুক্তির রূপ নিজেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। সে তখন দেখে, যে-স্বর্গরাজ্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা চিরদিন তার অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। কোন কিছুর ক্রমবিকাশ বললেই বোঝা যায়, সেটা তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। কাজেই ক্রমবিবর্তিত মানুষের পূর্ণত্বও নিশ্চয়ই তার অন্তরেই বীজাকারে বর্তমান থাকে। মানুষ তার সমস্ত চিন্তার ভেতর দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই পূর্ণত্বকে বিকশিত করবার জন্যই চেষ্টা করে চলে। মানুষ যখন নিজ প্রকৃতিকে জয় করে ফেলে তখনই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়;

'স্বর্গবাসী পিতা' যতখানি পূর্ণ, সে তখন ততখানিই পূর্ণ হয়। তখন সে প্রত্যক্ষ করে যে প্রকৃতির নিত্যমুক্ত নিয়ন্তা এবং পূর্ণতার ও চিরমুক্তির আদর্শের মূর্তবিগ্রহ ভগবানই হচ্ছেন তার নিজের স্বরূপ। এ অবস্থায় যে-মানুষ পৌঁছায় তাকেই ধার্মিক বলা চলে। সেইজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম পুস্তকেও নেই, বুদ্ধির ধারণাতেও নেই, যুক্তিতেও নেই ; যুক্তি, কল্পিত মতবাদ, প্রমাণ, শাস্ত্রোপদেশ, গ্রন্থ, ধর্মাচার-অনুষ্ঠান—এ সবই হচ্ছে ধর্মের সহায়ক মাত্র। আসল ধর্ম রয়েছে উপলব্ধিতে।" সেজন্য ধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী শুধু শাস্ত্রপ্রমাণ, প্রথা ও অনুশাসনের ওপর জোর দেন নি, অতিপ্রাকৃতিকতা টেনে এনে বিষয়টাকে ঘোলাটে করেও তোলেন নি ; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুসারী সাধারণ বুদ্ধিতে যে বিষয়- ও ভাবগুলির সমর্থন পাওয়া যায় না, যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই সেগুলিকে মেনে নেবার কথা তিনি কাউকেই বলেন নি। ধর্মকে তিনি "মানবজীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব" বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মসম্বন্ধে এরূপ যুক্তিসম্মত ধারণা চিকাগোর জন হেনস হোমস-এর এই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যায় : "ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব। ধর্মকে অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে অভিহিত করলে ধর্মের কিছুই বলা হল না। ধর্মকে চাতুরী বা কল্পনা-প্রসূত কুসংস্কারও বলা যায় না। ধর্ম হচ্ছে মানবপ্রকৃতির উচ্চতর স্তরের ক্রিয়াকলাপের নিছক অনুভূতি মাত্র।"

এর পর স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অঙ্গমাত্রই নয়, ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন বিষয়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পূর্ণত্বলাভ করার জন্য এবং অনন্ত জীবন, আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মানুষের মজ্জাগত সংস্কার। মানুষের প্রকৃতিই তাকে সর্ববিধ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করার অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করে। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি মানুষকে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিরদিন চোখ বুজে থাকতে দেয় না ; জড় প্রকৃতির অনিত্যতাবোধ

হওয়া মাত্র নিজের নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভের উদ্দেশ্যে একটা চির-অস্তিত্বের অবলম্বনভূমি খুঁজে বের করার জন্য তার ভেতর থেকে অনুপ্রেরণা জাগে। জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী; কোন জাগতিক বস্তুর বিয়োগে হৃদয়ে যখন প্রচণ্ড আঘাত লাগে, মানুষ তখন এমন একটা বাস্তব অবলম্বন খুঁজে বের কবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে, যার সঙ্গে চিরদিন সে প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু "সে-মানুষের কাছেও মৃত্যু আসে—সে-মানুষও প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়, 'এ কি সত্য?' এই প্রশ্নের সঙ্গেই ধর্মের আরম্ভ, আর এর উত্তরে তার সমাপ্তি।" সত্য, চিরন্তন, পূর্ণ ও চিরমুক্ত আদর্শের জন্য—অর্থাৎ ভগবানের জন্য—যে সর্বজনীন অন্বেষণ, তার উদ্ভব হয় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিগত ধর্মানুপ্রেরণা হতেই। এইজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, মানুষের গঠনের ভেতরেই ধর্মভাব ওতপ্রোত রয়েছে; এতদূর পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ-মন ত্যাগ না কবতে পারছে, যতক্ষণ সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ না করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব।" স্বামীজী ধর্মকে মনুষ্য-জীবনের স্বাভাবিক ও সর্বজনীন বিষয় বলে নিজে অভিমত প্রকাশ করায় পাশ্চাত্য জগৎ তাঁর এই ধারণার মধ্যে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যবাসীদের তৎকালীন রুচির সঙ্গে তা অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েও গিয়েছিল। যেন স্বামীজীর ভাবেরই প্রায় প্রতিধ্বনি তুলে হ্যাভলক এলিস ধর্মকে ব্যাখ্যাও করেছেন "আধ্যাত্মিক ক্রিয়ারূপে, যা প্রায় শারীরিক ক্রিয়ারই মতো।"

স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানব-মনের পক্ষে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষন, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে

দেবার এই প্রয়াস—এ-সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস।"

ধর্মকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন, স্বাস্থ্যকর ও উন্নতিবিধায়ক ক্রিয়ারূপে অভিহিত করা ছাড়াও স্বামীজী একে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের আকর বলেও ঘোষণা করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "দেহ-গঠন যত নিম্নস্তরের হয়, প্রাণীর ইন্দ্রিয়-সুখেব অনুভূতি হয় তত বেশী তীব্র। একটা কুকুর বা একটা নেকড়ে যতটা আনন্দ নিয়ে খায়, খুব কম মানুষই সেভাবে খেতে পারে। কিন্তু কুকুর বা নেকড়েব সব সুখই যেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সব জাতিরই নিম্নস্তরের লোকেরা ইন্দ্রিয়সুখ নিয়েই মেতে থাকে, আব শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরা আনন্দের সন্ধান পায চিন্তাবাজ্য ও দর্শনবিদ্যাব মধ্যে, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্যে। আধ্যাত্মিকতা আবো উচ্চস্তরের ; বিষয়টি অসীম বলে তাব স্তরও সর্বোচ্চ, এবং যাদেব ধারণা করার শক্তি আছে তাদের কাছে এব আনন্দও সর্বোত্তম। মানুষ আনন্দ চায়, কাজেই উপযোগিতাব দিক থেকেও তার ধর্মচর্চা কবা উচিত, কারণ যত রকম আনন্দ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বয়েছে এখানে।"

তবু উপযোগিতাব নিক্তিতে ওজন কবে ধর্মের মূল্য নিধারণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি শিখিয়েছিলেন, চিরন্তন সত্যের শ্লাঘ্য অন্বেষণরূপে ধর্ম নিজেই নিজের পুবস্কার। উপযোগিতা দেখে যাঁরা মূল্য নিধারণ করেন তাঁদের তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই বলে, "প্রয়োজনসিদ্ধি ও অর্থের মান দিয়ে সত্যের বিচাব করা উচিত—এ প্রশ্ন তোলাব কী অধিকার আছে মানুষের? যদি ধরা যায় ধর্ম দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না, তাতে ধর্মেব সত্যতা কিছু কমবে কি? প্রয়োজন-সিদ্ধি সত্যের মাপকাঠি নয়।" তবু সব বিষয়েই যাঁরা 'টাকা-আনা-পাই' হিসেব করে চলেন, তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য স্বামীজী দেখিয়েছেন, ধর্মচর্চা বা পূর্ণতালাভের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সহায়ক হয় এবং

মানুষকে অসীম শক্তি ও আনন্দের অধিকারী করে তোলে। আরো একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন যে শুধু ব্যষ্টি নয়, ব্যষ্টির সমষ্টিরূপ সমাজও ধর্মের দ্বারা উপকৃত হয়। কারণ দেখা যায়, সমাজের প্রাণের পুষ্টিসাধনের ক্ষেত্রে ধর্ম সবচেয়ে বেশী শক্তিমান ও বেশী হিতকর। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলে গেছেন, "মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনো হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনটিই, যে-শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশী শক্তিমান নিশ্চয়ই নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সংহতির পটভূমি; পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছু প্রাণের বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শক্তি হতেই।...মানুষের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য সবচেয়ে বেশী বেগসঞ্চারী শক্তি এটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে, সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না। মানুষের ইতিহাস প্রথম থেকেই এর সাক্ষ্য বহন করে আসছে; এ শক্তি এখনো প্রাণবন্ত হয়ে আছে। কেবল উপযোগিতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে, একথা আমি অস্বীকার করছি না।...কিন্তু জগতে যাঁরা আলোড়ন তোলেন, যাঁরা জগতে আসেন আকর্ষণী-শক্তির একটা বিরাট আধার হয়ে, যাঁদের উদ্দাম ভাবধারা শত-শত সহস্র-সহস্র লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে, যাঁদের জীবনদীপের স্পর্শে অপরের জীবনেও আধ্যাত্মিকতার দীপ জ্বলে ওঠে,—সর্বত্র দেখা যায় এই ধরনের লোকের পটভূমি থাকে আধ্যাত্মিকতা। এঁদের প্রেরণা আসে ধর্ম থেকে। যে অনন্ত শক্তি জন্ম হতেই প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিগত, সে শক্তিকে উপলব্ধি করতে সর্বাধিক প্রেরণা দেয় ধর্ম; কাজেই ধর্মের বিচার এদিক থেকেই করা উচিত।" উইলিয়ম ইলেরী চ্যানিং এই-জাতীয় ভাবপ্রকাশ করে বলেছেন, "মানুষের সব অভাবের মধ্যে পরমতম অভাব হচ্ছে ভগবানের অভাব। ভগবৎ-সজাগতা মানুষকে নৈতিক সাহস দিয়েছে; অন্যান্য সব তত্ত্ব মানুষকে

যা দিতে পেরেছে তা একত্র করলে যা হয়, ধর্ম আমাদের তার চেয়েও বেশী কর্মশক্তি, সহ্যশক্তি ও দুঃখবরণ করার শক্তি দিয়েছে।" স্বর্গীয় রেভারেণ্ড জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড এর বিপরীত দিকটা ফুটিয়ে তুলে স্বামীজীর কথাই সমর্থন করেছেন—"যদি কখনো এমন দিন আসে যখন সারা জগতের লোক ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করতে থাকবে যে, অনন্ত মনের সঙ্গে সংযুক্ত কোন আধ্যাত্মিক বা ভাগবত সত্তা মানুষের নেই, অর্থাৎ আব একটু তলিয়ে বললে, ঈশ্বরের সন্তান সে নয়—তার অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে একটা সহসা-সংঘটিত প্রাকৃতিক কাবণে, সে একটা অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান পশুমাত্র, তাহলে তার ফল কি হবে? মানবজাতি তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাকে এতখানি নীচে টেনে নামালে যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার ফল ভয়ানক হয়ে উঠবে না কি? যেমন একটা দিক ধরা যাক—সমাজ, শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম, এসব বিষয়ে মানুষের অগ্রগতি সে-ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যাহত হবে না কি? উন্নতির প্রতি তার আস্থা কমে যাবে না কি? যত দিন যাবে, ততই সে এই কথাটাই বলতে চাইবে না কি—'দুদিন পরে তো মরেই যাবো, কাজেই খেয়ে-দেয়ে স্ফূর্তি করা যাক'?"

মানবসমাজের সমষ্টিগত নিবাপত্তা ও সুখের জন্য ধর্মের যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সে বিষয়ে স্বামীজীব বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য দেশ ধর্ম পবিত্যাগ করার দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকছে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল, ধর্মহীন সভ্যতা আর পালিশ-করা পাশবিকতা একই জিনিস; সে সভ্যতার ফলে অতীতের লুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্যগুলির মতো সমগ্র সমাজটাই নিশ্চিত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আতঙ্কে তিনি বলেই ফেলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতার প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে গোটা ইউরোপটা যেন একটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর এসে বসেছে, যে-কোন মুহূর্তে যাব অগ্ন্যুৎপাত শুরু হতে পারে। গত প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সারা ইউরোপে আর একটা বীভৎসতর যুদ্ধের আয়োজন দেখে স্বামীজীর

এ আশঙ্কা যে কত সত্য তা বোঝা যায়।* বর্তমানকালের ডঃ উইল ডুরান্ট-এর অকপট করুণ স্বীকৃতিতে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ফুটে উঠেছে: "কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল একটা নৈতিক পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জাতির প্রাণশক্তি ঠিক রাখা সম্ভব কি না, তা দেখার জন্য আমরা আমেরিকায় (যে আমেরিকা ভগবান ও ধর্মকে বাদ দিয়ে চলে) একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছি। এথেন্স-এ এবং (খৃঃ ১৪শ—১৬শ শতাব্দীর) পুনরভ্যুদীয়মান ইটালীতে এ পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।… …এর ফলে ইতোমধ্যেই সাহিত্য-নীতি ও পৌর-রাজনীতিতে আমেরিকার 'এ্যাংলো-স্যাক্সন' নেতৃত্বের অবক্ষয় সাধিত হয়েছে; পরীক্ষার কাজ আরও এগিয়ে গেলে (যদি এগিয়ে যায়) বোধ হয় পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সব মানুষকেই তা দুর্বল করে ফেলবে। শেষকালে একটা নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হব আমরা।"

স্বামীজী জোর দিয়ে বলে গেছেন যে, কোন ব্যক্তি বা সমাজের জীবনের মূল্য-নির্ণয় করতে হলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির মাপকাঠিতেই তা করা উচিত, শুধু তার পার্থিব সম্পদ বা প্রতিভার অবদান দেখে নয়। কাজেই পবিত্রতা, ভক্তি, বিনয়, অকপটতা, নিঃস্বার্থপরতা, প্রেম প্রভৃতি যেসব সদ্‌গুণ আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক, পৃথিবীর আর সব জিনিসের চেয়ে সেগুলির অনুশীলনের দিকেই আমাদের বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত। পাশ্চাত্য শ্রোতাদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের জাগতিক উন্নতি ও মানসিক উন্নতির পথে বাধা তো নয়ই বরং ধ্বংস ও বিভেদের শক্তিকে বিনষ্ট করে জগৎকে উন্নততর করে তুলবে। মনুষ্যপ্রকৃতির মহত্তর বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়ার জন্য জগতে যা কিছু সংঘর্ষ ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে, তার সবকিছু এতে দূর হয়ে যাবে। স্বামীজীর

* রচনাটি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের।

মতে সংগ্রামরত, রক্তসিক্তকায় ধরণীকে শান্তির স্বর্গধামে রূপায়িত করার ক্ষমতা আছে শুধু ধর্মের।

সভ্যতার অগ্রগতির জন্য ধর্মের বিশেষ প্রয়োজনের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেও, ধর্মের নামে ধর্মের অপপ্রয়োগকারীরা যুগে যুগে মানুষের সমাজে যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ টেনে এনেছে, তার ঐতিহাসিক প্রমাণের দিকেও তিনি চোখ ফিরিয়ে ছিলেন না। যথেষ্ট সাহস ও অকপটতা নিয়ে একথা তিনি স্বীকার করেছেন, "ধর্মের চেয়ে মানুষের বেশী মঙ্গলসাধন যেমন অন্য আর কোন কিছু থেকে হয় নি, তেমনি ধর্মের চেয়ে বেশী বিভীষিকা-সৃষ্টিও অন্য আর কিছু করতে পারে নি। ধর্মের মতো এত শান্তি ও ভালবাসা অন্য আর কিছু থেকে আসে নি, আবার তার মতো এত বীভৎস ঘৃণাও সৃষ্টি করতে পারে নি আর কিছু। ধর্মের জন্য মানুষের ভ্রাতৃত্ব যতটা দৃঢ় হয়েছে, ততটা দৃঢ় আর অন্য কিছুর জন্য হয় নি; আবার ধর্মের মতো মানুষের ভেতর একটা তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি করতেও পারে নি অন্য আর কিছু। ধর্মের মতো এত বেশী দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের, এমন কি পশুর জন্যও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা অন্য আর কিছু করতে পারে নি। আবার ধর্মের চেয়ে বেশী রক্তস্রোত বহাতেও পারে নি কেউ ধরণীতে।" স্বামীজী অবশ্য বলেছেন যে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত এই সব দুষ্কর্মের জন্য ধর্মকে দোষ দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষ-হত্যা করার জন্য যেমন নিউটন বা লাপ্লেস-কে দায়ী করা চলে না, তেমনি 'ক্রুসেদ' বা 'জেহাদ'-এর (খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ) নিষ্ঠুরতার জন্য খৃষ্ট বা মহম্মদকেও দায়ী করা চলে না। অন্যান্য সব বিরোধগুলির মতোই পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা ও ধর্মযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে অজ্ঞান, দম্ভ, স্বার্থপরতা, ও মানুষের হীনতর প্রকৃতির মজ্জাগত পাশবিকতা হতে।

ধর্মের মর্ম ঠিকমতো গ্রহণ করতে না পেরে মানুষ প্রায়ই শাঁস ফেলে খোসা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। স্বামীজী পরিষ্কার বলেছেন যে, বিভিন্ন

ধর্মের মধ্যে বিবাদ বাধে ধর্মের "গৌণ খুঁটিনাটি বিষয়ের" দিকে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য; ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ও সম্পাদ্য বিষয়ে সকলেই একমত। বিশেষ করে এই মুখ্য বিষয়ের কথা সংক্ষেপে বলেছেন তিনি, "উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ। সব ধর্মেরই লক্ষ্য তাই। প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যেই দিব্যভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনই লক্ষ্য। কর্ম (কর্মযোগ), আরাধনা (ভক্তিযোগ), মনঃ-নিয়ন্ত্রণ (রাজযোগ) বা বিচার (জ্ঞানযোগ)—এর যে-কোন একটি বা সবগুলি অবলম্বনপূর্বক দেবত্বের এই বিকাশসাধন করে মুক্ত হয়ে যাও। এই হল ধর্মের সার কথা। শাস্ত্র বা বিধিনিষেধ বা ক্রিয়াকলাপ, বা গ্রন্থ বা মন্দির বা অনুষ্ঠান—এ সবই হচ্ছে গৌণ খুঁটিনাটি বিষয়।" ভগবানের অস্তিত্ব ও আত্মার অন্তর্নিহিত দেবত্বে বিশ্বাস এবং জ্ঞানাতীত ঈশ্বরানুভূতি সহায়ে তার মুক্তিসাধন—এ কয়টি বিষয়ে জগতের সব বড় ধর্মগুলি যে একমত, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক বা একাধিক সত্যদ্রষ্টার উপলব্ধি হতেই জগতের সব বড় ধর্মগুলি জন্ম ও সমর্থন লাভ করেছে। সব ধর্মই কতকগুলি গ্রন্থকে শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে বলে; ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে মুক্ত হবার জন্য লোককে উদ্‌বুদ্ধ করার সময় আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়করূপে কতকগুলি আচার ও নিদর্শন মেনে চলার কথা সব ধর্মেই আছে; সব ধর্মই ভগবানের নামের মহিমা কীর্তন করে, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপাসনায় উদ্‌বুদ্ধ করে লোকদের। কাজেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতির দিক থেকে বিভিন্ন হলেও সব ধর্মই মূলতঃ এক। স্বামীজী বলেছেন, "বহু জাতির বহু ভাষা, কিন্তু আত্মার ভাষা সর্বত্রই এক। বিভিন্ন জাতির জীবনের রীতি ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম হচ্ছে আত্মার বিষয়; বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও প্রথার মাধ্যমে সে আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয়। এতে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা প্রকাশের

তারতম্যগত, বস্তুগত নয়। আত্মার কথায়, অন্তরের কথায়, তাদের সাদৃশ্য ও একত্ব রয়েছে। কতকগুলি বিভিন্ন যন্ত্রের সুরের মধ্যে যেমন একটা সামঞ্জস্য আনা যায়, এখানেও তেমনি একটা মধুর সুর-সামঞ্জস্য ঝঙ্কৃত হচ্ছে।”

সম্প্রদায়গত ধর্মগুলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুকে স্বামীজী দর্শন, পুরাণ ও সংহিতা (অনুষ্ঠানবিধি)—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির মূল্য ও তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন, দর্শনভাগ হচ্ছে প্রত্যেক ধর্মের প্রাণ, তার ভেতরকার সার অংশ ও কেন্দ্রগত মূলবাক্য। আর পুরাণ ও অনুষ্ঠানবিধি হচ্ছে তার বাইরের খোলস, তার গৌণ অংশ, তার প্রকাশ মাত্র। প্রথমটি হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন সত্যের ভিত্তি, আর পরের দুটি হচ্ছে তার ওপরকার পরিবর্তনশীল কাঠামোটি। এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রগত সত্যকে উপলব্ধি করতে লোককে সহায়তা করা। একই ভাব যেমন বহুবিধ ভাষায় প্রকাশ করা যায়, একই সুর যেমন বহু বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত করা সম্ভব, তেমনি বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন ধাত ও বিভিন্ন প্রথাবলম্বী নানা দলের লোকে বোঝবার সুবিধার জন্য জীবন ও অস্তিত্বের একই মূল সত্যকে, একই দার্শনিক চিন্তাকে বহুবিধ পুরাণ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষ বোঝে না যে এই বিস্তারিত বিষয়গুলিকে ধর্মের অপরিবর্তনীয় অঙ্গ বলে দাবি করার পিছনে কোন যুক্তিই নেই। স্বামীজী দেখিয়েছেন ধর্মের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে লোকের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলগুলি পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন, “প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব পুরাণ আছে, আর সবাই বলে ‘আমাদের পুরাণের গল্পগুলি অলীক নয়।’ এক এক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এক এক রকম ; একদল ভাবে ‘আমার পদ্ধতিটাই পবিত্র, অপরেরটা নির্লজ্জ কুসংস্কারের বোঝামাত্র।’ ” ধর্মের সারভাগ ও তার বাইরের আবরণটাকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলার ভাব থেকেই যা কিছু সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

পুরাণ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই সতেজ ঘোষণার মাধ্যমে জগৎ এমন কতকগুলো যুক্তিবিচারের উপাদান পেয়ে গেছে, যা তাকে সহায়তা করবে ধর্মের দলগত ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর যুগযুগ-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে। তাছাড়া স্বামীজীর এ ঘোষণা ধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য করে ফুটিয়ে তুলে অসঙ্গত পৌরাণিক উপাখ্যানের ও আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন অনুষ্ঠানপদ্ধতির প্রাচীরে প্রতিহত আধুনিক মনের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। স্বামীজী সম্প্রদায়গত ধর্মের বিভিন্ন ভাগকে বিশ্লেষণ করে যে ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে ধর্মের মূল সত্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, এবং তার বিস্তারিত গৌণ অংশগুলির উপযোগিতাও নির্ধারিত হয়েছে। আর তার ফলে ধর্মের ভেতর একটা ঔজ্জ্বল্য এসেছে, যা এ যুগের বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদার সম্পূর্ণ উপযোগী। স্বামীজী বলেছেন, "প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে তিনটে ভাগ দেখা যায় ; অবশ্য প্রত্যেক বড় ও সংহত ধর্মের কথাই বলছি আমি। প্রথমতঃ দর্শনভাগ ; তার মধ্যে ধর্মের সম্পাদ্য বিষয় পুরোটাই থাকে, ধর্মের মূলতত্ত্ব, লক্ষ্য ও সে লক্ষ্য লাভ করার উপায় প্রদর্শিত থাকে তাতে। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে পুরাণ, যা দার্শনিক তত্ত্বের বাস্তব রূপ দেয়। মানুষের জীবন বা দেবদেবীর জীবন বা এই ধরনের কিছু অবলম্বনে রচিত উপাখ্যানের সমষ্টি এগুলি। সাধারণতঃ কল্পিত জীবন বা দেবদেবী প্রভৃতির আখ্যানের মাধ্যমে ভাবকে বাস্তব করে ফুটিয়ে তোলা হয় এতে। তৃতীয় ভাগ হচ্ছে সংহিতা। এটা আরো বস্তু-ভিত্তিক ; এর অঙ্গগুলি আচার, অনুষ্ঠান, বিবিধপ্রকার অঙ্গসংস্থান, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি বহুবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দিয়ে গঠিত। এসবের সমষ্টিই হচ্ছে ধর্মের সংহিতাভাগ।" "ধর্মের তৃতীয় ভাগ প্রতীকমূলক, যে প্রতীকগুলিকে আমরা অনুষ্ঠান ও প্রথা বলে থাকি। মহাপুরুষের জীবন-উপাখ্যান এবং পুরাণের মাধ্যমে প্রকাশিত ভাবও সকলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো নীচুস্তরের মন আছে। সে সব মন যেন শিশু-পর্যায়ের ; তাদের জন্য তাই

ধর্মের এই 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব ; এই প্রতীকগুলি সেখানকার স্থূল উদাহরণ, যা তারা ধরতে ছুঁতে পারে, বুঝতে পারে ; স্থূল বিষয়াকারে যেগুলিকে তারা দেখতে পারে, অনুভব করতে পারে।" স্বামীজী বলেছেন, প্রয়োজনের খাতিরে ধর্মের এই বহিরঙ্গের উদ্ভব হয়েছে ; যদিও ভাব ও প্রয়োগের দিক থেকে তা চিরন্তন ও সর্বজনীন নয়। তিনি বলেছেন, "পদ্ধতি, আচার, বিবিধ অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রবিধান—এসব বহিরঙ্গগুলির যথাযোগ্য স্থান আছে ; আমরা যথেষ্ট শক্তিমান হয়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত এরা আমাদের সহায়তা করে, আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে। পরে অবশ্য আর প্রয়োজন থাকে না এদের। এরা যেন আমাদের ধাত্রী ; কাজেই তরুণ বয়সে এদের সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য।" আবার বলেছেন, "হিন্দুরা আবিষ্কার করেছে যে চরম সত্তাকে বুঝতে হলে, চিন্তা করতে হলে বা তার বিষয়ে কিছু বলতে হলে আপেক্ষিক বস্তুর মাধ্যমে তা করা যায়। প্রতিমা, ক্রুশ ও চন্দ্রকলা, এগুলি প্রতীক মাত্র ; এগুলি যেন আধ্যাত্মিক ভাব ঝুলিয়ে রাখার অবলম্বনস্বরূপ কতকগুলি পেরেক। সকলের পক্ষেই যে এগুলির সহায়তা গ্রহণ প্রয়োজন, তা নয় ; কিন্তু নিজের প্রয়োজন না থাকলেও এগুলিকে ভুল বলার অধিকার নেই কারো।"

এভাবে সব ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ও সম্পাদ্য বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সব ধর্মের মূলগত সত্যের একবাক্যতার ও বাহ্যবিষয়ে তাদের বিভিন্নতার বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, এবং পুরাণ ও অনুষ্ঠানবিধি, প্রথা ও রীতি প্রভৃতি ধর্মের বহিরঙ্গগুলির পরিবর্তনসাধন যে সম্ভব, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বামীজী জগতকে শিখিয়ে গেছেন, কিভাবে ধর্মের ভেতর থেকে বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মমতের যে প্রয়োজন রয়েছে, সে কথা তিনি বুঝিয়েছিলেন এই বলে যে, দেহের প্রয়োজনোপযোগী একই জাতীয় মূল-উপাদানবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য যেমন মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুসারে রন্ধনকালে হাজার হাজার

রূপ নেয়, মানুষের আধ্যাত্মিক খাদ্য, ধর্মও, তেমনি একই মূলগত ভাব থেকে উদ্ভূত হলেও বিভিন্নশ্রেণীর লোকের ধাতের উপযোগী বহুবিধ ধর্মমতের রূপ নিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা জগতের বৈভব বাড়িয়ে তুলেছে, এবং ধর্মকে সকল মানুষের পক্ষেই প্রবেশগম্য, বোধগম্য ও সাধনগম্য করেছে। এজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "দেখা যায় আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন ; কাজেই একই পদ্ধতি একইভাবে দুজনের ওপর প্রয়োগ করা কদাচিৎ সম্ভব হয়। ...দেখা যায় স্বভাবতঃ কেউ বা খুব ভাবপ্রবণ, কারো বা চিন্তা-প্রবণতা ও যুক্তিপরায়ণতা খুব বেশী, কেউ বা আবার সবরকম আচার-পদ্ধতির অনুষ্ঠান ভালবাসে, স্থূল জিনিস কিছু চায়। ...এদের সবাইকে তো আর একই ব্যবস্থাধীনে আনা চলে না! সত্যলাভ করবার জন্য যদি একটামাত্র পদ্ধতি থাকত, তাহলে যাদের ধাতের সঙ্গে সেটা মেলে না, তাদের প্রত্যেকের কাছেই তো তা মৃত্যু-সদৃশ হয়ে দাঁড়াত। ...এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যায় জগতে এত বিভিন্ন রকমের ধর্ম থাকাটা কী গৌরবের কথা, এত বেশী ধর্মশিক্ষক ও আচার্য থাকাটা কত কল্যাণকর!" "একই ভাবধারার প্রতি সকলকে অনুগত করা যায় না ; আর সেজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ! ...চিন্তার সংঘর্ষের ফলে, চিন্তার স্বতন্ত্রীকরণের ফলে নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভব হয়। আমরা সবাই যদি একইভাবে চিন্তা করতাম, তাহলে সবাই যাদুঘরে রক্ষিত মিশরীয় 'মমি'গুলোর মতো হয়ে যেতাম, তাদের মতো সবসময় শুধু একজন আর একজনের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম ; এর বেশী আর কিছু হত না তাতে। ...ধর্মমত যত বেশী সংখ্যায় থাকে, তত বেশীসংখ্যক লোক নিজের পছন্দমতো ধর্মগ্রহণের সুযোগ পায়। যে হোটেলে সব রকমের খাবার রাখে, সেখানে সকলেই পরিতৃপ্তিসহকারে নিজ নিজ ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ পায়। সেজন্য আমি চাই প্রতি দেশে ধর্মমত সংখ্যায় আরো বেড়ে যাক, তাহলে আরো অনেক বেশী লোক আধ্যাত্মিকতা-লাভের সুযোগ পাবে।"

বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা এভাবে প্রমাণিত করে স্বামীজী সিংহনাদে ঘোষণা করেছেন, "জগতের ধর্মগুলি পরস্পরবিরোধী নয়, সেগুলি একই চিরন্তন ধর্মের বিভিন্ন দিক। একই চিরন্তন ধর্মকে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয়েছে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মনের রুচি অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে।" স্বামীজী বলেছেন, সব ধর্মেরই মূল ভাবগুলির ওপর থেকে বিশেষ নাম প্রথা ও প্রভাবের আবরণগুলি খুলে ফেললে দেখা যায় তাদের ভেতর পার্থক্য আব নেই, একই চিরন্তন ধর্মেব ভাব সেগুলি। এই চিরন্তন ধর্ম যেন কেন্দ্রগত কীলকেব মতো—যাব ওপর নির্ভর করে জগতের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসগুলি সুসামঞ্জস্যে চারিদিকে বিন্যস্ত রয়েছে, এবং জগতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের কেন্দ্রগত সত্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন দিক হতে আগত কেন্দ্রাভিমুখী সরণীগুলিব প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বিভিন্নধর্মমত-গুলির অন্যতমের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যুগ যুগ ধরে বিদ্বেষময় গৃহযুদ্ধ চালিয়ে আসার পর বহুবাঞ্ছিত মিলনক্ষেত্রে সকলের মিলিত হবার সময় এসেছে আজ, আর তারই সহায়তার জন্য স্বামীজী তাঁর মানসনেত্রে দৃষ্ট সর্বজনীন ধর্মের এই চিত্রখানি তুলে ধরেছেন মানবসাধারণের দৃষ্টিপথে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সর্বজনীন ধর্মের মহিমোজ্জ্বল রূপ ধারণায় আনতে পাবলে সমস্ত ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও অপরাপর ধর্মমতগুলিকে অসীম উদারতার চোখে দেখতে পারবে। স্বামীজী খুব ভালভাবেই জানতেন যে এরূপ সুসময় আসা অলীক কল্পনামাত্র নয়; ধর্মের মূল সত্যকে কিভাবে তার বহিরঙ্গ থেকে আলাদা করে দেখতে হয়, জগতের ধর্মাচার্যেরা লোকদের যদি এটুক শুধু শিখিয়ে দেন তাহলেই মহা-ধার্মিক থেকে শুরু করে স্বল্প-ধর্মবিশ্বাসী পর্যন্ত সকলেরই পক্ষে এরূপ সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এই মহদুদার ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে এভাব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন,

কিভাবে ধর্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত মূল ভাব ও আদর্শগুলিকে জগতে ছড়িয়ে দিয়ে সর্বজনীন ধর্মের প্রতি সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টিভঙ্গীকে নবারুণরঞ্জিত করা যেতে পারে। তিনি বলে গেছেন, "এই সর্বজনীন ধর্মের বিধানে নির্যাতনের বা অসহনশীলতার কোন স্থান থাকবে না ; সকল নরনারীর অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্বীকৃতি থাকবে এতে ; আর এ ধর্মের সমগ্র সম্ভাবনা, সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে মানুষকে তার দেব-স্বরূপ উপলব্ধি করাতে।" জগৎকে সর্বজনীন ধর্মের এমন এক মহিমময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন তিনি, যা "কোন বিশেষ স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রতিপাদ্য ভগবানের মতোই যা অনন্ত ; যার সূর্য কৃষ্ণের উপাসক ও খৃষ্টের উপাসক, সাধু ও পাপী, সকলের ওপরই সমভাবে কৃপাকিরণ বর্ষণ করবে ; যা ব্রাহ্মণদের ধর্মও নয়, বৌদ্ধদের ধর্মও নয়, খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্মও নয় ; কিন্তু, যা এসবের সমষ্টি-স্বরূপ ; আর সর্ব ধর্মকে বুকে টেনে নেওয়া সত্ত্বেও স্থানের কোন অভাব ঘটবে না সেখানে, বিস্তারের প্রচুর অবকাশ থাকবে ; নিজ উদারতাবশে সে প্রত্যেক মানুষকে নিজের বিশাল বক্ষে টেনে নিয়ে ঠাঁই দিতে পারবে।"

মানুষকে যে সর্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী করান এবং সে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করান যায়, এ বিষয়ে জগতের সংশয় দূর করার জন্য স্বামীজী শিবত্বের ভাবানুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন, "অতীতের সব ধর্মই আমি মানি ও সব ধর্মগুলিকেই শ্রদ্ধা করি। মুসলমানদের মসজিদে গিয়ে আরাধনা করব আমি, খৃষ্টানদের গির্জায় গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে নতজানু হব, বৌদ্ধ মঠে ঢুকে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের শরণ নেব। যে আলোকে সর্বমানবের হৃদয় আলোকিত, সেই আলোর সন্ধানী হিন্দুদের সঙ্গে অরণ্যে বসে ধ্যানমগ্ন হব আমি। শুধু যে এখানেই শেষ, তা নয়, ভবিষ্যতে আরো যে-সব ধর্মমত আসবে, সেগুলির জন্যও আমি হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখব।······বাইবেল, বেদ, পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে কটা কথাই বা

আর বলা হয়েছে? আরো কত কথা যে বলতে বাকী রয়েছে, তার সীমা নেই। সেগুলির সবই গ্রহণ করার জন্য আমি হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে রেখে দেব।"

এভাবে যুক্তিগ্রাহ্য কথায় ধর্মের মূলতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বজনীন ধর্মের মহান্ রূপ অতি স্পষ্টভাবে চিত্রিত করার মাধ্যমে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ ও তাঁর নিজের উপলব্ধিতে পুনরায় প্রত্যক্ষ করা বৈদিক ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেছেন; প্রচার করেছেন জগতের বিভিন্ন ধর্মগুলির অন্তরে প্রাণসঞ্চার করার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সমালোচনামূলক যুক্তির আক্রমণের মুখে তাদের আত্ম-রক্ষায় সাহায্য করার জন্য। স্বামীজীর ভাব আধুনিক পাশ্চাত্যে অন্ততঃ বিদ্বৎসমাজের স্তরে যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, সে কথা বোঝা যায় চিকাগোর 'দি নিউইয়র্ক' পত্রিকার বর্তমান সুধী সম্পাদকের দ্ব্যর্থহীন বিবৃতিতে, "সভ্যতার যে-কোন ইতিহাসের বই দেখ, দেখবে ধর্মের পদ্ধতি ও ভাব নিয়ে আলোচনা তার ভেতর কত বেশী জায়গা দখল করে রয়েছে; এ ধরনের প্রশংসনীয় অধুনাতম গ্রন্থের উদাহরণ হচ্ছে 'উইল ডুরান্ট'-এর 'সভ্যতার ইতিকথা'। কারণ, আমরা সবাই মানি যে, ধর্ম মানুষের অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ, মানুষের মূল প্রকৃতি হতেই তা উদ্ভূত। এদিক দিয়ে সব ধর্মই, এমন কি আদিমতম ধর্মও যে শুধু বাস্তব তাই নয়, সত্য-ও। সেগুলি সবই সত্য, অন্ততঃ সে-সব লোকের কাছে সত্য, যাদের মানসিক উন্নতির স্তরে সে-ধর্ম বিশ্বাস্য। জগতে একটা ধর্মই—অবশ্য নিজেরটাই—সত্য, বাকী আর সব মিথ্যা, একথা বলার দিন চলে গেছে। স্বধর্মী ও বিধর্মীর মধ্যে, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে ভেদের রেখা আর টানা যায় না। যে-গাছ যে-মাটিতে জন্মেছে, সে-মাটি সে-গাছের কাছে যতটা সহজ, মানুষের কাছে তার নিজের অনুষ্ঠিত ধর্মটাও ততটাই সহজ। গাছ যেমন বহুবিধ আছে, ধর্মও সেরূপ বহু প্রকারের,

কিন্তু সবই প্রকৃতিসঞ্জাত। পৃথক্‌ভাবে দেখলে ধর্ম (ধর্মমত) বহু, কিন্তু 'ধর্ম' বলতে একটা জিনিসই বোঝায়। কারণ রক্ত ও মাংসের মতোই তা সমভাবে সব মানুষেরই অঙ্গ।

মাতৃভূমির বোধন

অনুগত সেভিয়ার দম্পতি ও মিঃ গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুআরি কলম্বোতে জাহাজ থেকে নামলেন। সিংহলের (অধুনা শ্রীলঙ্কা) কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে রামেশ্বর, রামনাদ, মাদুরা ও মাদ্রাজ হয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলেন তিনি। কলম্বোর জেটি থেকে শুরু করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের যেখানে বা যেদিক দিয়ে তিনি গেছেন, সেখানকার প্রধান প্রধান স্থান গুলিতে উৎসুক জনতা সমবেত হয়ে একজন মহান্ জাতীয় বীরের উপযুক্ত বিপুল সংবর্ধনায় তাঁকে অভিভূত করেছে মহোৎসাহে। আর স্বামীজীও সে-সব স্থান ছেড়ে যাবার সময় তাঁর উদাত্ত অনুপ্রেরণাময়ী বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন জয়ধ্বনিমুখর জনতাকে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু করে বছরের শেষ পর্যন্ত তিনি যুক্তপ্রদেশ (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) পঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতানা প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিস্তৃত অংশে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন; আর যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁর সঞ্জীবনী ভাষণ ও ধর্মপ্রসঙ্গের মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির অতীব প্রয়োজনীয় পুনরুজ্জীবনকল্পে তাঁর যা কিছু বলার ছিল বলে গেছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয়বার আমেরিকা গমনের পূর্বে আর একবার তিনি উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন; সেবারে কাশ্মীরের অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর পবিত্র মন্দিরে তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। প্রায় আড়াই বছর ভারতে ছিলেন তিনি, এবং শরীর ভেঙে পড়া সত্ত্বেও এসময়ের সবটাই অক্লান্ত পরিশ্রমে নিয়োজিত করেছেন তাঁর

ভাবপ্রচারের কাজে এবং তাঁর আদর্শের পতাকাবাহী সেনাদলকে সংঘবদ্ধ করার কাজে।

আমেরিকা ও ইউরোপের সংবাদপত্রগুলির অকুণ্ঠ প্রশংসামুখর তাঁর পাশ্চাত্য-অভিযানের সফলতা নিশ্চয়ই তাঁকে একজন অসাধারণ আধ্যাত্মিক মহাচার্যের অধিকার ও গৌরবে ভূষিত করেছিল। সর্ববিধ দুর্বলতা ও অধীনতার বহু উর্ধ্বে আসীন হয়ে শক্তি ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীকরূপে তিনি পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। চারিদিকের অবসাদ ও অসহায়তা, ঘৃণা ও ঈর্ষা, দম্ভ ও কুসংস্কারের মাঝখানে আধুনিক সভ্যতার অমিতশক্তি প্রতিভূরা তাঁর ভেতর আশা ও আনন্দের এক দেবদূতকে দেখতে পেয়েছিলেন, খুঁজে পেয়েছিলেন প্রেম, শান্তি ও সামঞ্জস্যের এক অফুরন্ত উৎস। স্বামীজীর ভেতর সত্যই একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণী শক্তি ছিল, ভাষায় যা প্রকাশ করা দুরূহ। যে-সব আধ্যাত্মিক মহামানবের মধ্যে মানুষ নিজেদের প্রিয়তম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রায় পরিপূর্ণতা এবং জীবনগঠনাভিলাষে গৃহীত আদর্শের বাস্তবরূপ দেখতে পায়, তাঁদের প্রত্যেকেরই ভেতর এ শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কাজেই পাশ্চাত্যের সভ্যসমাজের বহু লোক অন্তরের প্রেরণাবশেই তাঁর পায়ে হৃদয়ের ভালবাসা, স্তুতি ও ভক্তি উজাড় করে দিয়েছিল, এমন কি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষজ্ঞানে তাঁকে দেবতার মতো পূজা করেছিল। একত্বের যে হিরণ্ময়সূত্রে সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত রয়েছে, প্রাচীন ভারতের ঋষিরা সে সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের উপযুক্ত প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ সারা জগতের জন্য এসেছিলেন; তাঁর বাণী বিশ্ববাসী সকলের জন্য; তাঁর ভালবাসা স্পর্শ করে গেছে মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তিকে। পাশ্চাত্যজাতির কল্পনারাজ্যে তাঁর বিশ্বজনীন ভাব প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে। তাঁকে "ঘূর্ণবাত-সদৃশ ভারতীয় সন্ন্যাসী" নামে অভিহিত করেছিল তারা এবং বুদ্ধ ও খৃষ্টের সমতুল্য বলে জ্ঞান করত তাঁকে। উন্নতিশীল পাশ্চাত্য দেশবাসীরা স্বামীজীকে এরূপ অকুণ্ঠ মর্যাদা দান করায়

ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই গৌরববোধ করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে ভারতের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারিরূপে দেখেছিলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা ভারতীয়দের ঘৃণা করতেন—তাঁদের চোখে আমরা "পারিয়া"—জগৎবিজেতা জাতির মার্জিত রুচির কাছে ভারতীয়দের দেহবর্ণ অসহ্য ঠেকত। ভারতীয়দের ধর্মকে তাঁরা বেহদ্দ কুসংস্কার বলে ভাবতেন, ভারতের সামাজিক প্রথার ওপর তাঁরা, এমন কি পাশ্চাত্যের ধর্মযাজকরা পর্যন্ত, নির্জলা কলঙ্কারোপ করতেন ; কাজেই তাঁদেরই একজন স্বদেশবাসী, স্বামী বিবেকানন্দ, যখন ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে গিয়ে ভারতের অতীত সংস্কৃতির গৌরব ও মূল্যের যাথার্থ্য সমর্থন করতে, এবং বিদেশীরা ভারত সম্বন্ধে যে ধারণা করে রেখেছিল তা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা সর্বতোভাবে প্রমাণ করতে মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তখন ভারতবাসীদের গৌরববোধ করার কারণ ছিল যথেষ্ট। নিজ জীবন ও বাণী সহায়ে পাশ্চাত্যবাসীদের মনে তিনি গেঁথে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য- ও সংস্কৃতি-বিরহিত বর্বরের দেশ নয়। তিনি দেখিয়েছিলেন, ভারতের ইতিহাসকে বিংশক বা শতক দিয়ে মাপা যায় না, বহু বহু শতাব্দীর প্রাচীন সে ইতিহাস ; দেখিয়েছিলেন, বুদ্ধদেবও যীশুখৃষ্টের ছশো বছর আগে জন্মেছিলেন ; দেখিয়েছিলেন, আধুনিক জাতিগুলির পূর্বপুরুষরা যখন গায়ে উল্কি আঁকত, গুহা- ও অরণ্যে বাস করত, শিকার করে জীবনধারণ করত, সে সময়েও ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আরো দেখিয়েছিলেন যে, মানব-ইতিহাসের ঊষাকালেও ভারতবর্ষে বেদের এতদূর উন্নতি হয়েছিল যে, সে তখন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব এবং বিশ্বের মূলগত একত্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে চলেছিল। কাজেই, এটা খুবই স্বাভাবিক যে 'ঘূর্ণবাতসদৃশ ভারতীয় সন্ন্যাসী'-কে তাঁর স্বদেশবাসীরা 'ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী' বলে সগর্বে অভিনন্দিত করবে। স্বামীজীর মধ্যে তারা যে শুধু তাদের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার

পূর্ণতাই দেখল তা নয়, তারা দেখল তাদের হৃদয়ের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীও তিনি স্পর্শ করেছেন; দেখল, দুর্ধর্ষ বীরের মতো তিনি ব্রতী হয়েছেন তাদের অন্তরতম, অতিবাঞ্ছিত কার্যসাধনে—তাদের জন্মভূমির তমসাচ্ছন্ন বর্তমান দ্বারা পূর্ণবাহুগ্রস্ত গৌরবময় অতীতের পুনরুদ্ধারের পবিত্র কর্মে।

পাশ্চাত্যের উদ্দাম কর্মতৎপরতার মধ্যেও একটা চিন্তা দিনরাত তাঁকে অভিভূত করে রাখত—ভারতকে কি করে আবার পতনের গহ্বর থেকে টেনে তোলা যাবে। ইউরোপ ও আমেরিকার শৃঙ্খলাবদ্ধ, উন্নতিশীল, সংঘবদ্ধ, পৌরুষদৃপ্ত, সমৃদ্ধ জাতিগুলির সঙ্গে অবস্থানকালে বিবেকানন্দের দেশপ্রেমে ভরা কোমল চিত্ত সবসময় বেদনার্ত হয়ে থাকত ভারতের কথা স্মরণ করে। তাঁর মনে পড়ত, ভারতের অশিক্ষিত, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, পদদলিত জনগণের অবস্থা কী অসহায়, তবু সেখানকার ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহানুভূতি তার প্রতিকারে তৎপর হয় না! মনে পড়ত, সনাতনপন্থী ধর্মধ্বজী সমাজনেতাদের হাতে পড়ে বৈদিক ধর্মের উচ্চ আদর্শগুলি কী হাস্যকর পরিণতি লাভ করেছে! ধর্মের নামে জোর করে নিন্দনীয় অস্পৃশ্যতা-প্রথা চালাচ্ছে তারা, সামাজিক বৈষম্যের অন্যায় চাপে লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদহীন মানুষের মনুষ্যত্ব তারা নষ্ট করে দিচ্ছে। মনে পড়ত, ভারতের শিক্ষিত উদার-পন্থীরা অতিমাত্রায় আত্মবিস্মৃত ও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যেভাবে পাশ্চাত্য চিন্তা ও আচরণের দিকে ছুটে চলেছে, কী ভয়ঙ্কর তার পরিণাম! আর মনে পড়ত, ভারতে একদিকে পরস্পরবিবদমান সনাতনপন্থীরা হিন্দুসমাজকে অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে, অন্যদিকে দিন দিন বেড়ে চলেছে শিক্ষিত, স্বধর্মত্যাগী ঈশ্বরবিশ্বাসহীন লোকের সংখ্যা। পাশ্চাত্য দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে নিজ প্রিয় জন্মভূমির দুরবস্থার মর্মবিদারক বৈষম্যের তুলনা করে পাশ্চাত্যে বিলাসবহুল শয্যার ওপর বিশ্রামকালে কত বিনিদ্র রজনী তিনি কাটিয়েছেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন! অগ্নিগর্ভ পত্র লিখে মাদ্রাজী শিষ্যদের প্রায়ই অনুপ্রেরণা দিয়েছেন দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গার্থে

নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য। এইসব শিষ্যদের সঙ্গে সবসময় তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। এঁদের তিনি পাশ্চাত্যে নিজের কর্মধারা ও সফলতার কথা জানাতেন, আর সবসময় উৎসাহ দিতেন পাশ্চাত্যের সুসংহত, নিখুঁতপ্রণালীবদ্ধ, সমাজকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলির সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান ভারতেও গড়ে তুলতে। পাশ্চাত্যসমাজের অনুকরণযোগ্য কোন সদ্‌গুণই তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীজীর চোখ এড়িয়ে যেতে পারত না; আধুনিক সভ্যতার দেশে লব্ধ তাঁর সেইসব চিরবর্ধমান অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রাণসঞ্চারী নব নব ভাবসহায়ে মাদ্রাজের শিষ্যদের হৃদয়ে কল্পনার আগুন জেলে দিতেন তিনি। তাতে উৎসাহিত হয়ে এইসব শিষ্যেরা ভারতবাসীদের ভেতর স্বদেশপ্রেম ও ধর্মভাব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ থেকে নিয়মিতভাবে একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করার কাজে ইতোমধ্যে লেগে পড়েছিলেন। স্বামীজীকে দেশের বাইরে যে-কদিন কাটাতে হয়েছিল, সে-কদিনও পাশ্চাত্যে অন্য কর্মে ব্যাপৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কল্যাণের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা এভাবে তাঁর অনুভূতি ও চিন্তার কেন্দ্রস্থল জুড়ে থাকত। ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করা মাত্র প্রিয় জন্মভূমির জন্য তাঁর হৃদয়সঞ্চিত সমবেদনার ভাবরাশি প্রবল বেগে উথলে উঠে হু হু করে বেরিয়ে এল, স্বদেশবাসীদের ভাসিয়ে দিল তার প্রচণ্ড প্লাবনে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত, স্বামীজী যথার্থ বেদান্ত-কেশরীর মতো গর্জন করে চললেন ঘুমন্ত অজগরকে জাগাবার জন্য।

তাঁর শিক্ষার ফলে দেশবাসীর প্রাণে শক্তিমান গৌরবোজ্জ্বল অতীত-ভারতের ছোঁয়া লাগল, তারা নিজেদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানতে পারল; তাদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন ঋষিরা যে আধ্যাত্মিক সম্পদ গচ্ছিত রেখে গেছেন, তার গাম্ভীর্যময় প্রচণ্ড শক্তির উপযোগিতার কথা হৃদয়ঙ্গম করল। বিদেশী সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট ও তার পদানত ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়, এমন কি যে সব ধর্মসংস্কারক হিন্দুধর্মের বহু স্থূল কিন্তু

মহামূল্যবান অঙ্গকে ঘৃণা না করে পারতেন না, তাঁরা পর্যন্ত স্বামীজীর কথায় নিজেদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্বধারণা পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাছাড়া, বর্তমান অবনতির খাতে নিজেরা কতদূর নীচে যে নেমে এসেছে, স্বামীজীর শিক্ষার আলোকপাতে দেশবাসীরা তার সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হল। তারা পরিষ্কার বুঝল, নিজেদের শারীরিক অবনতি জড়তা ও আলস্যের জন্য, নিজেদের মনুষ্যত্ব আত্মপ্রচেষ্টা নিষ্ঠা আদেশানুবর্তিতা কর্মতৎপরতা ব্যাবহারিক বুদ্ধি ও সংগঠনশক্তির অভাবের জন্য, এবং সর্বোপরি নিজেদের হৃদয়ের প্রসার উদারতা ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার মারাত্মক অভাবের জন্য তারা নিজেদের মনুষ্যত্বের অতি শোচনীয় অবস্থায় এনে ফেলেছে, এবং দুর্বলতা ও বিভ্রান্তির এই নৈরাশ্যময় পঙ্কিল ভূমি থেকে উঠে আসার শক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। সেইসঙ্গে স্বামীজী তাদের এবিষয়েও সজাগ করে দিয়েছিলেন যে, উপরের এই নোংরামি ও অবনতির আবরণের অন্তরালে তাদের অন্তরে এখনো বিপুল সম্ভাবনাময় শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাঁর আচার্যতুল্য, প্রায় প্রত্যাদেশের মতো, ভবিষ্যদ্-বাণীর মাধ্যমে দেশবাসীর মানসচক্ষে পূর্ণ পুনরুজ্জীবিত ভবিষ্যৎ-ভারতের গৌরবময় উজ্জ্বল দিনের চিত্র ফুটে উঠেছিল। স্বামীজী অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভবিষ্য ভারতের যে ছবি এঁকেছেন, তা দেখে কার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—"ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়েছে—ভারত আবার জাগবেই।" "কেউই আর তাকে বাধা দিতে পারবে না; আর কখনো সে ঘুমিয়ে পড়বে না; কোন বৈদেশিক শক্তি আর তাকে পিছিয়ে দিতে পারবে না; কারণ, এই অসীমশক্তিমান দানব জেগে উঠে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে।" "দীর্ঘতম রাত্রি প্রভাত হল বলে মনে হচ্ছে, অবশেষে নিদারুণ দুর্যোগের অবসান হল বলে বোধ হচ্ছে এতদিনে; আর, একটা বাণী ভেসে আসছে আমাদের কানে,····· হিমালয় হতে আগত মৃদু সমীরণের মতো সে বাণী মৃতপ্রায় অস্থিমাংসে প্রাণ-সঞ্চার করে চলেছে; আলস্য কেটে যাচ্ছে।

যারা অন্ধ তারাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না, আর বিকৃতমস্তিষ্ক যারা, তারা তো দেখবেই না যে ভারত আবার জাগছে, আমাদের এই মাতৃভূমি দীর্ঘদিনের গভীর নিদ্রা ছেড়ে জেগে উঠছে।" বাস্তবিক স্বামীজী তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দেবদূতের মতো, এক হস্ত প্রসারিত করে মাতৃভূমির অতীত গৌরবের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, অন্য হস্তে দেখিয়েছিলেন ভারতের অধিকতর মহিমোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাঁর কথায় তাদের মনে অসীম আশা, শক্তি ও উৎসাহের উদয় হয়েছিল, আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল, আস্থা এসেছিল নিজেদের সংস্কৃতিতে, নিজেদের মজ্জাগত প্রচ্ছন্ন শক্তিতে।

কিন্তু স্বামীজী তাদের শুধু অতীতের স্তুতিগান গাইতে বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নাচতে বলেন নি। এসব দেখিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়ে অন্ধকারময় বর্তমানে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে মাতৃভূমির অতি-প্রয়োজনীয় উদ্ধারসাধনকল্পে তার উন্নতিবিধানের কাজে লেগে পড়তে বলেছিলেন তাদের। স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষ তাদের চালিত করেছিল এই উদ্দেশ্য সাধন করতে, এই পবিত্র লক্ষ্যলাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে জীবনপাত করতে, আর সজাগ করে দিয়েছিল তাদের সমীপাগত এই কর্মের বিপুলতা সম্বন্ধে। বেশ কল্পনা করা যায়, কী প্রচণ্ড দায়িত্বের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল স্বামীজীর কঠোর আদেশ—"আমাদের ছেলেরা জন্ম থেকেই জানুক যে তারা দেশ-মাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃত।"

দেশবাসীর মনে এই কথাটাই তিনি সর্বপ্রথম দৃঢ়বদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে তাদের দুর্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তারা নিজেরাই; আর সেজন্য বৃথা অনুতাপ না করে বা অপরের ঘাড়ে সব দোষ না চাপিয়ে তাদের উচিত সাহস অবলম্বন করে নিজেদের ত্রুটী-সংশোধনে তৎপর হওয়া। হিন্দুদের তিনি বলেছিলেন, মানুষ যেমন কাজ করে, তার ফলও পায় তেমনি,—একথা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সমগ্র সমাজের বেলাতেও তাই; জাতীয় জীবনও কর্মফলের নিয়মাধীন। ভারতবর্ষ যদি নিজ

নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজের ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি নষ্ট না করত এবং নিজের দেহের, বুদ্ধির ও আধ্যাত্মিকতার শক্তি না হারাত, তাহলে বাইরের কোন কিছুরই সাধ্য ছিল না এই জাতিকে—এই অসীম শক্তিমান বিরাট পুরুষকে নিজ পদানত করা। যে মাতৃভূমির অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির জয়গানে তিনি বিদেশের গগন মুখরিত করেছিলেন, তাব ব্যর্থতার কাহিনী স্বীকৃতি-কালে স্বামীজীকে যেন নিজেরই দেহ চিরে রক্ত দিতে হয়েছিল। তাঁর নিম্নোক্ত কথাগুলি সমগ্র ভারতীয় সমাজের ওপর ঠিক যেন বোমার মতো ফেটে পড়েছিল, "আমাদের এই অধঃপতনের জন্য দায়ী আমরাই। আমাদের আভিজাত্যবান পূর্বপুরুষবা দেশের জনসাধারণকে পদদলিত করে চলেছিলেন যতদিন না তারা অসহায় হয়ে পড়েছিল, যতদিন না এই পীড়নে হতভাগ্য দরিদ্র জনগণ ভুলে গিয়েছিল যে তারাও মানুষ।" বৈদিক ঋষিদের উদার ও মানবপ্রেমে ভরা শিক্ষাব কথা বিস্মৃত হয়ে জীবনে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতাব দীপ্তি হারিয়ে, আর তার ফলে ধর্মের বহিরাবরণের ওপর এবং নিজেদের মনগড়া প্রাধান্য বজায় রাখাব ও গায়ের জোরে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অদ্ভুত ও অযোগ্য শ্রেণী-সচেতনতার ওপর জোর দিয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যযুগের নেতারা ঝুঁকেছিলেন কঠিন ও ঘৃণ্য নিয়মের শৃঙ্খলে জন-সাধারণকে আবদ্ধ করে রাখতে। একালের আধ্যাত্মিক নিঃস্বতার নিদর্শনস্বরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সঙ্কুচিত-হৃদয়-সঞ্জাত এই সামাজিক নিয়মগুলি সাময়িক প্রয়োজন হয়তো কিছুটা সিদ্ধ করেছিল, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি গোঁড়া সমাজনেতারা প্রয়োজনের পরও এগুলিকে জিইয়ে রেখে দিয়েছিলেন গোটা সমাজের স্বাস্থ্য, উন্নতি ও প্রসারের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও। এইকালে উদারতার ঘনীভূত মূর্তি বৈদিক-ধর্ম হয়ে উঠেছিল অস্পৃশ্যতা ঘৃণা ও সামাজিক অত্যাচারের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত; বিদেশীরা ম্লেচ্ছ ও যবন নামে পরিচিত হয়েছিল; সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল; জাতি-বিচারের

ঘৃণ্য আতিশয্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল; অন্যায্য ব্যবধানের বেড়া তুলে হিন্দুজাতির ভেতর বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছিল; এবং তীব্র সাম্প্রদায়িকতা-বোধ ধর্মজীবনের মূলমন্ত্র হয়ে হিন্দু সমাজকে পরস্পর-বিবদমান অসংখ্য দলে বিভক্ত করে ফেলেছিল। হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এসব-কিছুর জন্যই, এবং দেশের ভিতরকার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ভাববার শক্তিও তাদের লোপ পেয়েছিল। যে হিন্দুরা একদিন সারা জগতে উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের গর্ব অনুভব করার যোগ্যতা সত্যই রাখত, অদৃষ্টের পরিহাসে তারাই হয়ে উঠেছিল বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের ভয়াবহ লীলাভূমি।

স্বামীজী স্বদেশবাসীদের বোঝালেন যে, জাতীয় জীবন থেকে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি এবং স্বার্থপরতা ও সামাজিক অত্যাচার একেবারে নির্মূল করে দিতে হবে, তার কমে জাতিকে সুসংহত কবা অসম্ভব। জাতিকে যদি সত্যই গৌববের শিখরে উন্নীত হতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রথমেই জাতির সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। উপনিষদের ঋষিদের অতি উদার তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে ধর্মের একটা সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলে এবং দেশের ভিতরকার সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিলোপসাধন করে হিন্দুরা জাতীয় সংহতির রাজপথ কিভাবে উন্মুক্ত করতে পারে, সে কথা তিনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন। এ সত্যটি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন স্বামীজী যে, হিন্দুরা যদি তাদের নিজস্ব মূল শাস্ত্র বেদান্তের উচ্চ আদর্শগুলিকে জীবনে আবার রূপায়িত করতে সমর্থ হয়, তাহলেই সে মানুষে-মানুষে পার্থক্যের বেড়া ভেঙে ফেলতে পারবে; আর এভাবে চলার ফলে এক মহাশক্তির বিকাশ ঘটবে, যা ভারতের সব ধর্মমত ও সম্প্রদায়গুলিকে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে এক অমিতবিক্রম জাতিতে পরিণত করতে সমর্থ।

স্বামীজী আরো বলেছিলেন যে, আত্মার দেবত্ব, বিশ্বের একত্ব এবং তার অনুসারী 'অভীঃ'-রূপ বেদান্তের আদর্শ যে শুধু সর্ববিধ পার্থক্যের

সামঞ্জস্যবিধান করে ভারতবাসীদের একতাবদ্ধ করে তুলবে তাই নয়, সে-আদর্শ জাতীয় জীবনে অমিত শক্তি সঞ্চার করে আলস্য ও হতাশার পঙ্ক থেকে ভারতবাসীদের উদ্ধারসাধনও করবে। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের এখন প্রয়োজন হচ্ছে লৌহের মতো পেশী, ইস্পাতের মতো দৃঢ় স্নায়ু আর এমন প্রচণ্ড একটা ইচ্ছাশক্তি যা কোন বাধাই মানবে না, যা বিশ্বের সব গোপন তথ্য, সব রহস্য ভেদ করতে পারবে, আর যেভাবে হোক তা নিজ উদ্দেশ্য সাধন করবেই—তার জন্য যদি সমুদ্রের তলে নেমে যেতে হয় বা মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়াতে হয়, তবুও পিছিয়ে আসবে না। এসব আমাদের চাই। আর এগুলিকে সৃষ্টি করা, প্রতিষ্ঠা করা ও শক্তিমান করে তোলা সম্ভব হবে শুধু অদ্বৈত-আদর্শকে, সবকিছুর মধ্যে অভেদত্বের আদর্শকে ধারণা করে উপলব্ধিতে আনতে পারলে।" আবো বলেছেন, "তোমাদের বলছি, শক্তি আমাদের চাই, সব সময়ই শক্তি চাই। আব উপনিষদ্ হচ্ছে শক্তির উৎস। গোটা জাতটাকে সবল করে তোলার মতো শক্তি সেখানে রয়েছে, উপনিষদ্‌সহায়ে গোটা জাতটাকে সতেজ করে তোলা, সবল করে তোলা, প্রাণোচ্ছল করে তোলা সম্ভব। উপনিষদেব বাণী সর্বজাতির, সর্ব ধর্মের, সর্বসম্প্রদায়ের দীন, দুর্বল ও পদদলিতদের দৃপ্ত-কণ্ঠে বলবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হয়ে যেতে; মুক্তিই—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিই—উপনিষদের প্রাণের কথা।" স্বদেশবাসীদের বারংবার তিনি শুনিয়েছেন, "নিজের সত্যস্বরূপকে জানতে শেখ, অপরকেও স্বরূপ-উপলব্ধি করতে শেখাও; সুপ্ত আত্মাকে আহ্বান করো। দেখবে কেমন করে সে জেগে ওঠে; সুপ্তি হতে জেগে উঠে আত্মসচেতন হয়ে সে যখন কর্মনিরত হবে, তখন শক্তি আসবে, গৌরব আসবে, সততা আসবে, পবিত্রতা আসবে, যা কিছু সুন্দর, তা সবই আসবে।"

এভাবে বেদান্তকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির চিরন্তন উৎস বলে ঘোষণা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "তোমাদের চোখের

সামনে উপনিষদের সত্য পড়ে রয়েছে। সেগুলি আহরণ করে তদনুসারে জীবন-গঠন কর, তাহলেই ভারতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।" সমাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে ব্যক্তির উন্নত জীবনের ওপর; বেদান্তের আদর্শের মাধ্যমে সে উন্নতি হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন যে, বেদান্তের আদর্শ মানুষের প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার করে দেয়। যথাশক্তি দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছেন যে, জাতিকে একতাবদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম কাজই হচ্ছে গোটা দেশকে বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া। তাঁর যে-সব শিক্ষিত দেশবাসী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহে মুগ্ধ হয়ে নিজ ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি অন্ধ ছিলেন, বিশেষ করে তাঁদের তিনি বলেছেন যে, জাতীয় সংস্কারের কার্য-তালিকায় বৈদান্তিক ভাবের মাধ্যমে পুনর্জাগরণের স্থান প্রথমেই দেওয়া প্রয়োজন। কেন যে প্রযোজন, তা-ও তিনি বলেছেন, "আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক জ্ঞান ও অন্যান্য যে-সব জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন, তা সবই এসে যাবে। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি জাগতিক জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা কর, আমি সোজা কথায় বলছি, ভারতে সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে; লোকের ওপর কখনও তা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।"

ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে, দেশের সবরকম লোকের সঙ্গে মিশে তাঁর বিশ্লেষণপরায়ণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ভেসে উঠেছিল, কিভাবে হিন্দু জন-সাধারণের সব কর্ম ও চিন্তার ধারা, আশা ও অনুভূতির ধারা বৈদিক ঋষিদের আধ্যাত্মিক ভাবের খাত বেয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে আসছে। প্রাচীন শাস্ত্রের খাঁটি আদর্শ তারা ভুলে যেতে পারে, শতাব্দীর পর শতাব্দী শুধু ধর্মজীবনের বহিরাবরণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ফলে উদ্ভূত ও বর্ধিত স্থূল, উৎকট ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তারা বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্যকে মলিনতালিপ্ত করতে পারে, কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করা বা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না যে, ধর্মই নিঃসন্দেহে সর্বগরিষ্ঠ প্রচালক

শক্তিরূপে হিন্দু জনগণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে; তা ধর্মকে যে দৃষ্টি দিয়েই তারা দেখে থাকুক না কেন। ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোন কিছুই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টায়, তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হত না, আর কোন কিছুর আহ্বানে এত অমিত শক্তি নিয়ে তারা জেগে উঠত না, ধর্ম ছাড়া আর অন্য কিছুই তাদের অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে এতখানি উদ্বুদ্ধ করতে পারত না। জাতটাকে যদি জাগাতে হয়, তাহলে জনসাধারণকে শক্তিমান করে তুলতে হবে নিশ্চিতই, আর তা করা সম্ভব একমাত্র ধর্মসহায়ে, অবশ্য ধর্ম বলতে এখানে বেদান্তের মূল আদর্শের পুনরনুশীলনে নবপ্রাণে, নববলে পুনর্জাগ্রত ধর্মের কথাই বলা হচ্ছে। স্বামীজী বলেছেন, "দেখা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির মতো প্রত্যেক জাতিরও জীবনের একটা মূলমন্ত্র থাকে; সেইটাই তার কেন্দ্র, সেইটাই তার মূল স্বর; সেই মূল স্বরকে কেন্দ্র কবে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাকী স্বরগুলো সব বেজে ওঠে। কোন জাতির প্রাণশক্তি হচ্ছে রাজনীতি, যেমন ইংলণ্ডের; কারো বা সুরুচিসম্পন্ন জীবন কারো বা অন্য কিছু। ভারতের কেন্দ্র, ভারতের সমগ্র জাতীয় জীবনসঙ্গীতের মূল স্বর হচ্ছে ধর্মজীবন। যদি কোন জাতি তার কেন্দ্র থেকে, যে লক্ষ্যাভিমুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে চলে এসেছে সে লক্ষ্যপথ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনতে চায়, আর যদি সে প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়, তাহলে তাব মৃত্যু অবধারিত। সেজন্য তোমরা যদি ধর্মকে পরিত্যাগ করে রাজনীতি বা সমাজ বা অন্য আর কোন কিছুকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ কর, জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিরূপে গ্রহণ কর, তাহলে তার ফল হবে এই যে, তোমাদের জাতির অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যাবে। সেটা রোধ করার জন্য তোমাদের ধর্মরূপ প্রাণশক্তির মাধ্যমে সব কিছু করতেই হবে। তোমাদের সব স্নায়ুকে স্পন্দিত করাতে হবে ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়েই। আমি দেখেছি, সামাজিক জীবনের ওপর ধর্মের বাস্তব প্রভাব না বুঝিয়ে দিলে আমি আমেরিকায় ধর্মও প্রচার করতে

পারতাম না। বেদান্ত-অনুশীলনে রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে অপূর্ব পরিবর্তন আসা সম্ভব, তা না দেখালে ইংলণ্ডে আমার ধর্মপ্রচার করা হয়ে উঠত না। কাজেই ভারতে সমাজ-সংস্কারের কথা বলতে হলে আগে দেখাতে হবে নতুন ব্যবস্থা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে কতখানি উন্নততর করবে; রাজনীতি প্রচার করতে গেলেও তাই করতে হবে, দেখাতে হবে যে, জাতির একমাত্র লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা তাতে কতখানি বাড়বে। প্রত্যেক লোককে নিজের পছন্দমতো একটা পথ নিজেই বেছে নিতে হয়; প্রত্যেক জাতির বেলাতেও তাই। আমাদের পথ আমরা বহুযুগ পূর্বেই বেছে নিয়েছি; সে নির্বাচন আমাদের মেনে চলতেই হবে।

ভারতের জাতীয় সংগঠনের কাজে ধর্ম যে অতিপ্রয়োজনীয়, সে-কথা তিনি বারবার বলেছেন, "রক্ত যখন শুদ্ধ ও সতেজ থাকে, কোন রোগের বীজাণুই তখন শরীরে ঢুকে টিকে থাকতে পারে না। আমাদের ধমনীতে আধ্যাত্মিকতার রক্ত বইছে। সে রক্ত-প্রবাহ যদি অব্যাহত থাকে, যদি নির্মল থাকে, সতেজ থাকে, তাহলে সবই ঠিকমতো চলবে। সে-রক্ত শুদ্ধ থাকলে দেশের সামাজিক, রাজনীতিক এবং অন্যান্য সব জাগতিক অভাবই, এমন কি দারিদ্র্যও দূরীভূত হবে, সব রোগই সেরে যাবে।" আর এজন্যই তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে—"এদেশে আধ্যাত্মিকতার পতাকা খুব উঁচুতে তোলা হয়েছে—একথা বাহুল্য নয়, কারণ মুক্তি শুধু এতেই।"

দেশের যে-সব শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্যের পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালীর অনুকরণে ভারতকে নতুন করে গড়তে চাইছিলেন, তাঁদের তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের কথা ধরলে ধর্মের মাধ্যমে করা ছাড়া জাতীয় জাগরণ ও সংহতির আর কোন কার্যকরী কর্মপ্রণালী থাকতে পারে না। তিনি তাঁদের সচেতন করে দিয়েছিলেন যে, প্রাচীনকালের হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতাকে সমগ্র সভ্যতার ভিত্তিরূপে, আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূল উৎসরূপে নির্বাচিত করে জাতীয় প্রতিভার

সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই নির্বাচনের জন্যই হিন্দুরা এত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা সয়েও বেঁচে থাকতে, এবং হাজার হাজার বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও এখনো নিজেদের মৌলিক ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে না থাকলে আর কোন কিছুতেই সে এত বিপদ কাটিয়ে এতদিন বেঁচে থাকতে পারত না। যে-সব পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত ব্যক্তিরা বাইরে থেকে আমদানী করা রাজনীতি ও মৌলিক সমাজসংস্কারের চশমা চোখে পরে তার ভেতর দিয়ে দেখে ভারতের সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাত, তাদের মোহ কাটাবার জন্য জগতের প্রবল জাতিগুলির ভ্রমপ্রমাদগুলি ও তাদের সমাজের সঙ্কটজনক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, "যে-রাজনৈতিক পদ্ধতি আমরা ভারতে আনতে চাচ্ছি, ইউরোপে বহুকাল যাবৎ তা রয়েছে, বহু শতাব্দী ধরে তা পরীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে তা ত্রুটীপূর্ণ; রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র-সংশ্লিষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি ও এই-ধরণের অনেক কিছুই প্রয়োজনসাধনে অসমর্থ বলে একের পর এক পরিত্যক্ত হয়েছে; ইউরোপ চঞ্চল হয়ে রয়েছে, কোন্ পথে যাবে ঠিক করতে পারছে না।...তরবারির সাহায্যে মানবজাতিকে শাসন করার চেষ্টা করা বৃথা ও সম্পূর্ণ অর্থহীন। দেখতে পাওয়া যায়, যেসব কেন্দ্র থেকে এই ভাবে গায়ের জোরে শাসন করার চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল, সেসব কেন্দ্রেরই অবনতি ও হীনদশা ঘটেছে সর্বাগ্রে, সেগুলিই আগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। জড়শক্তির বিকাশভূমি ইউরোপ যদি তার অবস্থার পরিবর্তনসাধনে মনোযোগ না দেয়, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে সরে এসে আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তি করে না দাঁড়ায়, তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছরের ভেতর সে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।"

এ যুগের একজন ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক আদর্শকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করলে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ

এবং সাম্যবাদ পর্যন্ত লক্ষ্যলাভের সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে না কখনও। তিনি বলেছেন, "সব দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে, জনগণ-চালিত শাসনতন্ত্র, —তাকে সমাজতন্ত্রবাদ বা অন্য যে-কোন নামেই অভিহিত করা যাক না কেন—এসে যাচ্ছে। জাগতিক অভাবের অবসান, কম কাজ, নির্যাতন-হীনতা, যুদ্ধ-বিরতি, খাদ্যের প্রাচুর্য—এ সব তো লোকে চাইবেই। কিন্তু ধর্মের ওপর, লোকের সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এ সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা যে টিকে থাকবে, তার নিশ্চয়তা কি? ধর্মের ওপর নির্ভর কর; ধর্ম সব জিনিসের মূল পর্যন্ত স্পর্শ করে; এ যদি ঠিক থাকে, সবই ঠিক চলবে।" ধর্ম লোককে আফিংখোরের মতো নির্জীব করে রাখে—স্বামীজীর মতে এরূপ ভাবার চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু থাকতে পারে না; যদিও এ-কথা অতি সত্য যে, মানুষকে দুর্বল, ক্রীতদাসতুল্য, এমন কি মনুষ্যত্বহীন পর্যন্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট দায়ী করা চলে আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যের এক যুগে উদ্ভূত সঙ্কীর্ণ ধর্মধ্বজীদের গড়া বিকৃত ধর্মকে। কাজেই তিনি প্রাণপণে ঘোষণা করেছেন, "আমার মতে হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই; সমাজে ধর্ম যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় নি বলেই এমন হয়েছে। এ-কথা আমি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রতিটি শব্দ ধরে প্রমাণ করে দিতে পারি। এইটাই আমি শেখাতে চাই; আর একে কার্যকর করার জন্য আজীবন আমাদের চেষ্টা করতেই হবে।"

ধর্ম যে সমাজের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ রক্ষা করে চলে, স্বামীজীর এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় বর্তমানযুগের একজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ইংরেজ এচ. জি. ওয়েলস-এর নিম্নোক্ত লেখাটিতে, "ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আজ পর্যন্ত যেসব প্রবল শক্তি আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদসৃষ্টিকারী হিংস্র হীন ও ব্যক্তিগত প্রবল মনোবৃত্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ও সেগুলিকে হটিয়ে দিয়েছে, তা হচ্ছে ধর্ম ও শিক্ষা। পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত ধর্ম ও শিক্ষা বৃহত্তর মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব সম্ভব

করে তুলেছে।…সম্প্রসারমান মানব-সহযোগিতার মহান্ ইতিহাসে এগুলি হচ্ছে প্রধান মিলন-শক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্মতত্ত্বের সংঘর্ষের মধ্যে আমরা বর্তমানযুগের বৈশিষ্ট্যের—ব্যাবহারিক শিক্ষা থেকে ধর্মকে অদ্ভুত ও অসাধারণভাবে আলাদা করে দেবার—ব্যাখ্যা পেয়েছি; আর ধর্ম সম্বন্ধে এই বাদানুবাদ ও বিভ্রান্তিময় অবস্থার পরিণতিও দেখতে পেয়েছি আন্তর্জাতিক রাজনীতির পুনরায় পাশবিকতাবোধে রূপায়িত হওয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে, দেখতে পেয়েছি শিল্প ও ব্যবসায়-জীবনের কঠোর, স্বার্থপর ও অনুৎপাদক মুনাফালিপ্সার দিকে ফিরে আসার মধ্যে। মানুষের মন প্রাচীন সংযম হতে বিচ্যুত এবং সভ্যতা হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।” এভাবে “বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা”-কে শিক্ষা থেকে ধর্মকে বাদ দেবারই ফল বলে জানিয়ে সুধী গ্রন্থকার আমাদের মনে আশার শীতল বারি সিঞ্চন করেছেন, “উদ্দেশ্য ও উদ্যমে শিক্ষাকে আবার ধর্মভাবযুক্ত হতেই হবে; অবিলম্বে ধর্মানুরাগ, বিশ্বজনের সেবা ও পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার প্রেরণা, যা গত পঁচিশ শতাব্দী ধরে সব বড় ধর্মেরই সাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল, আর যে প্রেরণায় ভাটার টান স্পষ্টই লক্ষিত হয়েছিল গত সত্তর-আশী বছরের সমৃদ্ধি, শৈথিল্য, মোহ-মুক্তি ও সন্দিগ্ধচিত্ততার, তা আবার আসবে, নিরাবরণভাবে, সহজভাবে আসবে, মানব-সমাজ-গঠনের মূল প্রেরণা হয়ে আসবে।”

হয় এচ. জি. ওয়েলস-এর আশা সফল হবে—অবশ্য ইউরোপ যদি স্বামীজীর কথামতো “যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সরে এসে আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তি করে দাঁড়ায়,”—আর তা না হলে “বিশ্বমহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা”র পুনরাবৃত্তি ঘ'টে ইউরোপকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেবে; সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তার। এরূপ একটা অমঙ্গলের হাত এড়াবার জন্যই স্বামীজী বেদান্তের মানবতামূলক সর্বজনীন বাণীগুলি প্রচার করেছেন, যা সত্যিই জাগিয়ে তুলবে “ধর্মানুরাগ, বিশ্বমানব-

সেবা ও পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার প্রেরণা।" আবার, নিজ মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবন-কল্পেও তিনি উপনিষদের একই বাণী প্রচার করেছেন।

বেদান্তের মূল শিক্ষা থেকে গৃহীত সমাজ-সেবার কার্যকর প্রণালীগুলি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি। বলেছেন:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তিনি অনুজ্ঞা দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ ব্যথিতের দুর্দশা অনুভব করতে, তাদের ঈশ্বরজ্ঞান করতে; ঈশ্বরপূজার জন্য যতখানি প্রয়োজন, ততখানি ভক্তিভাব, ত্যাগ ও শ্রদ্ধা নিয়ে তাদের সেবা করতে। স্বামীজীর মর্মস্পর্শী বাণী এখনও কর্ণে ধ্বনিত হয়ে চলেছে, "ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? দীন, দরিদ্র, দুর্বল—এরাই তো ঈশ্বর! আগে এদের পূজো কর না কেন? এরাই তোমার ঈশ্বর হোক—এদের কথা ভাবো, এদের জন্য কাজে লেগে পড, এদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা কর প্রাণভরে; দেখবে প্রভু তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।" "দরিদ্রের জন্য যার হৃদয় কাঁদে, তাকেই আমি মহাত্মা বলি, নইলে সে দুরাত্মা।"..."জনগণকে অবহেলা করা একটা বিরাট পাপ বলে মনে করি আমি; আর এটাই আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। ভারতের জনসাধারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভালভাবে শিক্ষা পাচ্ছে, ভালভাবে খেতে-পরতে পাচ্ছে, ততক্ষণ যত রাজনীতিই করা যাক, বিশেষ কিছু ফল তাতে হবে না। আমাদের শিক্ষার জন্য তাদের ত্যাগস্বীকার করতে হয়, আমাদের মন্দির তারা গড়ে দেয়; আর প্রতিদানে পায় পদাঘাত। কার্যতঃ তারা আমাদের ক্রীতদাস। ভারতকে আবার নতুন করে জাগাতে হলে তাদের জন্য আমাদের খাটতেই হবে।" ..."যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।"

স্বামীজী এভাবে সমাজের উচ্চবর্ণকে জনসাধারণের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলেন। যাঁরা জাতীয় উন্নতি চান, তাঁদের বলেছেন, জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে, তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখে তাদের 'হারানো ব্যক্তিত্ব প্রত্যর্পণ' করতে হবে। কারণ, এতে দুই কাজই সিদ্ধ হবে, নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, আবার দেশকে গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও হবে। তিনি দৃঢকণ্ঠে বলেছেন, "ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এ দুটি খাতে তার জীবনপ্রবাহ বেগবান করে তোল, তাহলেই বাকী সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে।"

ফলে স্বামীজীর মতো তাঁর স্বদেশবাসীরাও গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, ভারতীয় জাতি কার্যতঃ কুটিরেই বাস করে! আর দেশের অধিকাংশ লোকই, "বিশ কোটি নরনারী দারিদ্র্যে ও অজ্ঞানান্ধকারে চিরনিমজ্জিত হয়ে রয়েছে।" তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমাদের জাতি যদি আবার তার পায়ের ওপর দাঁড়াতে চায়, তাহলে ধনী শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লোকদের সেবা-অর্ঘ্য হাতে নিযে, উচ্চাসন থেকে নেমে এসে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের কুটিরের দ্বারে দ্বারে গিয়ে খাদ্য ও শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। এভাবে ওপরে তুলে আনতে হবে জনসাধারণকে। কিছুদিনের জন্য নিজেদের বিলাসের, নিজেদের সমৃদ্ধিলাভের "সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, নিজেদের সব শক্তি-সম্বল সাধ্যমতো উৎসর্গ করতে হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনগণের সেবায়।" স্বামীজী বলেছেন, "সর্বাগ্রে ক্ষুধা ও অনাহারব্রূপ দুর্ভাগ্যের, কোনওরূপে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর উদ্বেগের অবসান তোমাদের ঘটাতেই হবে।" "তারপর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এবং অপরাপর জাতিগুলি কিভাবে চিন্তা করেছে, তা তাদের জানাতে হবে। অপরাপর জাতিগুলি বর্তমানে কি করছে, বিশেষভাবে সে-কথা তাদের জানতে দাও।

তারপর কিভাবে তারা চলবে, সে-কথা তাদের নিজেদেরই নির্ধারণ করে নিতে দাও। আমাদের কাজ হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থগুলি একত্র করে দেওয়া ; প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কেলাসন আপনি ঘটবে।”

স্বামীজী বলেছেন, “খাঁটি বৈদান্তিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জাগতিক শিক্ষার সম্মিলিত প্রসারই সর্ববিধ সামাজিক ব্যাধির মহৌষধ। অস্পৃশ্য, স্ত্রীলোক বা নিম্নশ্রেণী বলে যারা সামাজিক অবিচারের চাপে এতকাল নিপীড়িত হয়ে এসেছে, তাদের সকলেরই ভেতর নবপ্রাণের সঞ্চার করবে এই শিক্ষার বিস্তার ; এই শিক্ষা তাদের উন্নত হতে সাহায্য করবে, এই শিক্ষাগুণে তারা নিজেদের কথা ভাবতে, নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবে। প্রাণের পুষ্টিকারক দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সর্ববিধ খাদ্য সরবরাহ করে এইসব সমাজ-নিষ্পেষিত লোকগুলির অসহায় স্তিমিতপ্রায় প্রাণশক্তিকে আবার সতেজ করে তুলতে হবে। ‘রাসায়নিক পদার্থগুলির একত্র সমাবেশ’ বলতে স্বামীজী এই কথাই বুঝেছিলেন। একবার এটা ঘটাতে পারলে, সমাজের পদদলিত অংশের জনগণ একবার তাদের হারানো শারীরিক ও মানসিক সবলতা ফিরে পেলে আধুনিক যুগের জরুরী প্রয়োজনোপযোগী নতুন নতুন সামাজিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন করার সামর্থ্য তাদের আসবে। এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর এই বিবৃতিতে—‘প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কেলাসন আপনি ঘটবে।’ এই নিজে থেকে বেড়ে ওঠার কাজে, জাতীয় জীবনের এই স্বাভাবিক সম্প্রসারণে সহায়তা করার কাজে অবিলম্বে লেগে পড়ার জন্য স্বামীজী সমাজসেবীদের বারে বারে তাগাদা দিয়েছেন। গোঁড়াদের মতো তিনি সমাজকে আধুনিক কালের অনুপযোগী প্রাচীন প্রথা ও চিরাচরিত আচরণের গুল্মজালে চির-আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। একটা নতুন স্মৃতির (সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতির গ্রন্থ) প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন—এমন একখানি স্মৃতি, যা বেদান্তের মূলতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, আবার

পরিবর্তিত আধুনিক জীবনের সঙ্গেও খাপ খেয়ে যাবে। কিন্তু আধুনিক সংস্কারকদের মতো পুরাতন নিয়ম-কানুনগুলিকে নির্বিচারে ছেঁটে ফেলে দিয়ে সমাজের ওপর কতকগুলি নতুন নিয়ম জোর করে তিনি চাপাতে চান নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যাবহারিক- ও ভাব-জগতে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে, সেগুলির সমবায়ে গড়া খাঁটি সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যমে তিনি সমাজের অবনমিত সম্প্রদায়ের উন্নতির গতিবেগ দ্রুততর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ হলে শিক্ষার নবালোক পেয়ে নিপীড়িতের দল নববলে বলীয়ান হয়ে উঠবে, এবং যুগোপযোগী নতুন স্মৃতির উদ্ভাবন করতে উদ্বুদ্ধ হবে; ফলে সমগ্র সমাজের স্বাস্থ্য ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে-সব সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন, তার পুনরধিকার তারা লাভ করবে। এইজন্যই স্বামীজী বলেছিলেন, 'যতক্ষণ না উচ্চতর প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙ্গে ফেলার প্রচেষ্টা ভয়াবহ পরিণতিই নিয়ে আসবে।' এভাবে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবের চেয়ে বিবর্তনের ধারায় বেশী আস্থাবান ছিলেন। ওপর থেকে চাবুক মেরে সংস্কার করা, বা নীচে থেকে তার জন্য সংগ্রাম করা—এর কোনটারই পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ দুটি পথই ধ্বংসাত্মক। প্রথমটি সাংস্কৃতিক আদর্শগুলিকে বিপর্যস্ত করে তুলবে; আর দ্বিতীয়টি সমাজদেহ থেকে সবলে প্রাণ নিষ্কাশিত করে দেবে। তিনি বলেছেন, "বলতে দুঃখ হয়, আমাদের বর্তমান সংস্কার-আন্দোলনগুলিব অধিকাংশই হচ্ছে পাশ্চাত্য উপায় ও কর্ম-পদ্ধতির বিচারহীন অনুকরণ; ভারতে এ জিনিস যে চলবে না তা নিশ্চিত।"

প্রচলিত বিধিগুলির ভেতর "অতি কুসংস্কাবাচ্ছন্ন ও অতি অযৌক্তিক" অংশগুলির জন্যও অভিসম্পাত বা গালাগাল দিতে সমাজসেবীদের নিষেধ করেছেন স্বামীজী; এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে বলেছেন তাঁদের, "যে প্রথাগুলিকে আজ নিঃসন্দেহে অনর্থমূলক বলে মনে হচ্ছে. সেগুলিও অতীতে

একদিন নিঃসংশয়ে প্রাণপ্রদ ছিল।" "এগুলি যদি সরিয়ে ফেলতে হয়, তাহলে সে কাজ করার সময় যেন অভিসম্পাত-মুখর না হই আমরা ; বরং জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রথাগুলি একদিন যে মহৎ কাজ করেছিল, তার জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে এগুলিকে যেন আশীর্বাদ করি তখন।" তাছাড়া তাঁর মনে হয়েছিল, যা একদিন অতীতে শুভকারী ছিল, সেই ধর্ম-বিধির অপব্যবহারগুলির ত্রুটী সংশোধন করতে হলেও হঠকারীর মতো হুকুম চালিয়ে তা করা উচিত নয়। আধুনিক কালের শিশুদের শিক্ষকেরা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে যা করে থাকেন, তাই করতে হবে—সমাজের মনস্তত্ব অবলম্বনে সে সংশোধন করতে হবে। সমাজকে তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে ধীরে ধীরে। তারপর উন্নতির পথে যে-সব কুসংস্কারকে সে বাধা বলে মনে করবে, সেগুলিকে যাতে সে সুস্থ স্বাভাবিক ও স্বত-অভিব্যক্ত প্রচেষ্টায় সরিয়ে ফেলতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট শক্তিমান করে তুলতে হবে সমাজকে। "জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ কর, কিন্তু সে বেড়ে উঠবে নিজে নিজেই ; হুকুম চালিয়ে তাকে বাড়াতে পারবে না কেউ।" "যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে তাকে সাহায্য কর, যাতে সে ওপরে উঠে আসতে পারে···। তুমি আমি কি করতে পারি? একটি শিশুকেও শিক্ষা দিতে পার বলে ভাবছ নাকি? না, তা পার না। শিশু নিজের শিক্ষা নিজেই আহরণ করে নেয়। তোমার কর্তব্য, তাকে তার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া।" আগ্রহশীল ধীর সমাজ-সেবকের কাজ হচ্ছে জনগণের দেহ ও বুদ্ধিকে তেজীয়ান করে তোলা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আধ্যাত্মিক করে তোলা। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বেদান্তের প্রাণপ্রদ সলিলে সমাজ যদি একবার অবগাহন করতে পারে, তাহলে তার বিশ্বাস ও আচরণের ওপর গজিয়ে ওঠা সব বিষাক্ত ক্ষতই আপনা-আপনি সেরে যাবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এতে "বাহ্য-উপশম মাত্র হয়ে দেহের মধ্যে তার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারবে না, রোগের মূল পর্য্যন্ত

উপচে বেরিয়ে যাবে।" তিনি বলেছেন, "মনের অভ্যন্তরে যে আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করে চলে, সমাজের কল্যাণকর পরিবর্তনগুলি তারই বাহ্য প্রকাশ; কাজেই সে শক্তি যদি সবল ও সুপরিচালিত হয়, তাহলে সমাজও সেরূপ সুষ্ঠুভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে।" আর জনগণকে তিনি বলেছেন, "তথাকথিত সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবে মাথা গুলিয়ে ফেলো না, কারণ আধ্যাত্মিক সংস্কার হবার আগে সমাজ-সংস্কার হতে পারে না।"

সর্বশেষে স্বদেশবাসীর হাতে তিনি তাদের আশু পবিত্র গুরু কর্তব্যভার তুলে দিয়েছেন, "কথা বলা থামাও, হৃদয়ের দ্বার খুলে যাক। স্বদেশের ও সারাজগতের মুক্তির কাজে লেগে পড়। তোমাদের প্রত্যেকেই ভাববে যে, এ-কাজের সব দায়িত্ব তোমার নিজেরই।" কোনরূপ সঙ্কীর্ণ স্বদেশ-প্রেমের পূর্ব-সংস্কার বাস্তবিকই স্বামীজীর ছিল না। মানবজীবনের কতকগুলি সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ভাব ও আদর্শের ধারক ও বাহক ভারতের জন্য—তাঁর স্বদেশের জন্য তাঁর যে ভালবাসা, সে ভালবাসার সম্পর্ক বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে; জগতের সব মানুষের জন্য তাঁর যে ভালবাসা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যে সংবদ্ধ রয়েছে তাঁর স্বদেশ-প্রেম। শুধু একত্বরূপ বৈদান্তিক ভাবের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও প্রচলনের মাধ্যমেই যে সর্বজাতির দুর্বল, দুঃখ-জর্জরিত ও পদদলিতদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট দূর করা সম্ভব, সে-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। একমাত্র এই ভাবগুলির প্রচলনের মাধ্যমে ভীতি-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বেদনাক্লিষ্ট জগৎ তার স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীর স্বপ্ন সফল করে তুলতে পারে। বিশ্বের জাতি-সঙ্ঘের যে বহু আকাঙ্ক্ষিত সৌধ নির্মাণের স্বপ্ন জগৎ দেখছে, একমাত্র বেদান্তই সে সৌধের সর্বজনীন ও যুক্তিসহ ভিত্তি গড়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু ভারতীয় জীবনে তার যোগ্যতার নিঃসংশয় প্রমাণ প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে জগৎ বোধ হয় নিজের পুনর্গঠনের কাজে বেদান্তের সত্যগুলি গ্রহণ করতে পারবে না। কাজেই বৈদান্তিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি অবলম্বনে ভারতের উদ্ধারসাধনের পথ

বেয়েই জগতের মুক্তিসাধনের পথে পৌঁছুতে হবে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। হিন্দুসমাজ এই শক্তির অন্তর্নিহিত প্রভাব বাস্তবজীবনে প্রমাণ করতে পারলেই জগৎ আপনা হতেই বেদান্তের আদর্শানুসারে আধুনিক সভ্যতাকে ঢেলে সাজতে উদ্যোগী হবে। এইজন্যই নিজস্ব প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে স্বদেশবাসীদের সচেতন করে তুলতে, এবং সেই মহান্ আদর্শগুলিকে পুনরুদ্বোধিত ও বাস্তবে রূপায়িত করে নিজের ও সমাজের জীবনকে প্রাণচঞ্চল করে তোলার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন শাখা-সমন্বিত হিন্দুধর্মের নবজাগরণকে ও সেইসঙ্গে সর্ববিষয়ে ভারতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনকে সমগ্র মানবজাতির দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় সোপান বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। স্বদেশবাসীকে তিনি বলেছেন, এই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ভারত বহু শতাব্দীর অত্যাচার ও বর্বরোচিত ব্যবহার সহ্য করেও বেঁচে আছে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, ভারতের প্রাণস্পন্দন এখনো থেমে যায় নি; কারণ তার গুপ্তধন—তার প্রাচীন ঋষিদের আবিষ্কৃত সর্বজনীন ভাবগুলি এখনো তাকে বিতরণ করতে হবে সারা বিশ্ববাসীর কাছে; এবং মানবসভ্যতার মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চার করতে হবে বিরাট বিশ্ব ও ব্যষ্টি-মানব এই উভয়ের নিয়ন্তা সর্বব্যাপী চৈতন্যের অরুণ রাগে তাকে রঞ্জিত করাবার জন্য। ভারত যে আবার নিশ্চয়ই আত্মসচেতন হয়ে, সুস্থ সবল হয়ে তার গৌরবের উচ্চতম শিখরে উঠে দাঁড়াবে, এবং বৌদ্ধ প্রচারের অভ্যুদয়কালের মতো আবার যে সে বিশ্বে কল্যাণপ্রদ মহান্ আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ছড়াবে, সে-বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন স্বামীজী। মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করে প্রেমের বাণীর মাধ্যমে বিশ্বমানবকে উন্নত জীবন গঠনে সে সহায়তা করবে। মাতৃভূমি ভারতের ব্রত ও উদ্দেশ্য এত উন্নত বলেই স্বামীজী তাঁর স্বদেশবাসীদের এ-কথা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করেছিলেন যে, নিজেদের জাতি-সংগঠনের কাজে নিরত হওয়ার সময়ও গোটা বিশ্বের শান্তি ও সামঞ্জস্যের দিকে যেন দৃষ্টি রাখে তারা, ভারতের

শুদ্ধ প্রেম ও সেবা প্রসারিত হয়ে চিরদিন যেন স্পর্শ করে চলে সারা বিশ্বের সব ঠাঁই। স্বামীজীর নিরীক্ষাপ্রসূত তথ্য ও স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর আকুল অনুরোধের গভীরতা ও জ্ঞানগর্ভতা ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে তার ভবিষ্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্বামীজী যা সব বলে গেছেন। "জাগ, ওঠ, লক্ষ্যলাভের পূর্বে থেমে যেয়ো না"—তাঁর এই তূর্যনিনাদ এখনো লোকের কানের পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাদের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জড়তা ও আধুনিক কালের মোহ কাটিয়ে দিচ্ছে। আর, এভাবে জাগিয়ে তুলছে তাঁর প্রিয়, অতিপ্রিয় মাতৃভূমিকে "গভীর, দীর্ঘ নিদ্রা" থেকে।

উদ্দেশ্যের সংহতিসাধন

ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে সঞ্জীবনী বাণী ছড়ানো ছাড়াও আর একটি কাজের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছিলেন বিবেকানন্দ; সেটি হল, আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি জীবনে প্রতিফলিত করে ও প্রচার করে সেগুলিকে জীবন্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর ভাবের পতাকাবাহীদের একটি সংঘকে শিক্ষিত করে তোলার উপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা কিছু করে যাওয়া। আর, ভাবকে সজীব করে রাখার এই ব্যবস্থাটি ভবিষ্যতে পুরুষানুক্রমে সক্রিয় থাকা চাই। সেজন্য উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে জীবনগঠন করে মানবজাতির উন্নয়নকল্পে জীবন উৎসর্গ করতে পারে, এমন সব খাঁটি মানুষ গড়ে তোলার উপযোগী কয়েকটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, ভারতে ও বিদেশে। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে এরূপ প্রতিষ্ঠানকে তিনি মূলতঃ সন্ন্যাসী-সংঘরূপে গড়তে চেয়েছিলেন; আর চেয়েছিলেন যে সেটা চিরাচরিত সন্ন্যাসী-সংঘগুলির মতো আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত ও স্বাতন্ত্র্য-কেন্দ্রিক

হবে না, বরং হৃদয়বান অনুরাগী জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে লেগে পড়বে জাতিবর্ণের কোন ভেদ না রেখে মানবজাতির অতিপ্রয়োজনীয় সেবার কাজে। সেবাকার্যটি নিয়োজিত ও সীমিত থাকবে কেবল দুর্গতদের উন্নতির সহায়তার জন্য—যার যেমন অভাব তাকে তার প্রয়োজনমতো আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিক খাদ্য বিতরণের মধ্যে।

আমেরিকা হতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী যতশীঘ্র পারলেন এবিষয় নিয়ে তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ততদিনে বরাহনগর থেকে নিকটস্থ আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রথমদিকে একটু অসুবিধা হলেও পরে তিনি তাঁদের বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হলেন যে এই ভাবগুলি সবটা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, আসলে এসব ভাব এসেছে তাঁদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই। "আমাকে কাজ করতেই হবে।" তিনি বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের দাস আমি, এ কাজ সমাধা করার ভার তিনি আমায় দিয়ে গেছেন। এ কাজ শেষ হবার আগে তিনি আমাকে বিশ্রাম দেবেন না।" তাঁর গুরুভাইদের মনে পড়ল, সম্পূর্ণ সমাধিস্থ থেকে জীবন কাটাতে চাওয়ার জন্য বিবেকানন্দ কিভাবে তিরস্কৃত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে; শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা-ই তাঁকে দিয়ে মাতৃভূমি ভারত ও জগতের জন্য গভীরভাবে ভাবিয়ে ও অতন্দ্রভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। রহস্যময় ভাষায় তিনি বলেছিলেন তাঁদের, "আমার বরাতে বিশ্রাম নেই; শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে কালী বলতেন, তাঁর দেহত্যাগের তিন চার দিন আগে সেই-ই আমার শরীর-মন আশ্রয় করেছে। সেই-ই আমাকে দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে; কাজ আর কাজ; আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য কখনো কিছু করতে দিচ্ছে না আমাকে।"

তাঁর গুরুভাইরা সকলেই ততদিনে মহা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজী তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মর্ম ও তাৎপর্য যেভাবে বুঝেছিলেন, নিজ গুরুভাইদেরও

সেভাবে তা অনুধাবন করতে তিনি রাজী করালেন, এবং সন্ন্যাসিসংঘের পরিকল্পনার মধ্যে জনগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করার আদর্শটি অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। তিনি তাঁদের সচেতন করে দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন তাঁর সন্তানরা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গড়ে তুলবে, আর সেখানে নিজ নিজ জীবনে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ—আধ্যাত্মিকতালাভের এই সবগুলি মার্গেরই সমন্বয়সাধন করবে,—যে সমন্বয়ের নিখুঁত ও মহিমময় ঘনীভূত রূপ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। কাজেই গভীর ধ্যানে মন তলিয়ে দিতে হবে তাঁদের, সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতে হবে, আবার সেখান থেকে বুত্থিত হয়ে দুর্গত জনগণের মর্মবেদনার সহানুভূতিতে মনকে স্পন্দিত করাতে হবে। ধ্যানসহায়ে আপন অস্তিত্বের গভীরতায় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, আবার সেবাকার্যসহায়ে সেই একই ঈশ্বরকে, বিরাটকে, দেখতে হবে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। আর এ দুটো প্রক্রিয়াই চলবে দেহের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ ছন্দে, একটার পর অন্যটা। এই নবীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জীবননীতি হবে নিজের মুক্তিসাধনের ও মানবরূপী ঈশ্বরের সেবার সুসমঞ্জস সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অতীতকাল হতে আগত প্রচলিত পন্থাগুলির অনুকরণমাত্র করতে আসেন নি, এসেছিলেন সেগুলির পূর্ণতাবিধান করতে। সব ধর্মমতকেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন তিনি, যার ফলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যস্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। তাঁর সন্তানদেরও তাঁর এই পরম বাণী জীবনে রূপায়িত করে বিতরণ করতে হবে জগতের দ্বারে দ্বারে; চেষ্টা করতে হবে সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির কবল থেকে জগতকে মুক্ত করার জন্য, এবং এই বিভ্রান্তিজনিত যে বিপদের পথে উন্মাদ হয়ে সে ছুটে চলেছে, সে পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

গুরুভাইদের ও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্তদের নিয়ে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মিশনের কাজ হবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার আলোকে বেদান্ত-ধর্মানুযায়ী জীবন গঠন করা ও তা প্রচার করা, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে আর্ত মানবের সেবা করা।

তাঁর অনুগত ইংরেজ ভক্ত মিস হেনরিয়েটা এফ. মুলার এবং আমেরিকার ভক্ত মিসেস ওলি বুল-এর প্রদত্ত অর্থে কলকাতার প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত বেলুড়ে গঙ্গাতীরে কিছু জমি কিনে সেখানে তিনি একটি মঠবাড়ি নির্মাণ করলেন এবং একটি স্থায়ী তহবিলেরও ব্যবস্থা করলেন। সংঘের একটি নিজস্ব আবাস হল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে এভাবে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠটি রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসিসংঘের ও সেখানকার সন্ন্যাসীদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল; এখান থেকে ভারতে ও বিদেশে মঠের শাখাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ, পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ চলতে পারবে। 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতির প্রচার ও লোকহিতকর সেবাকার্য পরিচালনারও প্রধান কেন্দ্র হল এই বেলুড় মঠ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণ শেষ করে ফেরার পর স্বামীজী একটি 'ট্রাস্ট'-এর দলিল রেজিষ্ট্রী করে সন্ন্যাসিসংঘকে আইনতঃ বলবৎ করে দিলেন। এবং 'ট্রাস্টী'-গণের প্রথম সভাপতি করলেন উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ও সংঘ-পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার অধিকারী যোগ্যতম গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। শান্তপ্রকৃতি, অসীম ধৈর্যবান, কর্মক্ষম শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দকে নিউইয়র্ক কেন্দ্র থেকে আনিয়ে নিযুক্ত করলেন সংঘের বিভিন্ন কার্যপরিচালনার কাজে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সাহায্য করার জন্য। আর বহুবিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যবান স্বামী অভেদানন্দকে পাঠালেন স্বামী সারদানন্দের স্থলাভিষিক্ত করে নিউইয়র্ক কেন্দ্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পার্ষদ নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা ও অসীম প্রেমের আধার স্বামী প্রেমানন্দকে তিনি বেলুড় মঠে কাজকর্ম দেখাশোনা করার ভার দিলেন। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন উৎসাহী যুবক সংঘভুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামীজীর

অনুরাগী আরো কয়েকটি পাশ্চাত্যদেশবাসী ভক্তও ভারতে এসে গেলেন। এই সব শিক্ষানবীশদের উপযোগী ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক শিক্ষার কাজও শুরু হল। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম একনিষ্ঠ ভক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মঠের প্রারম্ভ থেকেই যিনি মঠবাস করছিলেন—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসেই মাদ্রাজে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরিত হলেন। এই বছরেরই মাঝামাঝি সময়ে আধ্যাত্মিক জীবনে অতি উন্নত আর একজন গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য সিংহলে (অধুনা শ্রীলঙ্কা) পাঠালেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে আরো দুজন গুরুভাইকে গুজরাটে পাঠানো হল। প্রচার-কার্যের জন্য সন্ন্যাসীদের নানাস্থানে পাঠানো ছাড়াও স্বামীজী বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে মহামারী- ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য ও সেবাকার্য চালাবার জন্য গুরুভাইদের ও ভক্তদের উৎসাহী করে তুলছিলেন। রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী-সংঘের বর্তমান* অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর আমেরিকা থেকে ফিরে আসার আগেই রাজপুতানার খেতরী অঞ্চলের বস্তিগুলিতে কিছুদিন শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁকে পাঠানো হল মুর্শিদাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবার জন্য। এই সেবা উপলক্ষ করে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে একটি অস্থায়ী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন; এইটিই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম স্থায়ী সেবা-কেন্দ্র। এই বছরেরই মার্চ মাসে, সেভিয়ার দম্পতির উদ্যমে ও অর্থসাহায্যে আলমোড়া জেলার মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী হিমালয়ের বুকে তাঁর বিশ্বজনীন কেন্দ্রস্থাপনের ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করেন। কয়েকমাস পরে ইংরেজী মাসিকপত্র 'প্রবুদ্ধভারত'-এর প্রকাশকেন্দ্র মাদ্রাজ থেকে মায়াবতীতে স্থানান্তরিত করে তার পরিচালনার ভার দেওয়া হল সেভিয়ারকে, আর

* ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়; সে সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ অধ্যক্ষ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।

সম্পাদক করা হল স্বামীজীর অন্যতম সুযোগ্য ভারতীয় শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সুদক্ষ পরিচালনায় এই বছরের প্রথম দিকে কলকাতা হতে 'উদ্বোধন' নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্রের প্রকাশনও আরম্ভ হয়েছিল।

এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা ও স্বামী বিবেকানন্দের একাগ্র আত্মনিয়োগের ফলে আধুনিক যুগের প্রয়োজনোপযোগী সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটি সন্ন্যাসিসংঘ সৃষ্ট হল। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে লক্ষ্য করে ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হল, যাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ রয়েছে নতুন ধরনের সামাজিক কর্তব্যের উদ্ভাবনের দিকে। নির্জলা ধর্ম-ভাবে ভাবিত লোক ইউরোপে বড় বিরল; তাছাড়া প্রাচ্যের লোক এসব ভাব যেমন বোঝে, সেখানকার লোক ততটা বোঝেও না; সাধারণ লোকের ভক্তিভাব বলতে সেখানে সেবাকার্যই বোঝায়। কিন্তু ভারতে, সন্ন্যাসিসংঘের কাছে লোকের মুখ্য দাবি হচ্ছে এই যে সেখানে সন্ন্যাসীরা শুধু জীবনগঠন করবে। আর, সেসব সন্ন্যাসীরা সনাতন ভারতের অতীন্দ্রিয়-জীবনগঠন-রূপ চিরাচরিত মহান্ আদর্শানুসারে না চলে সমাজকে উন্নত করার জন্য সেদিকে ফিরে চাইত, আগেকার দিনে লোকে তাদের সুনজরে দেখতে পারত না।" মানুষের মধ্যে ঈশ্বরদর্শনরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আধ্যাত্মিক সাধনা ও সামাজিক কর্তব্যের মধ্যকার ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে দিয়েছে, এবং এভাবে গোটা মানুষ জাতটাকেই আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত করার পথ খুলে দিয়েছে। আর, প্রাচীন আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে মানবজাতির অস্তিত্বকেই যারা বিপদসঙ্কুল করে তুলেছিল, সেই সব সংসারী লোকদের অতি আবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর ধর্মকে পর্বতগুহা ও অরণ্য থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন সমাজের মাঝখানে। ঠিক এই যুগপ্রয়োজন

মেটাবার জন্য, দলগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত, জাতিগত ও ধর্মবিদ্বেষ-উদ্ভূত কুসংস্কার, স্বার্থপরতা ও সংঘর্ষসঞ্জাত আসন্ন ধ্বংস হতে জগৎকে বাঁচাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যোগ্য পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দকে দিয়ে এক বিরাট পয়ঃ-প্রণালী খনন করিয়েছেন ; যার ভেতর দিয়ে দুর্গম গহন গভীর প্রদেশ থেকে শক্তিদাত্রী ও দেবভাব-সঞ্চারিণী আধ্যাত্মিকতা-তরঙ্গিনী প্রবাহিতা হয়ে সমগ্র মানবসমাজকে পরিপ্লাবিত ও উজ্জীবিত করে দিতে পারবে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামীজী পুনর্বার পাশ্চাত্যভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন, এবং প্রায় দেড় বছর কাটিয়ে আসেন সেখানে। যাবার সময় আমেরিকার অনুরাগীদের দৃষ্টিপথে ভারতীয় বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর সুসংযত আদর্শের জীবন্ত উদাহরণ তুলে ধরবার জন্য স্বামীজী তাঁর বিশিষ্ট গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে সম্মত করিয়ে সঙ্গে নিযে যান। লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূলে উপনীত হলেন তিনি। তাঁর প্রথমবার আগমনে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব, মধ্য ও মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে কর্মধারা নিবদ্ধ রাখার সময় যা ঘটেছিল, এবারে এখানেও তাই ঘটল ; তাঁর কথায় লোকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল এবং কয়েকটি বেদান্তকেন্দ্রও স্থাপিত হল। সেগুলির মধ্যে বড় কেন্দ্র হিসাবে সানফ্রান্সিসকো কেন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্রটি, এবং নিকটবর্তী অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রের পরিচালনার ভার স্বামী তুরীয়ানন্দের ওপর ন্যস্ত করে এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত-কেন্দ্রের কাজ স্বামী অভেদানন্দের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে নির্বিঘ্নে চলছে দেখে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি আমেরিকা পরিত্যাগ করে প্যারিসের পথে রওনা হলেন, সেখানে ধর্মেতিহাসের মহাসভায় যোগদান করতে।

ফ্রান্সে, বিশেষ করে প্যারিসে, মাস তিনেক ছিলেন তিনি ; সেখানে থাকাকালীন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাট্রিক গেডেস, জুলেস রইস, পেরে হেসিনথী, হিরাম ম্যাক্সিম, ম্যাডাম কালভে, ম্যাডাম সারা বার্ণার্ড, প্রিন্সেস

ডেমিডফ এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন তিনি। প্যারিস থেকে বেরিয়ে মধ্য ইউরোপের কয়েকটি বিশিষ্ট রাষ্ট্র পরিদর্শন করে তিনি মিশর যান, সেখান থেকে ভারতের দিকে রওনা হয়ে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গমন করেন, এবং আরো কয়েকমাস পরে পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) ও আসামের কয়েকটি জেলায় সফর করে বেড়ান। এই বছরের শেষের দিকে জাপানের জনৈক মঠাধ্যক্ষ পণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রেভারেণ্ড ওডা, ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর জাপান থেকে ভারতে আসেন; জাপানে যে ধর্মমহাসভা হবার কথা হচ্ছিল, তাতে যোগদান করার জন্য স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। অবিরাম কর্মের দুঃসহ চাপে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল; সে সময় শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষের আগ্রহাতিশয্য দেখে জাপানে যাবার নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মনে সাড়া জেগেছিল অধ্যক্ষের কথায়, "আপনার মতো বিশিষ্ট লোক মহাসভায় যোগদান করলে সভার উদ্দেশ্য সফল হবে। আমাদের সাহায্যার্থে আপনাকে যেতেই হবে। জাপানে ধর্মজাগরণের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে, আর আমাদের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে আপনি ছাড়া আর কে যে বাস্তবে পরিণত করতে পারবেন তা তো জানি না।" ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী বোধগয়ায় তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে যান কাশীতে। শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই দেশ-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন তিনি। অসহায় রোগীর সেবার জন্য তিনি কাশীতে একদল যুবককে উৎসাহিত করেন। উৎসাহ পেয়ে এই যুবকদলটি কাজে লেগে পড়েন এবং পরিশেষে তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের আনুকূল্যে কাশী সেবাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।

এভাবে তাঁর প্রিয়তম গুরুর বাণী ভারতে ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রচার করে এবং রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী-সংঘ সুসংবদ্ধ করে, সংঘকে নিজের ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে স্থায়ী ও নিরাপদ ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে, উনচল্লিশ বছর বয়সে স্বামীজী অকালে মহাপ্রস্থান করলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে। এত স্বল্প জীবনের ভেতরও চিরাচরিত ধাবার বীরের মতো না হয়ে ভারতের আধুনিক যুগের "প্রমেথিয়াস" (গ্রীক দেশের উপকথার সংস্কৃতির বীর)-এর মতো তিনি স্বর্গ হতে ঈশ্বরের নিজ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অগ্নি আহরণ করে নিয়ে এসেছিলেন এই ধরণীতে; আর সে আগুন ব্যবহার করেছিলেন সব কিছুর ভেতর একটা নতুন ধারা এনে দিতে—একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে, যে জগতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান হাত মেলাবে, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসগুলি যে জগতে একই সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তির ওপর মিলিত হয়ে পাশাপাশি দাঁড়াবে; যে জগতে জনগণ বহুযুগাগত নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে; যে জগতে মানবসভ্যতা আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হবে; এবং যে জগতে সুস্থ ও সক্ষম জীবনের অধিকার লাভ করে সমগ্র মানবজাতি সত্যকার উন্নতির পথে বিজয়গর্বে এগিয়ে চলবে "ত্যাগ ও সেবা, বিশ্বজনীন ভালবাসা, শান্তি ও সামঞ্জস্যের" পতাকা বহন করে।

৪
নবযুগের অরুণাভাস

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক জাগরণের এবং বিশ্বমৈত্রীর নবযুগের অরুণোদয় হয়েছে, আর যত দিন যাবে, ততই দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর প্রভাব ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ছে, যুগের পরম প্রয়োজন মেটাবার জন্য। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসংঘ শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক স্নেহচ্ছায়ায় এবং গুরুভাইদের অকুণ্ঠ সহযোগিতাপুষ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে নতুন নতুন লোকের সংঘভুক্তি এবং পরলোকগত নেতার নির্দেশানুসারে প্রচার ও জনহিতকর সেবাকার্যের প্রসারসাধনপূর্বক ক্রমেই পুষ্ট হয়ে চলতে লাগল।

জনহিতকর কাজের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হওয়ায় এবং দায়িত্বও ক্রমশঃ বেড়ে ওঠায় কালে প্রতিষ্ঠানটি যথাবিধি দুটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। সুচারু পরিচালনার এবং প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্যের আইনসঙ্গত অধিকারের অনিবার্য প্রয়োজনের জন্য সমস্ত জনসেবাবিষয়ক, শিক্ষাবিষয়ক, দান ও প্রচারবিষয়ক কাজগুলিকে ভারতের সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল-এর ১৮৬০ সালের ২১ ধারা অনুসারে একটা আইনসঙ্গত সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং যথারীতি রেজিস্ট্রী করে তার নাম দেওয়া হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন'। সংঘের নিয়মাবলীতে কাজের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি স্পষ্ট নির্দেশে লিপিবদ্ধ করা হয়; স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই এসব করা হয়। নিয়মানুসারে বেলুড় মঠের

ট্রাস্টীরাই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনা-সমিতির (গভর্ণিং বডির) সদস্য হলেন, আর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্রও হল বেলুড় মঠ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯০১ খৃষ্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠের ট্রাস্টীদের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; তিনিই যথাবিধি রেজিষ্ট্রীকৃত রামকৃষ্ণ মিশনেরও প্রেসিডেণ্ট হলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসানের পূর্ব পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন তিনি। তাঁর দেহত্যাগের পর মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট হন স্বামী শিবানন্দ। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগের পর নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ে বর্তমান প্রেসিডেণ্ট স্বামী অখণ্ডানন্দজীর ওপর।* প্রথম থেকে শুরু করে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সেক্রেটারীর গুরুদায়িত্বপূর্ণ ও গুরুভার কাজ অতি নিপুণতার সহিত নিখুঁভাবে চালিয়ে আসছিলেন স্বামী সারদানন্দ। তাঁর অবর্তমানে একাজের ভার পর পর বহন করেন স্বামীজীর দুজন যোগ্য শিষ্য; প্রথমে স্বামী শুদ্ধানন্দ, পরে স্বামী বিরজানন্দ।†

বেলুড় মঠের ট্রাস্টীরা অন্যান্য বহু বিষয় ছাড়া রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীদের অধ্যাত্ম-শিক্ষা, উন্নতি, চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয়ে নজর রাখেন, এবং সংঘের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সাধনক্ষেত্র হিসাবে বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে মঠের শাখাকেন্দ্র স্থাপন, সেগুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আর, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা করে বিবিধ প্রকার সমাজ-সেবার কাজ; যেমন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারী ও এই ধরনের অন্যান্য সাময়িক দৈব-দুর্বিপাকে অস্থায়ী সাহায্য দান প্রভৃতি কাজ; আবার স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থসাহায্য, প্রচার ও শিক্ষামূলক নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন কাজও। হাসপাতাল, ঔষধালয়, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, প্রচারকেন্দ্র, অনাথাশ্রম, শিল্প-শিক্ষালয়, বালক বালিকা উভয়ের জন্যই আবাসিক মধ্য ও উচ্চশিক্ষা-

* ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়।
† বর্তমান সেক্রেটারী—স্বামী গম্ভীরানন্দ

প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য বাসস্থান এবং আংশিকভাবে সাংস্কৃতিক শিক্ষার ও জনসাধারণের জন্য প্রচারসফরের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের দেহ-ত্যাগের পর কিঞ্চিদধিক তিন দশকের মধ্যেই রামকৃষ্ণসংঘের সাধু-ব্রহ্মচারীর সংখ্যা কয়েক শত হয়ে গেছে, এবং সংঘকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রমের জাল গোটা ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে। এদিকে রামকৃষ্ণ মিশন এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অংশে বন্যাত্রাণ প্রভৃতি অসংখ্য সাময়িক সেবাকার্য করে এসেছে, এবং ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা), মালয় প্রভৃতি স্থানের বহু জায়গায় স্থায়ী সেবাকার্যের প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছে ; আর বেশ কতকগুলি প্রচারকেন্দ্র খুলেছে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে।† এসব ছাড়াও, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার আদর্শের প্রতি সংঘের সন্ন্যাসীদের অটল শ্রদ্ধা, তদনুরূপ সাধনা এবং ধর্মপ্রসঙ্গ, বক্তৃতা, ভারত ও আমেরিকায় প্রকাশিত কয়েকখানি মাসিক পত্রিকার এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে সে-আদর্শের প্রচারের ফলে লোকে ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে।

কোন মারাত্মক বিষম ব্যাধির করাল কবল হতে মুক্তিলাভ করে নিরাপদ হবার পর প্রায়ই জীবনীশক্তির নব উন্মেষ দেখা যায়, রোগমুক্ত ব্যক্তির প্রতি অঙ্গে, প্রতি আচরণে তা ফুটে ওঠে। কোন সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের বেলাতেও তাই ঘটে। দীর্ঘদিনের আধ্যাত্মিক অবসাদ কাটিয়ে সমাজও যখন পুনরুজ্জীবনের পথ ধরে চলে, তখন জীবন্ত দেহের মতো তারও প্রতি অঙ্গে, প্রতি আচরণে নবীনতা ও সবলতার পুনরুদ্দীপ্ত প্রাণ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সমাজের আধ্যাত্মিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই তার কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির পুনরুজ্জীবন

† বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রসংখ্যা (প্রধানকেন্দ্র বেলুড় মঠ সহ) ১২০

পরিলক্ষিত হয়; বস্তুতঃ সমাজজীবনের সর্বত্রই একটা অদম্য শক্তির বিকাশ ঘটে। ভারতের ইতিহাসে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর দিয়ে বহুবার জোয়ার-ভাটা খেলে গেছে, আর প্রত্যেক ধর্মোচ্ছ্বাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক কালগুলিতে দেখা গেছে যে এই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বব্যাপী পুনর্জাগবণও ঘটেছে বিনা ব্যতিক্রমে।

খুবই আশার কথা, শ্রীরামকৃষ্ণজীবনেব আবির্ভাবে হিন্দুধর্মেব সব শাখা জুড়ে যে নব-জাগরণ এসেছে, তারই সমকালে হিন্দু-সংস্কৃতিও সর্ববিষয়ে পুনর্জাগ্রত হয়ে উঠেছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীবামকৃষ্ণ এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ কবেছেন, আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হিন্দুজাতিব সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতা পুবোপুরি ফিরে পাবার অভ্রান্ত লক্ষণ সব দেখা দিয়েছে, এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন কর্মধারায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দেব বেদান্তের সর্বজনীন বাণী প্রচারের ফলে স্থূল ও কুসংস্কাবাচ্ছন্ন ধর্মমত বলে প্রাচীন হিন্দুধর্মের যে অপবাদ রটেছিল, তা কেটে যায়, এবং তার প্রচাবের কাজ স্পষ্টতঃ শুরু হয়ে যায়। এই প্রচারের কাজকে ভগিনী নিবেদিতা 'চড়াওকাবী হিন্দুয়ানী' বলে আখ্যাত করেছেন। হিন্দুধর্মেব ভেতর প্রচারের জন্য যে সদ্য আগ্রহ এসে গিয়েছিল, সেই আগ্রহেরই প্রকাশক এই শব্দটি, যদিও হিন্দুধর্মের উদার ও সর্বজনীন ভাবের ঠিক ঠিক প্রকাশক সেটি নয়। হিন্দুদের চড়াওকারী মনোভাব মানে এই নয় যে সর্বস্তরেই সে লোকদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে চায়; তার মানে হল সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত যুক্তিগুলি প্রচার করে সকলকেই নিজ নিজ ধর্মমতের প্রতি আরো বিশ্বাসী করে তুলতে চায় সে। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও জীবন-দর্শনের কোনও শাখার জন্য হিন্দুরা আর লজ্জাবোধ করে না। বরং ইউরোপে ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পণ্ডিতমহলে 'হিন্দুদের জীবন-দর্শন'-এর ব্যাখ্যাতারূপে দেখা যাচ্ছে

তাঁদের, এবং পাশ্চাত্য শ্রোতাদের ভেতরও অনেকেই আকৃষ্ট হচ্ছেন হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিতাগ্রণী হিন্দু-ভাব ও -আদর্শের প্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠছেন।

হিন্দুদের ভেতর ন্যায্যতই গর্বের ভাব জাগছে তাদের পূর্বপুরুষদের মহান্ কীর্তি স্মরণ করে। শুধু যে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেই এ বোধ জাগছে তা নয়, সমাজ-জীবনের বিবিধ জাগতিক বিষয়েও তা জেগে উঠছে; আর তার ফলে বিশেষ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মৃৎসমাহিত অতীতকে খুঁড়ে বের করতে চাচ্ছে তারা, পৌঁছুতে চাচ্ছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের নির্ভুল তথ্যের লক্ষ্যে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একদল মেধাবী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মন-প্রাণ ঢেলে লেগে পড়েছেন জাতি-সংগঠনের এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় ভিত্তিনির্মাণের কাজে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম দিকে আলোয়ারে থাকাকালীন স্বামী বিবেকানন্দ একটি ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণা-সংস্থার প্রয়োজনীয়তা কী তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন! সে কথা মনে পড়ছে এখন, আর জাতীয় মনের তাগিদেই স্বামীজীর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে দেখে কী আনন্দই না জাগছে মনে!

যদিও আইনসঙ্গতভাবে দেশের রাজনীতির অগ্রগতির জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যদিও ভারতে জাতীয়তা-বোধ তখন থেকেই জাগতে শুরু করে, তবু নিঃসংশয়ে একথা বলা চলে যে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্বদেশপ্রেমের ভাবাবেগের অভূতপূর্ব প্লাবনে সারা দেশ ছেয়ে গিয়েছিল।* বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই প্রবলভাবে জাতির অন্তর অধিকার করেছে ভারতীয় সমাজের, রাজনীতির ও অর্থনীতির

* ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য স্বদেশই তোমার একমাত্র দেবতা হোক'—তার ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই ভারত স্বাধীন হয়েছে।—অনুবাদক

তীব্র ও অবিমিশ্র কল্যাণকামনা। জনসাধারণের উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন অংশে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনই নয়, আরো বহু ভারতীয় সংঘ সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। সাময়িক দৈবদুর্বিপাকের সময়ও রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া আরো বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসেন বিপদগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে। কয়েকটি সমিতির আনুকূল্যে, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ মহান্ স্বদেশপ্রেমিকদের প্রেরণায় ও পরিচালনাধীনে বৈদিক আদর্শের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনের দিকগুলির সামঞ্জস্য-বিধায়ক বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সঙ্কীর্ণ, সীমায়িত পথ না ধরে ভারতীয় দেশপ্রেম অকপট বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের প্রশস্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজনীনতায় এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার অনুগামীদের সর্বধর্মসমন্বয়ের ও সর্বজাতি-মিলনের বাণীর ভেতর সুস্পষ্ট মানবিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্বিত ভারতীয় স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে। যাঁরা চোখ মেলে দেখতে চান, নিশ্চিতই তাঁরা দেখতে পাবেন যে মাঝে মাঝে অবিবেচক উৎসাহীরা পাশ্চাত্য থেকে যে সব রাজনৈতিক চিন্তাপ্রণালী ও কার্যসাধনোপায়গুলি হঠাৎ এদেশে এনে ফেলেন, ভারতবাসীরা গ্রহণ করার সময় সেগুলি আধ্যাত্মিক চেতনার ছাঁকনিতে ছেঁকে নেন। কে জানে, এভাবে চলতে চলতে কালে একদিন এমন একটা পন্থার উদ্ভব হবে, যা জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য হবে যথেষ্ট প্রশস্ত, অথচ সর্বজাগতিক জাতিগুলিকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাঁধার জন্য তা আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কারের-ও অনুগামী হবে। দেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় ও দলগুলিকে একত্র মিলিত করার জন্য সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশস্ততর করার প্রয়োজনই বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতি আমাদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার করে তুলবে বলে নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

প্রাচ্য চারুকলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই সময়ের অবদান। লক্ষ্য করার

বিষয়, ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের এই দিকটির পুনরুদ্ভবের সঙ্গে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া ভগিনী নিবেদিতাও বিজড়িত। ইউরোপের চারুকলার অবদানগুলির অনুকরণমাত্র না করে, এবং পাশ্চাত্য ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করে, ভারত তার চারুকলাবিষয়ক নিজস্ব প্রাচীন প্রতিভা ও ঐতিহ্য আবিষ্কার করেছে, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশ্চাত্য কলাশৈলীর শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য উপাদানগুলিকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ধারার পুনঃপ্রচলন, উন্নতি ও বিস্তারসাধন করতে।

বিশ্বসাহিত্য-সম্পদ-ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের অতি মূল্যবান আদর্শবাদী অবদানের মাধ্যমে বর্তমান শতাব্দীতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারত ইতোমধ্যেই একটা গভীর রেখাপাত করেছে। তাছাড়া লক্ষ্য করার বিষয়, বাংলাকে পুরোভাগে রেখে এদেশের সব ভাষাই এই সময়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। শত শত সুযোগ্য লেখক এ সময় আবির্ভূত হয়েছেন, ভারতের ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে তুলে সারা দেশ জুড়ে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের এক নবযুগের সূত্রপাত করেছেন।

বিশেষ করে এই কালের ভেতরই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে, এবং ইতোমধ্যেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক চন্দ্রশেখর রমণ প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বৈদেশিক বিজ্ঞান-সংস্থাগুলির কাছে বিশেষ সম্মানও অর্জন করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, শিক্ষার এই বিভাগটিতেও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা প্রাচীন হিন্দুচিন্তার নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কাছে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, আধুনিক যন্ত্রসহায়ে উদ্ভিদ্‌জীবনের যে সংবেদনশীলতা তিনি প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় যে তথ্যটি তিনি প্রকাশ করছেন, অতি প্রাচীনকালে হিন্দু ঋষিরা তা আবিষ্কার

করে গেছেন। প্রাচীন ভারতের চিন্তা ও অবদানগুলি অতীতের গহ্বর হতে উদ্ধারপূর্বক জগতের সামনে তা তুলে ধরে কিভাবে হিন্দুমনের আত্ম-সচেতনতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করছে, তার অভ্রান্ত প্রমাণ বহন করছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'হিস্টরি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' এবং আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'পজিটিভ সায়েন্সেস অব দি হিন্দুস' গ্রন্থ দুখানি। শুধু বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রভৃতি তাদের ব্যাবহারিক প্রয়োগের শাখাগুলিতেও অতীত অবদানের সঙ্গে বর্তমান অবদানগুলিকে যোগসূত্রে বেঁধে দিয়ে ভারত সর্বজনসমক্ষে বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দুসংস্কৃতির বিবর্তনের প্রণালীবদ্ধ ও ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেছে।

এভাবে ভারতীয় জীবনের চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি শাখায় বেশ কিছুটা নবোন্মেষ পরিলক্ষিত হয়েছে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, এবং এর প্রত্যেকটির ভেতরই ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই কালে আমাদের পাশ্চাত্যের ভাই-ভগ্নীরা একটি অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলেছেন। তাঁদের উগ্র অপ্রীতিকর স্বাদেশিকতা, নীতিজ্ঞানশূন্য সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র সম্বন্ধে খুব সেকেলে ধারণা, শ্রেণীসচেতনতার প্রতি তাঁদের অতি-গুরুত্বারোপ এবং উচ্চজাতি-বোধের প্রতি তাঁদের নবাবী মেজাজ এবং ধর্মের আদর্শ নিয়ে তাঁদের সাম্প্রতিক বিভ্রান্তি—এইসব মিলে পাশ্চাত্যে গোটা সমাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে সব মানুষের সমানাধিকার আনার জন্য এবং সামাজিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্যস্থাপনের জন্য কোটি কোটি নিপীড়িত অবমানিত মানুষের অন্তর হতে অমিত শক্তি বেরিয়ে এসেছে, এবং কায়েমী স্বার্থ, এতদিনের অবাধিত লোভ ও অবিসংবাদিত প্রাধান্যের প্রতিভূ শক্তির সঙ্গে তার তীব্র সংঘাত বাধিয়ে তুলেছে। ফলে জাতিগুলির ভেতরের ও বাইরের ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছে অতিমাত্রায়, আর বেধে উঠেছে পরস্পর-বিধ্বংসী

বিপ্লব ও ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম। দুর্বলের জন্য সবলের আত্মত্যাগ, অশিক্ষিত অসহায় জনগণের জন্য শহীদজীবন ও আত্মনিগ্রহ বরণ, ছাগশিশুর জীবন রক্ষার জন্যও বুদ্ধের মতো আত্মজীবন নিবেদনের আগ্রহ, অথবা যীশুখৃষ্টের মতো ক্রুশবিদ্ধ হয়েও জ্ঞানহীন বিকৃতবুদ্ধি অত্যাচারীদের মাথায় আশিস-বর্ষণ প্রভৃতি আদর্শগুলির মহান্ শক্তিমত্তাকে মর্যাদা দেবার দৈব অধিকারে যে মানুষ মহীয়ান, সেই মানুষের সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে অবিবেচকের মতো প্রযুক্ত হয়েছে পশুজগতের বিবর্তন-পদ্ধতির নীতি, "যোগ্যতমেরাই বেঁচে থাকবে।" বিভ্রান্তিবশে মানুষ বুঝতেই পারছে না যে যোগ্যতম বলতে মানুষের ভেতর "আধ্যাত্মিকতায় যোগ্যতম" ব্যক্তিদেরই বোঝায়, তাঁরাই বেঁচে থাকেন—যেমন বুদ্ধ ও খৃষ্ট বেঁচে রয়েছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ধ্বংস-শক্তির নির্দয় নিয়ন্তারা নন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলির কর্ণধারেরা এখনো "যোগ্যতমেরাই বাঁচবে" এই প্রমত্ত নীতি আঁকড়ে রয়েছেন, অবশ্য যোগ্যতা অর্থে দৈহিক শক্তির ও বুদ্ধির নিপুণ চাতুর্যের যোগ্যতাকেই বুঝছেন তাঁরা, আর তার ফলে দেশের ভিতরকার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য পাশব নীতির ভয়ানক, অমানুষিক ও প্রাণপণ প্রয়োগ চলেছে সেখানে। ভ্রাতৃরক্ত-অবলিপ্ত পথের ওপর দিয়ে চলে দেশের ভিতরকার ও বৈদেশিক নীতির পুনর্গঠনের জন্য পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। গত মহাযুদ্ধের ধ্বংসের বীভৎসতার পর বিভিন্ন দেশে একের পর এক কতকগুলি গৃহ-বিপ্লব ঘটে গেছে, আর তার পরই এসেছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসের রাজনৈতিক আন্দোলন; কিন্তু তবুও ইউরোপ জুড়ে অসন্তোষ ও গণ্ডগোল ফেনায়িত হয়ে জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে আর একটা বীভৎস মহাসমরকে বোধ হয় আসন্ন করে তুলেছে।* ইউরোপের, ও সেইসঙ্গে সারা জগতের ভবিষ্যৎ যে কি, তা কে

* ইহার স্বল্পকাল পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় বর্তমান জগৎ আতঙ্কিত।—অনুবাদক

জানে? মানবের আদর্শবিষয়ক নিজ বিভ্রান্তি ও ত্রুটি সংশোধন করে সমাজকে একটা প্রশস্ততর, সুস্থতর, মহত্তর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে পুনর্গঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটা বিষাদময় অভিজ্ঞতার অন্তর্বর্তী অবস্থার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য যে সম্প্রতি চলছে না, সে কথাই বা বলবে কে? কে নিশ্চয় করে বলতে পারে যে পাশ্চাত্যের তিমিরাচ্ছন্ন অশুভ বর্তমান তার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পূর্বসূচনা নয়?

এচ. জি. ওয়েলস তাঁর 'আউটলাইন অব হিস্টরি' গ্রন্থের শেষের দিকে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে আমাদের মনে আশার সঞ্চার করেছেন—"কিন্তু বর্তমানকালের দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার এবং আমাদের সমূহ বিভ্রান্তির ভেতর থেকে একটা বৌদ্ধিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণ, একটা ধর্মজাগরণ আসতে পারে, যার সঙ্গে আসবে সরলতা, আসবে বিভিন্ন জাতির লোক-দিগকে, ঐতিহ্যের দিক থেকে আপাত-বিভিন্ন বলে প্রতীত লোকদিগকে জগদ্ধিতায় নিবেদিত একটা সাধারণ ও সুরক্ষিত জীবনধারায় মিলিত করার সুযোগ।...দুর্নীতিবর্জিত ও পৌরোহিত্যের সঙ্গে বিজড়িত অবস্থার শেষ বন্ধন হতেও বিনির্মুক্ত ধর্মবিষয়ক হৃদয়াবেগ আবার প্রচণ্ড ঝড়ের মতো আমাদের জীবনের ওপর দিয়ে অবিলম্বে বয়ে যেতে পারে, তার বেগে ব্যক্তিগত জীবনের সব দরজা, সব গবাক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়ে, এবং বর্তমান অবসাদের যুগে যা কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য বলে মনে হচ্ছে, সেরকম অনেক কিছুকে সম্ভব ও সহজ করে তুলে।" সুধী লেখকের তীক্ষ্ণ মেধা বোধ হয় সুখময় ভবিষ্যতের সঠিক চিত্র কল্পনানেত্রে দেখেছিল; তাঁর মহান্ আশাবাদ পাশ্চাত্য সমাজের রক্তাক্ত হৃদয়ে নিশ্চয়ই আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করবে। কিন্তু ওয়েলস এখনো আমাদের নিশ্চিত-আশ্বাস দিতে পারছেন না, কখন এবং কোথায় এই নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের কল্যাণ-কারী শুভযাত্রা শুরু হবে। যাই হোক, তিনি বলেছেন যে এরূপ "একটা ঐতিহাসিক পুনর্জীবন শুরু হবে অতি নিঃশব্দে, জগতে ঢাক পিটিয়ে নয়।

ওয়েলস বলেছেন, "এ ধরনের জিনিসের আরম্ভ কখনো আড়ম্বরে হয় না। জাতির হৃদয়ের সুমহৎ আন্দোলনগুলি প্রথম আসে রাতের চোরের মতো নিঃশব্দে, আর তার পর হঠাৎ একদিন দেখা যায় সে হয়ে উঠেছে মহাশক্তিমান ও জগৎজোড়া।"

ধর্ম-মহাসম্মেলন, সামাজিক স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর হোতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে জগৎজোড়া উৎসব-অনুষ্ঠান-গুলি বিচারের দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে যথার্থ মানবিক পুনরুজ্জীবনের কল্যাণকর শক্তি ইতোমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বহির্জগতের লোক ভারতের সম্বন্ধে অতি অল্প খবরই রাখে; কোন কোন বিদেশী এ ভ্রান্ত ধারণাও পোষণ করেন যে ভারত এমন সব অসভ্য কৃষ্ণকায় লোকের বাসভূমি, যাদের ভদ্রতা এবং মানুষের মতো আচরণ শেখা এখনো হয়ে ওঠে নি। এসব সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক ইউরোপের কয়েকজন মহাপণ্ডিত, এবং পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেরই শত শত সত্যান্বেষী ও শান্তিকামী ব্যক্তি আজ সোৎসাহে সমবেত হয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন নামে-মাত্র শিক্ষিত, বাংলার অবজ্ঞাত এক পল্লীবাসী পুরোহিত ব্রাহ্মণের শতবর্ষজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে। এঁদের প্রকৃত সংখ্যা পৃথিবীর বিপুল লোকসংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য হতে পারে; তবু, "যে-যুগে জীবনের জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে আমাদের সমষ্টিজীবনের আভ্যন্তর সুসংগতি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অন্ধ করে রেখে জগৎময় পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিরোধের সৃষ্টি করেছে", সে-যুগে অন্ততঃ কয়েকজন লোক যে অন্তরের প্রেরণায় স্বতঃ-উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে জাতি-বর্ণের কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে বীরগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবনে রূপায়িত উচ্চ আদর্শগুলির প্রতি সমবেতভাবে শ্রদ্ধানিবেদন করতে, এ ঘটনার গূঢ়ার্থ অনেক। যে সব বিভিন্ন দলের লোকগুলির ভেতর সাধারণ বিষয় বলতে প্রায় কিছুই ছিল না, অবশ্য অন্তর্নিহিত মানবিকতা ছাড়া, একতার এই

স্বর্ণসূত্রে দিয়ে তাদের একসঙ্গে গেঁথে ফেলার প্রচেষ্টার সার্থকতারই দাম নেহাৎ কম নয়; আর, সকলকে একত্রিত করে রাখার শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে মূলগত ঐক্যের এবং সর্বধর্ম ও সর্বমানবের সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হতেই।

আমাদের চোখের সামনে এই যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, তা দেখেই অভ্রান্তভাবে বোঝা যায়, স্বল্পপরিমাণ হলেও এচ. জি. ওয়েলস-এর কল্পিত জগৎজোড়া পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে এবং বোধ হয় এ-ও দেখা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্য ভারতের যে গৌরবময় চিত্রপট মানস-নেত্রে দেখেছিলেন, তাও খুলে যেতে শুরু করেছে। স্বামীজী বলেছিলেন, "চাকা আবার ওপরের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে; ভারতে আবার স্পন্দন উঠেছে, যা অদূর ভবিষ্যতে বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। আবার বাণী জেগেছে যার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে এবং দিনে দিনে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। একই শরীরে শঙ্করের অপূর্ব মেধা ও শ্রীচৈতন্যের বিপুল-বিস্তৃত হৃদয় নিয়ে, এই হৃদয় ও মস্তিষ্কের মূর্ত প্রতীক হয়ে একজনের আবির্ভাবের সময় আসন্ন হয়েছিল। বাস্তবিকই প্রয়োজন হয়েছিল এমন একজনের আসার, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি একই প্রেরণাকে সক্রিয় দেখবেন, দেখবেন একই ভগবানকে; এমন একজনের আসার প্রয়োজন হয়েছিল, যিনি সকলেরই ভেতর ঈশ্বরকে দেখবেন, যাঁর হৃদয় কেঁদে উঠবে দরিদ্রের জন্য, দুর্বল ও অবজ্ঞাতের জন্য, পদদলিতের জন্য, এবং ভারতের ও ভারতের বাইরের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য; আর সেইসঙ্গে যাঁর উজ্জ্বল মেধা এমন সব মহান্ ভাব ধারণা করবে, যা শুধু ভারতের নয়, ভারতের বাইরেরও সব বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের সামঞ্জস্যবিধান করবে এবং একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটাবে—হৃদয় ও মস্তিষ্কের সর্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলবে। এরূপ একজনের আবির্ভাব খুবই প্রয়োজন হয়েছিল, আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতর এরূপ একজনই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জীবন ছিল তাঁর

উপদেশের চেয়ে হাজার গুণে বেশী বড়, তাঁর জীবন ছিল উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য—তাই বা বলি কেন, উপনিষদের প্রাণই যেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মানবদেহ ধারণ করেছিল। এমন অভূতপূর্ব পূর্ণতা, সকলের জন্য এমন নির্বিচার ভালবাসা, বদ্ধ মানবের জন্য এত গভীর সহানুভূতি জগতের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্ত্রীপুরুষের, ধনী-নির্ধনের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ভেতর সব ভেদ সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি জীবনধারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তির অগ্রদূত; হিন্দু ও মুসলমানের ভেতর, হিন্দু ও খৃষ্টানের ভেতর পার্থক্য দূরীভূত হবে নিশ্চিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন ঘটাতে এসেছিলেন তিনি। বস্তুতঃ বহু শতাব্দীর মধ্যে ভারতে এমন একজন মহান্ অপূর্ব ধর্মসমন্বয়কারীর আবির্ভাব ঘটে নি।" স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "(শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের ফলে এবারের) এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় আর্যসমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমাহীন হইবে, এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃ-পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।…এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান মানব-সন্তান সেই বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া নিজ-জীবনে ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্তবিদ্যার পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে।…অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম ও অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে। এই নবযুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নবযুগপ্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্ম-প্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ! হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!…যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর, এবং বৃথা সন্দেহ,

দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্তনের সহায়তা কর!” শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁদের লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন, “এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলাম, তোমরা নিজেদের জন্য নিজেরাই তাঁকে বিচার করে নাও। চিরসাক্ষী যিনি, তিনি রয়েছেন; তিনি যেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দেন, আর আমরা চাই বা না চাই, যে বিপুল পরিবর্তন আসছে, যা আসবেই, তার সহায়তার কাজে তোমাকে যেন তিনি নিষ্ঠাবান ও স্থিরসংকল্প করে নিয়োজিত করেন। কারণ প্রভুর কাজ তোমার আমার পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে না। তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ যে একটা পেয়েছি, এটাই একটা মহা গৌরবের বিষয় ও মস্ত সুযোগ আমাদের।” শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শতবর্ষ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি আরো সব মহাগৌরবময় সাফল্যের আশায় ভরা পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে, এবং মানবজাতির কল্যাণকামী উন্নতচেতা ব্যক্তিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে মিলিত হয়ে আসছেন স্বামী বিবেকানন্দের আশা ও বিশ্বাসের বাণী শুনতে: “দ্বার আবার খুলে গেছে। আলোর রাজ্যে তোমরা সবাই এসে প্রবেশ কর।” আর্ত ধরণীর প্রতি স্বামীজীর আশীর্বাণী এখনো অনুরণিত হচ্ছে, “সব সম্প্রদায়েরই প্রভু যিনি, সর্বব্যাপী যিনি···তিনি যেন আমাদের সহায় হন, তিনি যেন আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দেন; চিরকাল, অনন্তকাল যেন তোমাদের সবার মাথায় ঝরে পড়ে তাঁর আশীর্বাদ।”